তিন গোয়েন্দা
রকিব হাসান
ভলিউম-৯

ভলিউম ৯

তিন গোয়েন্দা

৩৭, ৩৮, ৩৯

রকিব হাসান

সেবা প্রকাশনী

ISBN 984-16-1241-0
প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

প্রথম প্রকাশ: ১৯৯২
তৃতীয় প্রকাশ: ১৯৯৮
প্রচ্ছদ পরিকল্পনা: আসাদুজ্জামান
রচনা: বিদেশী কাহিনী অবলম্বনে
মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩ ৪১ ৮৪
জি. পি. ও. বক্স নং ৮৫০
পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
Volume-9
TIN GOYENDA SERIES
By: Rakib Hassan

একচল্লিশ টাকা
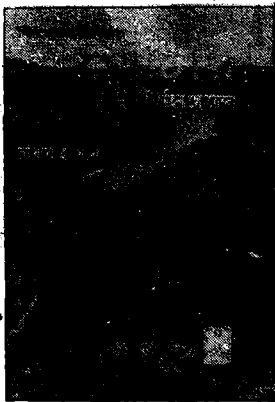
পোচার

প্রথম প্রকাশঃ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯০

'মাউনটেইনস অভ দা মুন!' বিড়বিড় করলো কিশোর পাশা, উত্তেজনায় মৃদু কাঁপছে কণ্ঠ।

'বাংলায় কি হয়?' জিজ্ঞেস করলো রবিন। 'চাঁদের পাহাড়?'

'কিংবা চন্দ্রপর্বত!' বললো গোয়েন্দাপ্রধান।

'নামের মতোই সুন্দর পাহাড়টা,' মুসা বললো। নিচের পর্বতশ্রেণীর দিকে তাকিয়ে আছে সে।

দক্ষিণ-পুবে উড়ে চলেছে ছোট্ট বিমান। গন্তব্য, টিসাভো। লোকে বলে 'রহস্য আর খুনের খনি টিসাভো'। আফ্রিকার বৃহত্তম ন্যাশনাল পার্ক, যেখানে জন্তুজানোয়ারেরা নিরাপদে থাকার কথা, কিন্তু থাকতে পারে না। পোচার, অর্থাৎ চোরাশিকারীরা বেআইনীভাবে মেরে শেষ করছে হাতি, গণ্ডার, জিরাফ, জলহস্তী আর অন্যান্য প্রাণী। তাদের ঠেকানোর আপ্রাণ চেষ্টা করছেন গেম ওয়ারডেন ডেভিড টমসন—মুসার বাবার খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু, কিন্তু পারছেন না। আর পারবেনই বা কি করে? আট হাজার বর্গমাইল বুনো অঞ্চলের কোথায় যে লুকিয়ে থাকে পোচাররা, খুঁজে বের করা কি সহজ কথা?

প্লেন চালাচ্ছেন টমসন। কপালে গভীর ভাঁজ পড়েছে, ভাবছেন। কন্ট্রোলে হাত। নিচে একে একে সরে গেল ভিকটোরিয়া হ্রদ, নীল নদের উৎপত্তিস্থল, সিংহের জন্যে বিখ্যাত বিশাল সেরেংগেটি অঞ্চল, তুষারের মুকুট পরা মাউন্ট কিলিমানজারো···খেয়ালই করছেন না যেন তিনি। তাঁর মন পড়ে আছে আরও দূরের সেই রক্তাক্ত এলাকায়, যেখানে মাঝে মাঝেই চোখে পড়বে রক্ত, আতঙ্ক, অত্যাচার আর মৃত্যুর রোমহর্ষক দৃশ্য।

'এক অসম লড়াই,' আনমনে বললেন তিনি। 'শত্রুরা দলে এতো ভারি, কিছুতেই পারছি না। মাত্র দশ জন লোক আমার। পোচারদের তুলনায় নগণ্য। কি করে পারবো? এক জায়গা থেকে খেদাই তো পরদিনই আরেক জায়গায় গিয়ে শুরু করে। নাহ্, আর পারা যায় না।'

'ক'জন গেছে আপনার?' কিশোর জিজ্ঞেস করলো।

'বাইশ জন ছিলো। বারো জনকে মেরে ফেলেছে।'

'তীর দিয়ে?'

'হ্যাঁ। বিষ মাখানো তীর। পোচারদের সবার কাছে অস্ত্র আছে; তীর-ধনুক, বল্লম, ছুরি, কারো কারো কাছে পুরনো মাসকেট রাইফেল। আমার দু'জন লোক ওদের ফাঁদে আটকা পড়েছিলো, জানোয়ার ধরার জন্যে পেতে রাখা ফাঁদ। মাসখানেক পরে ওভাবেই পেয়েছি, শুধু দুটো কঙ্কাল।'

'খাইছে!' আঁতকে উঠলো মুসা। 'কঙ্কাল?'

'হ্যাঁ। আর কিছুই অবশিষ্ট ছিলো না।'

'নিশ্চয় পানির অভাবে মরেছে?' অনুমানে বললো রবিন। 'তারপর হায়েনারা এসে খেয়ে ফেলেছে…'

'আটকা পড়া জীবকে অসহায় দেখলে মরার অপেক্ষা করে না হায়েনারা। আমার বিশ্বাস, জ্যান্তই খেয়ে ফেলেছে।'

শিউরে উঠলো রবিন। মুখ কালো হয়ে গেল। মুসার মুখও থমথমে। আফ্রিকায়, তার নিজের মহাদেশে বেড়াতে আসার কথাটা ভাবতে ভালো লাগছে না আর এখন। চট করে তাকালো একবার কিশোরদের দিকে। গোয়েন্দাপ্রধানকেও চিন্তিত দেখাচ্ছে। তাকিয়ে আছে নিচের দিকে।

এবারের ছুটিতে আফ্রিকায় বেড়াতে আসার প্রস্তাবটা মুসার। রবিন আর কিশোরও শুনেই রাজি। তিনজনে মিলে অনেক বলেকয়ে রাজি করিয়েছে মুসার বাবা মিস্টার রাফাত আমানকে। তিনি সব ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। ডেভিড টমসনের সঙ্গে যোগাযোগ করে বলেছেন, ছেলেদের পাঠাতে চান। তিন গোয়েন্দার সংক্ষিপ্ত পরিচয়ও জানিয়েছেন বন্ধুকে। বন্ধুর অনুরোধ এড়াতে পারেননি ওয়ারডেন, কিংবা এড়াতে চানওনি হয়তো, তাই তিন কিশোরকে কিছুদিন মেহমান রাখতে রাজি হয়ে জবাব দিয়েছেন চিঠির।

ছেলেদের মনমরা হয়ে যেতে দেখে হাসলেন ওয়ারডেন। 'কি ব্যাপার, ভয় পেয়ে গেলে নাকি?'

'না না,' তাড়াতাড়ি বললো কিশোর। 'ভয় পাবো কেন? বিপদকে ভয় পাই না আমরা।'

'রাফাতও তাই লিখেছে। তোমরা ভীষণ সাহসী। আমাজানের গহীন জঙ্গল থেকেও জন্তুজানোয়ার ধরে নিয়ে এসেছিলে। এসব শুনেই রাজি হয়েছি। নইলে যেখানে পোচার আছে, আসতে বলতাম না। পোচার মানেই তো বিপদ।'

'দশজন আছে তো,' মুসা বললো। 'এখন ধরে নিতে পারেন তেরো জন। আমরাও আছি আপনার সঙ্গে। ওই পোচার ব্যাটাদের একটা ব্যবস্থা না করে আমরাও আমেরিকায় ফিরছি না।'

'দেশপ্রেম?'

'দেশপ্রেমিক, বুনো পশু-পাখি-প্রেমিক, অন্যায়-বিরোধী, যা খুশি বলতে পারেন। কিন্তু টিসাভোর ওই পোচারগুলোকে খতম না করে আমি মুসা আমান অন্তত ফিরছি না।'

এক মুহূর্ত স্থির দৃষ্টিতে নিগ্রো ছেলেটার দিকে তাকিয়ে রইলেন টমসন। তারপর মাথা নাড়লেন, 'তোমার বাবা মিথ্যে লেখেননি। সত্যি তোমরা ভালো ছেলে।'

'থ্যাঙ্ক ইউ, স্যার,' কিশোর বললো।

'ওই যে,' তুষারে ঢাকা পর্বতের একটা ধার দেখিয়ে বললেন ওয়ারডেন। 'ওই টিসাভো।'

চমৎকার দৃশ্য! কে ভাববে, ওরকম একটা জায়গায় সারাক্ষণ চলে মৃত্যুর আনাগোনা? সবুজ বন, দিগন্ত বিস্তৃত তৃণভূমি, নিঝুম পাহাড়, রূপালি নদী, শান্ত হ্রদ, উজ্জ্বল রোদ, নিবিড় ছায়া—সবকিছু মিলিয়ে তিন গোয়েন্দার মনে হলো যেন পৃথিবীর কোনো জায়গা নয় ওটা।

সুন্দরের পুজারি কিশোর পাশার স্বপ্নিল চোখ দুটো আরও গাঢ় হয়ে উঠলো। ভাবছে, বাংলাদেশেও কি এতো সুন্দর জায়গা আছে?

'আল্লাহরে! এ-তো বেহেশত!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠলো মুসা।

'হ্যাঁ,' মাথা দোলালো রবিন। 'সুন্দর জায়গা পৃথিবীর সবখানেই আছে। আমাদের আয়ারল্যাণ্ডেও আছে।'

'আছে,' একমত হলেন ইংরেজ ওয়ারডেন। 'এবং সব জায়গাতেই শয়তানও আছে। ওরা না থাকলে···এই টিসাভোর কথাই ধরো, পোচারগুলো না থাকলে সত্যি স্বর্গ বলা যেতো জায়গাটাকে। জানোয়ারের নিরাপদ বাসভূমি, টুরিস্টদের আনন্দ। ওই যে নদীটা, একটা জায়গায় বেশি ছড়ানো দেখছো, ওখানে একটা আণ্ডারওয়াটার অভজারভেটরি আছে। ওখান থেকে নদীর নিচের দৃশ্য দেখা যায়। এখন আর সুন্দর কিছু দেখবে না, পোচাররা সর্বনাশ করে দিয়েছে। ডজন ডজন জলহস্তী মেরে···,' দৃশ্যটা কল্পনা করে চেহারা বিকৃত করে ফেললেন তিনি।

'মেরে ফেলে ওদের কি লাভ?' জানতে চাইলো মুসা।

'ওদের যা দরকার নিয়ে চলে গেছে। জলহস্তীর একেকটা মাথার দাম চার-পাঁচ হাজার ডলার। চামড়ার দামও অনেক। মাথা কেটে, চামড়া ছিলে, ধড়টা ফেলে রেখে গেছে।'

'নরপিশাচের দল!' দাঁতে দাঁত চাপলো কিশোর। 'খেতো যদি, তা-ও এক কথা ছিল, শুধু কিছু টাকার জন্যে এভাবে খুন করে জানোয়ারগুলোকে!'

'ওদের পিশাচ বললে কম বলা হয়,' টমসন বললেন। 'জানোয়ারের ব্যবসা

করে কোটিপতি হয়ে গেল একেকজন। মানুষের জন্যে শিকার নিষিদ্ধ নয়, কোনোকালেই ছিলো না। আদিম যুগেও শিকার করতো মানুষ, মাংসের জন্যে, খেয়ে বাঁচার তাগিদে। আফ্রিকায় এখনও অনেক উপজাতি আছে, শিকার না পেলে যারা না খেয়ে মরবে। তাদের শিকারে কিছু হয় না, জন্তুজানোয়ারের বংশ লোপ পাওয়ার কোনো আশঙ্কা নেই। বড় একটা হরিণ মারতে পারলে এক-গাঁ লোকের খাওয়া হয়ে যায়। আর ঘরে খাবার থাকলে অহেতুক জানোয়ারও মারে না তারা। কিন্তু ওই পোচাররা তো তা করে না। পালে পালে মারে। যতো বেশি মারতে পারবে, ততোই পয়সা। জানোয়ার খুন করার জন্যে রীতিমতো আর্মি বানিয়ে নিয়েছে ওরা,' থামলেন ওয়ারডেন। তারপর বললেন, 'টিসাভোর পোচারদের সর্দারের নাম লঙ জন সিলভার। অবশ্যই ছদ্মনাম। ট্রেজার আইল্যাণ্ডের সেই কুখ্যাত জলদস্যু সিলভারের নাম নিয়েছে। তফাত শুধু স্টিভেনসনের ডাকাতটা লুট করতো সোনার মোহর, আমাদের ডাকাতটা করে জানোয়ারের দাঁত-মাথা-হাড়-চামড়া।'

'সিলভারের আসল পরিচয় জানেন?' জিজ্ঞেস করলো কিশোর।

'না। পরিচয় তো দূরের কথা, তার আসল চেহারাই নাকি কেউ দেখেনি। বিদেশী, না আফ্রিকান, তা-ও জানি না। আশা করি, এই রহস্যের সমাধান তোমরা করতে পারবে।'

'চেষ্টা করবো।'

'মোমবাসা থেকে জাহাজে করে পৃথিবীর বড় বড় শহরে পাচার হয়ে যাচ্ছে অসংখ্য জলহস্তীর মাথা, গাদা গাদা হাতির দাঁত, গণ্ডারের শিং; চিতাবাঘ, বানর; পাইথনের চামড়া। মাঝেসাঝে কিছু কিছু মাল আটক করা হয়, দু'একটা চুনোপুঁটি ধরাও পড়ে, কিন্তু আসল লোকটার পাত্তাও পাওয়া যায় না। যাদেরকে ধরা হয়, তারাও কিছু বলতে পারে না। হয়তো সে মোমবাসার কোনো ধনী ব্যবসায়ী, কিংবা এ-দেশের কোনো উচ্চপদস্থ সামরিক অফিসার—আর্মি গড়তে তাই তার সুবিধে হয়েছে। তবে সবই অনুমান। তাকে না ধরা পর্যন্ত কোনো কিছুই শিওর হয়ে বলা যাবে না।'

দুই

বিমানটা জার্মানীর তৈরি, চার সীটের একটা স্টর্ক বিমান। ডুয়্যাল কনট্রোল। জয়স্টিকের এক মাথা ধরে রেখেছেন টমসন। আরেক মাথা কো-পাইলটের সীটে বসা মুসার দুই হাঁটুর ফাঁকে। সতৃষ্ণ নয়নে বার বার ওটার দিকে তাকাচ্ছে মুসা,

চেপে ধরার ইচ্ছেটা অনেক কষ্টে রোধ করছে। চালাতে পারবে কিনা সন্দেহ আছে তার। কিছু দিন ধরে প্লেন চালানো শিখছে সে। ওগুলো সব আমেরিকান প্লেন, এটা জার্মান। ইনস্ট্রুমেন্ট প্যানেলের সমস্ত যন্ত্রপাতির তলায় আর মিটারের লেখা জার্মান ভাষায়, বেশির ভাগই পড়তে পারে না। তাছাড়া যন্ত্রপাতিগুলোও কেমন যেন এলোমেলো, আমেরিকানগুলোর সঙ্গে মিল কম। পারবে, ভাবলো মুসা, সময় লাগবে আরকি। প্র্যাকটিস করতে হবে।

'ওই যে উঁচু পাহাড়টা,' দেখালেন ওয়ারডেন। 'চোখা চূড়া।'

'হ্যাঁ, দেখছি,' মুসা বললো। 'ওপরে প্যাভিলিয়ন মতো কি যেন।'

'প্যাভিলিয়নই। তাতে টেলিস্কোপ বসানো। একে আমরা বলি পোচারস লুকআউট। ওই টেলিস্কোপ দিয়ে সারাক্ষণ নজর রাখে রেঞ্জাররা, পোচার আছে কিনা দেখে।'

'কতোদূর দেখা যায় ওখান থেকে?' মুসার পেছনের সীট থেকে জিজ্ঞেস করলো রবিন।

'বেশি না,' জবাব দিলেন টমসন। 'মাত্র কয়েক মাইল। আরও বেশি যেতো, বন আর পাহাড়ের জন্যে পারা যায় না। চোখের সামনে বাধা হয়ে যায়। না হলেও বা আর কতদূর দেখতাম? আট হাজার মাইল এলাকা, পুরোটা দেখতে হলে কয়েক শো লুকআউট দরকার। সেটা অসম্ভব। অতো জোগান দিতে পারবে না সরকার। লোকই দিতে পারে না। ছিলো বাইশ জন, বারো জন শেষ। এরপর কতো লেখালেখি করছি, লোকের জন্যে। অবশেষে রাজি হয়েছে। কাল-পরশু আরও বিশ-তিরিশজন পাবো আশা করি।'

'পাহারা দেয়া হয় তাহলে কি করে?' পেছন থেকে জানতে চাইলো কিশোর। 'প্লেন নিয়ে ঘোরেন সারাদিন?'

'সারাদিন হয় না। শুধু আমি চালাতে পারি এটা। পোচার দেখা ছাড়াও আরও অনেক কাজ আছে আমার। তবু সময় পেলেই উড়ি।...আমাদের ক্যাম্প দেখা যাচ্ছে। পোচারস লুকআউটের ওপাশে।'

সামনে মাইল পাঁচেক দূরে কতগুলো কেবিন দেখা গেল, কুঁড়ে বলাই ভালো। খড়ের চালা, বাঁশের বেড়া। ওটাই তাহলে বিখ্যাত কিতানি সাফারি লজ! অবাক হলো তিন গোয়েন্দা। টুরিস্ট মৌসুমে এখানেই এসে দলে দলে ভিড় জমায় ইউরোপ-আমেরিকার লোকেরা! আর দশটা খুদে আফ্রিকান গ্রামের সঙ্গে বিশেষ তফাত নেই ক্যাম্পটার।

চঞ্চল হয়ে ঘুরছে মুসার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। বাঁয়ে হাত তুলে জিজ্ঞেস করলো, 'ওটা কি?'

একবার চেয়েই শাঁ করে প্লেনের মুখ ঘুরিয়ে দিলেন ওয়ারডেন। উড়ে চললেন সেদিকে। 'তুমি খুব ভালো রেঞ্জার হতে পারবে, মুসা। চোখ আছে। ওটা ট্র্যাপ-লাইন।'

'ট্র্যাপ-লাইন?'

'আমি জানি ট্র্যাপ-লাইন কি,' রবিন জবাব দিলো। 'পোচারদের পাতা ফাঁদের সারি।

'হ্যাঁ, ঠিকই বলেছো,' টমসন বললেন।'

'দেখে তো বেড়া মনে হচ্ছে,' বললো কিশোর।

'বেড়া-ই। কাঁটা ঝোপ আর বাঁশ দিয়ে বানায় পোচাররা। পঞ্চাশ গজ থেকে শুরু করে এক মাইল, দু'মাইল পর্যন্ত লম্বা করে। এটা মাইল খানেকের কম হবে না। মাঝে ফাঁকগুলো দেখছো না, প্রত্যেকটা ফাঁকে একটা করে ফাঁদ পাতা আছে।'

'জানোয়ার ধরা পড়ে কি করে?' মুসা জিজ্ঞেস করলো।

'ধরো, তুমি একটা জানোয়ার। চরে খেতে খেতে চলে এলে বেড়ার কাছে। ওপাশে যাওয়ার ইচ্ছে হলে কি করবে? এতো লম্বা বেড়া ঘুরে যাবে না নিশ্চয়। উঁচু, লাফিয়ে যাওয়াও কঠিন। তার চেয়ে সহজ কাজটাই করবে, ফাঁক দিয়ে বেরোনোর চেষ্টা করবে। এমন ভাবে বেরোতে চাইবে, যাতে বেড়ার কাঁটা তোমার গায়ে না লাগে। জায়গা মতো লাগানো আছে তারের ফাঁস। মাথা দিয়ে ঢুকে আটকে যাবে তোমার গলায়। ভয় পেয়ে তখন টানাটানি শুরু করবে, সেটাই স্বাভাবিক। খুলবে না ফাঁস, আরও চেপে বসবে গলায়, চামড়া কেটে মাংসে বসে যাবে। রক্তের গন্ধে ছুটে আসবে মাংসাশী জানোয়ার। জ্যান্তই ছিঁড়ে খেয়ে ফেলবে।'

'খেয়েই যদি ফেললো আমাকে, পোচাররা আর কি পাবে?'

'পাবে, পাবে। তুমি হাতি হলে ওরা তোমার দাঁত পাবে, পায়ের পাতা পাবে ওয়েইস্ট-পেপার বাস্কেট বানানোর জন্যে। লেজ দিয়ে বানাবে মাছি তাড়ানোর ঝাড়ন। হায়েনারাও ওসব খায় না, ফেলে যায়। গণ্ডার কিংবা অন্য জানোয়ার হলেও অসুবিধে নেই। পোচারদের জিনিস পোচাররা পেয়েই যায়।'

দ্রুত নামছে প্লেন।

'কি করবেন?' জিজ্ঞেস করলো কিশোর।

'পোচারদের ভয় দেখাবো। বোঝাবো, ওদের আড্ডা দেখে ফেলেছি। অনেক সময় ভয় পেয়ে সরে যায় ওরা, দলে লোক কম থাকলে। বেশি থাকলে অবশ্য আক্রমণ করে বসে। ভালো করেই জানে ওরা, রেঞ্জার মাত্র হাতে গোণা কয়েকজন

আমাদের। তবে আরও যে আসছে, সেকথা এখনও জানে না। ওরা এলে, রাস্তা দিয়ে দল বেঁধে এসে ধরবো ব্যাটাদের।'

আরও নিচে নামলো বিমান। ঠিক বেড়ার ওপর দিয়ে উড়ে গেলেন টমসন। দেখা গেল, প্রায় প্রতিটি ফাঁকেই আটকা পড়েছে জানোয়ার। কোনোটা ছাড়া পাওয়ার জন্যে ছটফট করছে, কোনোটা লুটিয়ে রয়েছে মাটিতে, প্রাণহীন, নিথর। বেড়ার দু'পাশে ঘোরাঘুরি করছে, মারামারি কামড়া-কামড়ি করছে শবভোজী প্রাণীর দল—হায়েনা, শিয়াল, বুনো কুকুর, শকুন। প্লেনের শব্দ ছাপিয়ে কানে আসছে ওদের চিৎকার।

একশো চল্লিশ থেকে শুধু তিরিশ মাইলে গতিবেগ নামিয়ে আনলেন টমসন। গাছের জটলার ভেতরে কয়েকটা খড়ের ছাউনি চোখে পড়লো। পোচারদের অস্থায়ী আস্তানা। মাটির পঞ্চাশ ফুট ওপর দিয়ে সেদিকে উড়ে গেল বিমান।

'এতোগুলো আছে ভাবিনি!' বিড়বিড় করলেন ওয়ারডেন।

হঠাৎ বনের ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো একঝাঁক কালো মানুষ। হাতে তীর-ধনুক আর বল্লম। প্লেন সই করে ছুঁড়ে মারলো। যদিও একটাও লাগলো না বিমানের গায়ে।

বিশেষ কাজের জন্যে তৈরি করা হয়েছে এই প্লেন। সীটের নিচে পায়ের কাছে অ্যালুমিনিয়মের চাদরের পরিবর্তে লাগানো হয়েছে শক্ত প্লাস্টিক, যাতে নিচের সব কিছু পরিষ্কার দেখা যায়। সবই দেখতে পাচ্ছে ওরা।

আবার পোচারদের ওপর দিয়ে উড়ে গেল বিমান। ছুটে এলো আরও এক ঝাঁক তীর। একটা কনুই জানালার বাইরে রেখেছিলেন টমসন, ঝটকা দিয়ে নিয়ে এলেন ভেতরে। ভীষণ চমকে গেছেন। অস্ফুট শব্দ বেরিয়ে এলো মুখ থেকে। জয়স্টিক চেপে ধরলেন। দ্রুত উঁচু হয়ে গেল বিমানের নাক। সোজা ছুটলো কিতানি সাফারি লজের দিকে।

তিন

পাশে বসে মুসা দেখতে পেলো না, তার পেছনে বসে রবিনও না। কিন্তু পেছনে বসা কিশোর ঠিকই দেখলো। কালো ছোট একটা তীর বিঁধে রয়েছে টমসনের বাহুতে। মাংস এফোঁড়-ওফোঁড় করে বেরিয়ে আছে তীরের চোখা মাথা।

'মুসাআ!' চেঁচিয়ে উঠলো কিশোর। 'উনি, উনি তীর খেয়েছেন...'

পাশে কাত হয়ে তীরটা দেখতে পেলো মুসা। ওরা ভয় পাবে বলে দেখাতে চাননি ওয়ারডেন, লুকিয়ে ফেলেছিলেন। শান্ত কণ্ঠে বললেন, 'কিচ্ছু ভেবো না।

ঘুমিয়ে পড়ার আগেই ক্যাম্পে পৌঁছে যাবো।'

'বিষ আছে না?' অন্য দু'জনের মতোই উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে রবিন।

'বোধহয়।'

তীরের মাথাটা ভালো করে দেখলো মুসা। মারাত্মক বিষাক্ত অ্যাকোক্যানথেরা গাছের কালো আঠা আঠা রস মাখিয়ে নেয় জংলীরা, শুনেছে সে। তীরের মাথায় সে-রকম কিছু চোখে পড়লো না। 'কই, বিষ তো নেই। শুধু রক্ত।'

'ওখানে তো দেখবে না। ও-জায়গায় লাগায় না ওরা।'

'কেন?'

'নিজেদের গায়ে লাগার ভয়ে। পিঠের তূণে তীর নিয়ে ঝোপঝাড়ে চলাফেরা করে, দৌড়ায়। হোঁচট খেয়ে পড়ে। তখন যে-কোনো সময় তীরের খোঁচা লাগতে পারে। যার সঙ্গে থাকে তার গায়েও, যারা সাথে থাকে তাদের গায়েও। নিজেদের বিষে নিজেরাই মরবে।'

'তাহলে কোথায় লাগায়?'

'ডাণ্ডায়। তীরের মাথার ঠিক পেছনে।'

'সর্বনাশ! ওই জায়গাটাই তো ঢুকে আছে আপনার হাতে। বের করে ফেলা যায় না?'

'তা যায়। কিন্তু নাগালই তো পাবে না,' ঠিকই বলেছেন টমসন। তাঁর আর কো-পাইলটের মাঝের সীটে দুই ফুট ব্যবধান। আহত হাতটা রয়েছে আরও দূরে। ওখানে পৌঁছতে হলে যন্ত্রপাতির ওপরে ঝুঁকে হাত বাড়াতে হবে মুসাকে, প্লেন নিয়ন্ত্রণ করা মুশকিল হয়ে পড়বে। রবিন রয়েছে আরও দূরে, তার পক্ষে আরও কঠিন।

'আমি পারবো,' কিশোর বললো। 'বলুন, কি করতে হবে।'

এক মুহূর্ত ভাবলেন টমসন। 'টেনে বের করতে পারবে না, ফলা আটকে যাবে। দেখো, মাথাটা ভাঙতে পারো কিনা।'

পাইলটের সীটের ওপর দিয়ে ঝুঁকে এক হাতে তীরের মাথা, অন্য হাতে ডাণ্ডাটা চেপে ধরলো কিশোর। চাপ দিলো। আরে! যা ভেবেছিলো তা তো নয়। যথেষ্ট শক্ত। আরও জোরে চাপ দিলো সে। রক্তে মাখামাখি হয়ে গেল হাত, পিছলে যাচ্ছে। ধরে রাখতে পারছে না। ঘামতে শুরু করেছে দরদর করে। না, গরমে নয়, টমসনের কি রকম কষ্ট হচ্ছে সেকথা ভেবে। নিশ্চয় ভীষণ ব্যথা পাচ্ছেন। কিন্তু টুঁ শব্দ করলেন না তিনি।

মট করে ভাঙলো অবশেষে। আলাদা হয়ে গেল তীরের মাথা। এবারের কাজ আরও জটিল। তাড়াতাড়ি ডাণ্ডাটা বের করে আনা।

ডাণ্ডা ধরে হ্যাঁচকা টান মারলো কিশোর। খুললো না ওটা।

রক্তাক্ত হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে কপালের ঘাম মুছে রবিনের দিকে ফিরলো কিশোর। 'দেখো তো, ওঁর হাতটা ধরতে পারো কিনা? নাগাল পাবে?'

উঠে চেষ্টা করে দেখলো রবিন। প্লেনের ভেতরে জায়গাই নেই। পারলো না।

আবার একা কিশোরকেই চেষ্টা করতে হলো। ডাণ্ডাটা ধরে দাঁতে দাঁতে চেপে আবার মারলো টান। কন্ট্রোলের ওপর থেকে হাত নড়ে গেল টমসনের। দুলে উঠলো প্লেন। কিন্তু যেখানের ডাণ্ডা সেখানেই রইলো। তাড়াতাড়ি প্লেনটাকে সামলালেন তিনি।

'হাড়ে আটকে গেল না তো?' গলা কাঁপছে রবিনের। 'দেখো আরেকবার টেনে।'

মুসার আশা ছিলো, বড় হয়ে সার্জন হবে, এখানেই বাদ দিয়ে দিলো সেই ভাবনাটা। মানুষের এসব কষ্ট দেখলে সহ্য হয় না তার।

তৃতীয়বার টান দিলো কিশোর। লাভ হলো না। শেষে মরিয়া হয়ে ডাণ্ডাটা ধরে ওপরে-নিচে করে, আশেপাশে নেড়ে ছিদ্রটা বড় করতে লাগলো। মানুষটাকে কতোখানি ব্যথা দিচ্ছে কল্পনা করে তার নিজেরই বুক ধড়ফড় শুরু হয়েছে। শেষ পর্যন্ত আরেকবার ধরে গায়ের জোরে দিলো টান, ছাড়লো না, টানতে লাগলো।

খুলে এলো ডাণ্ডাটা।

মুখ খুললেন টমসন। কিশোর ভাবলো 'বজ্জাত ছেলে' বলে তাকে গাল দেবেন ওয়ারডেন। কিন্তু শান্ত কণ্ঠে বললেন শুধু তিনি, 'গুড বয়!'

ধপ করে সীটে এলিয়ে পড়লো কিশোর। হাঁপাচ্ছে, ঘামছে। কেনিয়ার প্রচণ্ড গরম তো আছেই, সেই সাথে ভয়ানক উত্তেজনা। চোখের সামনে ডাণ্ডাটা তুলে দেখলো সে। ডাণ্ডার মাথার কাছে লেগে রয়েছে লাল রক্ত আর কালো বিষ।

কিন্তু এতো কষ্ট করে তীরটা খুলে লাভ হবে তো? ওয়ারডেন কি বাঁচবেন? বিষ যা ঢোকার তা তো ঢুকেই গেছে রক্তে। সবই নির্ভর করে এখন তাঁর দেহের প্রতিরোধ ক্ষমতার ওপর। এই বিষে শিশুরা কয়েক মিনিটেই মরে যায়। মহিলারা টেকে বড় জোর বিশ মিনিট। তবে, কিশোর শুনেছে, লড়াই করতে গিয়ে শত্রুর তীর খেয়ে দুই ঘন্টা বেহুঁশ হয়ে ছিলো একজন আফ্রিকান যোদ্ধা, তারপর ধীরে ধীরে সেরে উঠেছে।

আরও একটা ব্যাপার, বিষটা কতোখানি নতুন তার ওপরও নির্ভর করে অনেক কিছু। পুরনো হলে, ধুলো-ময়লা বেশি লেগে থাকলে কার্যক্ষমতা কমে যাবে অনেকখানি। মনে মনে প্রার্থনা করলো কিশোর, খোদা, তা-ই যেন হয়!

জয়স্টিকের ওপর ঢলে পড়লেন ওয়ারডেন। সঙ্গে সঙ্গে গোঁত্তা খেয়ে নাক

নামিয়ে ফেললো বিমান, ধেয়ে চললো মাটির দিকে।

নিজের হাঁটুর ফাঁকে জয়স্টিকের আরেকটা অংশ ধরে জোরসে টান দিলো মুসা, সরাতে পারলো না। বেজায় ভারি টমসন। ভয়ঙ্কর গতিতে এগিয়ে আসছে যেন ধরণী। চেঁচিয়ে উঠলো সে, 'জলদি সরাও ওঁকে!'

নিচের দিকে ঝুঁকে গেছে বিমান। এই অবস্থায় কিশোর আর রবিনও সোজা হতে পারছে না। তাড়াতাড়ি সীটবেল্ট বেঁধে নিলো দু'জনে। টমসনের কাঁধ ধরে টেনে সরানোর চেষ্টা করলো কিশোর। রবিনের নাগালের মধ্যেই আসছে না তেমন, তবু কোনোমতে ওয়ারডেনের শার্টের কলার খামচে ধরে টানলো। মুসা চুপ করে নেই, সে টেনে ধরে রেখেছে জয়স্টিক।

আস্তে আস্তে বেহুঁশ টমসনকে টেনে তুললো কিশোর আর রবিন।

দ্রুত এগিয়ে আসছে একটা লম্বা ক্যাপোক গাছ। চোখ বন্ধ করে স্টিকে টান মারলো মুসা। ভাবছে, গাছের সঙ্গে বাড়ি লাগলে মরতে কি খুব কষ্ট হবে? বাড়ি লাগলো না। শেষ মুহূর্তে শাঁ করে গাছের ওপর দিয়ে বেরিয়ে এলো প্লেন।

ধরে না রাখলে আবার হেলে পড়ে যাবেন টমসন। দু'দিক থেকে তাঁকে ধরে রেখেছে কিশোর আর রবিন। মুসা প্লেন সামলাতে ব্যস্ত। তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে আছে ইনস্ট্রুমেন্ট প্যানেলের দিকে। গিজমোটা কোথায়, যেটা ব্রেক নিয়ন্ত্রণ করে? জার্মান বিমানের ফুট প্যাডাল কি কি কাজ করে? চাপ দিতে গিয়েও পা সরিয়ে আনলো সে, সাহস হলো না। উড়ে চলা সহজ, কিন্তু ওঠানো নামানো খুব কঠিন কাজ। পারবে? নামাতে পারবে? এছাড়া আর কোনো উপায়ও নেই। ওদের চারজনের জীবন নির্ভর করছে এখন তার হাতে। 'যা করে আল্লাহ্!' ভেবে, তৈরি হয়ে গেল ল্যাণ্ডিঙের জন্যে।

ল্যাণ্ডিংফীল্ডটা খুঁজলো তার চোখ। সারি সারি কেবিন দেখতে পাচ্ছে, কিন্তু অ্যাসফল্টে বাঁধানো কোনো রানওয়ে চোখে পড়লো না। অবশেষে উইণ্ড-সকটা দেখতে পেলো। উড়ে গেল সেদিকে। রানওয়ে নেই। ঘাসে ঢাকা লম্বা এক চিলতে জমি। ওটাতেই বোধহয় নামানো হয় এই প্লেন।

যন্ত্রপাতি নাড়াচাড়া শুরু করলো সে। কয়েক মিনিটেই অনেকখানি বুঝে ফেললো, কোনটা কি কাজ করে। ক্যাম্পের ওপর চক্কর দিলো একবার। উড়ে গেল আবার মাঠের দিকে। মনে মনে আন্দাজ করে নিলো কোন জায়গাটায় নামালে গাছের গায়ে ধাক্কা লাগবে না।

প্লেনের নাক নিচু করে ল্যাণ্ড করতে যাবে, এই সময় এয়ারস্ট্রিপের ঘাসের মধ্যে একটা নড়াচড়া চোখে পড়লো। হলুদ আর কালো রঙের কি যেন। নড়ে উঠলো আবার। কী, বোঝা গেল। সিংহের একটা পরিবার।

রোদ পোহাচ্ছে ওরা। প্লেনের আওয়াজে কর্ণপাত করে
আছে, প্লেন, রেলগাড়ি, মোটরগাড়ির আওয়াজকে ভয় করে না
ন্যাশনাল পার্কের জানোয়ারগুলো। ওসব যানবাহন দেখতে দেখতে
গেছে ওদের।

সিংহগুলোর জন্যে প্লেন নামানো যাবে না, ল্যাণ্ডিঙের পথ জুড়ে
ওগুলো। কখন যাবে না যাবে তারও ঠিক নেই। দেরিও করা যাচ্ছে না। টমসনের
অবস্থা খুব খারাপ। তাড়াতাড়ি কিছু একটা করতে হবে, তাড়াতে হবে
সিংহগুলোকে।

প্রায় ডাইভ দিয়ে ওগুলোর বিশ ফুটের মধ্যে চলে এলো বিমান নিয়ে। ছড়িয়ে ছিটিয়ে আরাম করে শুয়ে-বসে আছে ওরা ঘাসের মধ্যে। অল্প বয়েসীগুলো অলস চোখে তাকালো প্লেনের দিকে, বয়স্কগুলো চোখই মেললো না। কালো কেশরওয়ালা বিশাল এক পশুরাজ চিত হয়ে আছে, বাঁকা করে চার পা তুলে রেখেছে আকাশের দিকে।

মারাত্মক ঝুঁকি নিয়ে মাটির একেবারে কাছাকাছি, সিংহগুলোর ওপরে চলে এলো মুসা। থ্রটল পুরোপুরি খুলে রেখেছে। প্রচণ্ড গর্জন করছে এঞ্জিন। এইবার একটা সিংহীর টনক নড়লো। বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে আর এখানে থাকা নিরাপদ মনে করলো না। প্লেনের দিকে চেয়ে একবার মুখ ভেঙচে উঠে দাঁড়ালো, তার শাবকগুলোকে জড়ো করে হেলেদুলে এগিয়ে চললো কয়েকটা গাছের দিকে।

আবার ফিরে এলো মুসা।

বিরক্ত হয়ে চোখ মেললো বুড়ো সিংহটা। বিকট হাঁ করে হুঙ্কার ছাড়লো একবার। 'দূর, এখানে ঘুমানো যায় নাকি? যত্তোসব!'—এরকম একটা ভাব করে উঠে দাঁড়ালো। রওনা হলো সিংহীটা যেদিকে গেছে সেদিকে। পরিবারের অন্যেরাও আর থাকলো না ওখানে। বুড়োর পেছন পেছন চললো।

ল্যাণ্ড করার জন্যে তৈরি হলো মুসা। প্রথমবার মাটিতে চাকা ছোঁয়াতে গিয়েও আবার তুলে ফেললো। সাহস হচ্ছে না। যদি ঝাঁকুনিতে ভেঙে পড়ে? দ্বিতীয়বারেও পারলো না। তৃতীয়বারে আর ভাবলো না।

জোর ঝাঁকুনি লাগলো, তবে ভাঙলো না বিমান। মোটামুটি ভালোই ল্যাণ্ড করেছে। ঝাঁকুনি খেতে খেতে ট্যাক্সিইং করে ছুটলো। খানিক দূর এগিয়ে বিশাল এক গাছের মাত্র কয়েক ফুট দূরে আরেকবার জোরে ঝাঁকুনি দিয়ে থেমে দাঁড়ালো বিমান, এঞ্জিন বন্ধ হয়ে গেছে।

ত্যা এলিয়ে পড়েছেন টমসন। নাড়ি দেখলো কিশোর। খুব মৃদু চলছে। আছে এখনও। তিনজনে মিলে ধরাধরি করে মাটিতে নামালো তাঁকে। কুঁড়ে থেকে বেরিয়ে দৌড়ে এলো একটা লোক। কুচকুচে কালো এক নিগ্রো। পরনে হালকা রঙের ইউনিফর্ম। মাথায় মিলিটারিদের মতো ক্যাপ, ওটার পেছনে ঝুলছে পাতলা কাপড়ের কেপি, ঘাড় ঢেকে দিয়েছে—পোকামাকড়ের জ্বালাতন থেকে বাঁচার ব্যবস্থা। তিন গোয়েন্দার বুঝতে অসুবিধে হলো না, লোকটা একজন রেঞ্জার।

'কি হয়েছে?' ভাঙা ইংরেজিতে বলতে বলতে অচেতন দেহটার পাশে হাঁটু গেড়ে বসে পড়লো সে।

'বিষ মাখানো তীর,' জানালো কিশোর।

ওয়ারডেনের বুকে কান রাখলো রেঞ্জার। 'মরেনি। জজের কাছে নিয়ে যাবো। ঠিক করে দেবেন।'

'জজ দিয়ে কি হবে? ডাক্তার দরকার।'

'জজই ডাক্তার। ভালো করে ফেলবেন।'

জজের ব্যাপারে কোনো প্রশ্ন করার প্রয়োজন মনে করলো না কিশোর। পকেট থেকে রুমাল বের করে বাঁধলো টমসনের হাতে, ক্ষতের কিছুটা ওপরে।

ওয়ারডেনকে বয়ে নিয়ে আসা হলো মূল কেবিনটাতে। ভেতরে কয়েকটা ভালো চেয়ার আছে, আর একটা বড় ডেস্ক। এই কেবিনেই ঘুমান তিনি, অফিসও এটাই। বিছানায় শোয়ানো হলো তাঁকে। হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকলেন ছোটখাটো একজন মানুষ।

'এই যে, জজ এসেছেন,' রেঞ্জার বললো। 'তিনি ঠিক করে দেবেন।'

চেহারা আর চামড়ার রঙ দেখেই বোঝা গেল জজের বাড়ি এশিয়ায়, সম্ভবত ভারতে। 'অ্যাকসিডেন্ট?' জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

সংক্ষেপে জানালো রবিন।

'আমি না থাকলে তো সর্বনাশ হতো,' জজ বললেন। 'ভাগ্যিস এসে পড়েছিলাম। যাকগে, আর কোনো ভয় নেই। সব ঠিক হয়ে যাবে।'

চুপচাপ জজকে দেখছে কিশোর। তার মনে হলো, টমসনের ভয়ানক বিপদে জজ মোটেও উদ্বিগ্ন নন। বরং যেন কিছুটা খুশিই লাগছে তাঁকে। কি জানি, হয়তো ওরকম হাসিখুশি স্বভাবই লোকটার। কিংবা হয়তো বুঝতে পারছেন, ভয়ের কিছু

নেই, সেরে উঠবেন ওয়ারডেন।

প্রথমেই হাত থেকে দ্রুত রুমালটা খুলে ফেলে দিলেন তিনি।

'এটা কি করলেন?' বলে উঠলো কিশোর। 'রক্তে বিষ আরও বেশি ঢুকে যাবে না?'

'যা গেছে তা গেছেই,' শান্ত কণ্ঠে বললেন জজ। 'আরও যাতে যেতে পারে সে-জন্যে খুললাম। এক জায়গায় আটকে রাখার চেয়ে সমস্ত সিসটেমে বিষ ছড়িয়ে দেয়াটাই ভালো। অ্যাকশন কমে যায় তাতে। বিশেষ করে অ্যাকোকেনথেরার।'

এরকম থিওরি জীবনেও শোনেনি কিশোর। ভাবলো, কি জানি, এখানকার বিষের ব্যাপারে নিশ্চয় জজ সাহেব তার চেয়ে ভালো বোঝেন। তর্ক করলো না। বললো, 'ডিসটিলড ওয়াটার দিয়ে ধুয়ে নিলে ভালো হতো না?'

'খারাপ হবে আরও, খোকা,' ধৈর্য ধরে ছেলেকে বোঝাচ্ছেন যেন অভিজ্ঞ পিতা। 'ওসব ধোয়ামোছা বাদ দিয়ে আগে ইনজেকশন দিতে হবে। বিষের প্রতিষেধক।'

'অ্যামোনিয়াম কারবোনেট?'

সরু হয়ে গেল জজের চোখ। ওই কিশোর ছেলেটা এতো কিছু জানে দেখে অবাক হয়েছেন যেন, কিছুটা অস্বস্তিও ফুটলো বুঝি চোখের তারায়। পরক্ষণেই মিষ্টি হাসি ছড়িয়ে পড়লো মুখে, দূর হয়ে গেল অস্বস্তি। 'এইবার ঠিক বলেছো। দেখি, ডিসপেনসারিতে আছে কিনা।'

ওঘর থেকে বেরিয়ে, বারান্দা দিয়ে গিয়ে আরেকটা ঘরে ঢুকলেন জজ। কৌতূহলী হয়ে তাঁর পিছু নিলো কিশোর। সময় মতোই গিয়ে ঢুকলো ডিসপেনসারিতে। দেখলো, তাকের সামনের সারি থেকে একটা বোতল তুলে নিয়ে সবগুলো সারির পেছনে রেখে দিচ্ছেন তিনি, এমন জায়গায়, সহজে যাতে চোখে না পড়ে। পায়ের শব্দে ফিরে তাকালেন। 'অ্যামোনিয়াম নেই। পেলে ভালো হতো। নেই যখন, কি আর করা? কোরামিনই দিতে হবে। হার্ট স্টিমুল্যান্ট। হৃৎপিণ্ডটাকে চাঙ্গা করে তুলতে হবে এখন।'

একমত হলো কিশোর। জজের ওপর ভক্তি ফিরে এলো আবার। কোরামিন খুঁজতে সাহায্য করলো তাঁকে।

'কিশোর! ও কিশোর!' রবিনের ডাক শোনা গেল। 'জলদি এসো! নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে গেছে!'

বেডরুমে ছুটে গেল কিশোর।

কাগজের মতো সাদা হয়ে গেছে ওয়ারডেনের চেহারা। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। দ্রুত গিয়ে তাঁর মুখে মুখ লাগিয়ে কৃত্রিম উপায়ে শ্বাস-প্রশ্বাস প্রক্রিয়া

চালাতে শুরু করলো সে।

চালিয়ে গেল, যতোক্ষণ না আপনাআপনি শ্বাস নিতে পারলেন টমসন। হৃৎপিণ্ডে উত্তেজক কিছু ঢোকাতে না পারলে থেমে যাবে আবার শিগগিরই। জজের হলো কি? সিরিঞ্জে কোরামিন ভরতে পারলেন না এখনও?

সিরিঞ্জ হাতে ঘরে ঢুকলেন জজ। টমসনের পাশে বসে সুচ লাগালেন ক্ষতে। ওখানে কে?—ভাবলো কিশোর। উরুতে দিলে ভালো হতো না? তারপর চোখ পড়লো সিরিঞ্জের ভেতরের তরল পাদর্থের ওপর, কালচে বাদামী।

আতঙ্কে দিশেহারা হয়ে গেল কিশোর। সুচ ঢোকানোর আগেই হঠাৎ জজের কব্জি চেপে ধরলো। কপাল কুঁচকে তার দিকে তাকালেন জজ।

'মাপ করবেন, স্যার,' হাত ধরে রেখেই বললো কিশোর।

'বোধহয় ভুল হয়েছে আপনার। রঙটা দেখুন। কোরামিন নয়, বরং অ্যাকোকেনথেরার মতোই লাগছে।'

সিরিঞ্জের দিকে তাকালো জজ, আঁতকে উঠলো। 'তাই তো! ঠিকই তো বলেছো। সর্বনাশ করে দিয়েছিলাম আরেকটু হলেই। পাশাপাশি দুটো বোতল ছিলো। তাড়াহুড়োয় কোরামিন ভরতে যেয়ে ভুলে আরেকটা ভরে ফেলেছি।'

প্রায় জোর করে সিরিঞ্জটা জজের আঙুলের ফাঁক থেকে বের করে নিয়ে ডিসপেনসারিতে রওনা হলো কিশোর। লোকটার ডাক্তারি বিদ্যার ওপর ভরসা নেই আর তার, সন্দেহ জাগছে। তবে ডিসপেনসারিতে ঢুকে সন্দেহ দূর হয়ে গেল। মিথ্যে বলেননি জজ। মাঝের তাকে পাশাপাশি দুটো বোতল রাখা আছে, একটাতে লেবেল লাগানো রয়েছে 'কোরামিন', আরেকটাতে 'অ্যাকো'। ওভাবে রাখাটা স্বাভাবিক। কারণ একটার পর পরই আরেকটা ব্যবহার হয়। রেঞ্জাররা যখন বড় কোনো জানোয়ার ধরে, চিকিৎসা করার জন্যে, ওটাকে বেহুঁশ করে নিতে হয় আগে। হাতি-গণ্ডার-জিরাফ-সিংহ কোনোটাই সচেতন অবস্থায় চিকিৎসা নিতে রাজি নয়। খুব সামান্য পরিমাণ অ্যাকোনাইট ঢুকিয়ে দেয়া হয় জানোয়ারের রক্তে, ডার্টের সাহায্যে। তাতে বেহুঁশ হয়ে যায় জীবটা। পরে কোরামিন দিয়ে ওটাকে আবার সুস্থ করে তোলা হয়।

জজের ওপর থেকে সন্দেহ চলে গেল কিশোরের। একজন ভদ্রলোককে সন্দেহ করেছিলো বলে লজ্জা লাগলো এখন। বিষ ভরা সিরিঞ্জটা ভেঙে ফেলে দিয়ে নতুন আরেকটা সিরিঞ্জ বের করে তাতে কোরামিন ভরে নিলো। ফিরে এসে জজকে অনুরোধ করলো, 'আমি পুশ করি, স্যার? পারবো, ফার্স্ট এইডের ট্রেনিং আছে আমার।'

নীরবে মাথা কাত করলেন জজ। সরে জায়গা করে দিলেন।

টমসনের উরুতে ইনজেকশন দিলো কিশোর। তারপর নাড়ি ধরে বসে রইলো চুপ করে। শ্বাস আর বন্ধ হলো না তাঁর। তবে নাড়ির গতিও বাড়ছে না, খুব ক্ষীণ। আধ ঘন্টা পর বাড়তে শুরু করলো। এতো দ্রুত, প্যালপিটেশন শুরু হয়ে গেল। ভালো লক্ষণ নয় এটা। ঘাবড়ে গেল সে। জজকে বললো সেকথা।

পায়চারি করতে করতে থমকে দাঁড়ালেন জজ। বললেন, 'ভয় নেই, ঠিক হয়ে যাবে। ওরকমই হয়।'

তা-ই হলো। ধীরে ধীরে কমে আবার স্বাভাবিক হয়ে এলো নাড়ির গতি।

সেকথা জানাতেই ধপ করে একটা চেয়ারে বসে পড়লেন জজ। ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেললেন। উদ্বেগ চলে গেল চেহারা থেকে। বললেন, 'ওকে হারালে মস্ত ক্ষতি হয়ে যাবে আমাদের। ওর মতো লোক এখন দরকার, বেচারা জানোয়ারগুলোকে বাঁচানোর জন্যে। পোচাররা শেষ করে ফেলবে সব। ওদের জ্বালায় অস্থির হয়ে আছি…ও হ্যাঁ, জানো না বোধহয়, আফ্রিকান ওয়াইল্ড লাইফ সোসাইটির আমি একজন ডিরেক্টর। ব্যাটাদের ধরতে পারলে,' দাঁত কিড়মিড় করলেন তিনি। 'আর যদি কোর্টে আমার সামনে পাই! এমন শাস্তি দেবো…কি যে কষ্ট দিয়ে মারে জানোয়ারগুলোকে, না দেখলে বুঝবে না!' চোখের কোণে পানি টলমল করে উঠলো তাঁর। তাকালেন ওয়ারডেনের দিকে। 'ও শুধু আমার বন্ধু না, ভাইয়ের মতো। ও না বাঁচলে…,' গলা ধরে এলো তাঁর। পকেট থেকে রুমাল বের করে চোখ মুছলেন।

কারও দুঃখ সইতে পারে না মুসা। তার চোখেও পানি এসে গেল। রবিন নীরব। শুধু কিশোরের কোনো ভাবান্তর নেই। চুপচাপ তাকিয়ে আছে জজের দিকে। চিন্তিত।

পাঁচ

নড়ে উঠলেন টমসন। দুই লাফে গিয়ে কিশোরকে সরিয়ে পাশে বসে পড়লেন জজ। ওয়ারডেনের হাত তুলে নাড়ি টিপে ধরলেন।

চোখ মেলতেই উদ্বিগ্ন, অশ্রুভেজা একটা প্রিয় মুখ দেখতে পেলেন টমসন। উষ্ণ আন্তরিক চাপ অনুভব করলেন হাতে। চুপ করে পড়ে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর কথা বললেন। দুর্বল কণ্ঠই বুঝিয়ে দিলো কতোখানি নরম হয়ে গেছে তাঁর শক্তিশালী শরীরটা। 'থ্যাঙ্ক ইউ…তুমি যে কতো উপকার করলে আমার!' ছেলেদের ওপর নজর পড়তে বললেন, 'পরিচয় হয়েছে?'

'না,' বললেন জজ। 'তোমাকে নিয়েই তো কাটলো। সময় আর পেলাম কই?'

'তাহলে তিন গোয়েন্দার সঙ্গে হাত মেলাও। ও কিশোর পাশা…মুসা আমান…রবিন মিলফোর্ড। ছেলেরা, এ হলো গিয়ে আমার প্রিয় বন্ধু জজ নির্মল পাণ্ডা। এবার নিয়ে কয়েকবার প্রাণ বাঁচালো আমার। তুমি না থাকলে, নির্মল…'

'আরে রাখো তো ওসব কথা,' বন্ধুকে থামিয়ে দিলেন জজ পাণ্ডা। মোলায়েম কণ্ঠে বললেন, 'এমন কোনো কঠিন কাজ ছিলো না। অবশ্য জানা থাকলে সব সহজই মনে হয়। একটা কোরামিন ইঞ্জেকশন, ব্যস।'

'অনেক কিছু জানে ও,' ছেলেদের কাছে বন্ধুর প্রশংসা করলেন ওয়ারডেন। 'কিভাবে কি করেছে ভালোমতো দেখেছো তো? শিখে রাখলে কাজ দেবে।'

'হ্যাঁ, তা দেখেছি,' জবাব দিলো কিশোর। 'খুব কাছে থেকেই দেখেছি,' জিভের ডগায় এসে গিয়েছিলো, 'না দেখলে এতোক্ষণে মরে যেতেন আপনি,' কিন্তু বললো না। তাড়াহুড়োয় ওরকম ভুল করতেই পারে লোকে, জজ সাহেব তো আর ডাক্তার নন। ডাক্তাররাও ভুল ওষুধ দিয়ে রোগী মেরে ফেলে অনেক সময়। তাছাড়া মিস্টার টমসনকে খুন করে তাঁর কি লাভ?

তবে, খুন করার ইচ্ছে থাকলে মস্ত একটা সুযোগ গেছে। ক্ষতের মধ্যে রয়েছে অ্যাকো বিষ, রক্তে ছড়িয়ে পড়েছে। আরও খানিকটা ইনজেক্ট করে ঢুকিয়ে দিলে কেউ ধরতে পারতো না, এমনকি ময়না তদন্তেও ফারাকটা বোঝা যেতো না। দূর, কি আজেবাজে কথা ভাবছে! নিজেকে ধমক দিয়ে জোর করে ভাবনাটা মন থেকে সরিয়ে দিলো কিশোর। ওই তো বসে আছেন হাসিখুশি ছোট্ট মানুষটা, নিষ্পাপ-চেহারা, বন্ধুর জন্যে 'জান কোরবান'।

'শুনে খুশি হবে, নির্মল,' ওয়ারডেনের গলার জোর কিছুটা বেড়েছে। 'ছেলেগুলোর সুনাম আছে আমেরিকায়। এই বয়েসেই তুখোড় গোয়েন্দা হয়ে গেছে। এমনকি পুলিশের চীফ পর্যন্ত ওদেরকে সার্টিফিকেট দিয়ে দিয়েছে। বেড়াতে এসেছে এখানে। খুব রেগেছে পোচারদের কথা শুনে। আমাদের সাহায্য করবে কথা দিয়েছে।'

'আচ্ছা! তাই নাকি?' মিষ্টি করে হাসলেন জজ। 'খুব ভালো কথা। তবে ছেলেরা, সাবধান করে দিচ্ছি। এটা আমেরিকা নয়। আর হারানো আঙটি কিংবা বাচ্চার পুতুল খুঁজে দেয়ার ব্যাপারও নয়। এখানে একদল খুনীকে নিয়ে কারবার। এই তো, একটু আগেই তো দেখলে, ওয়ারডেনকেই শেষ করে দিচ্ছিলো।'

'নির্মল, এতো ছোট করে দেখো না ওদের। অনেক অভিজ্ঞতা আছে, খুনে-বদমাশও ধরেনি তা নয়। আমাজানের গভীর জঙ্গল থেকেও ঘুরে এসেছে ওরা, নরমুণ্ড শিকারীদের খপ্পর থেকে পালিয়ে এসেছে, ধরে নিয়ে এসেছে অনেক দুর্লভ, ভয়ঙ্কর জানোয়ার।'

'কিন্তু তবু,' নরম গলায় প্রতিবাদ করলেন জজ। 'পোচারদের সঙ্গে কারও তুলনা হয় না।'

'সেটা ঠিক। তবে আমরা নরম হয়ে আছি লোকবল নেই বলে। কাল থেকে বোধহয় আর থাকবো না।'

'কেন?'

'আরও জনা তিরিশেক রেঞ্জার আসছে।'

'কখন?'

'আশা করছি কাল দুপুরে।'

হঠাৎ কি মনে পড়তে যেন চমকে উঠলেন জজ। 'হায় হায়, অনেক দেরি হয়ে গেছে। জরুরী কাজ আছে, ভুলেই গেছি। নাইরোবিতে যাচ্ছিলাম। ভাবলাম, পথেই যখন পড়লো দেখা করে যাই। মনে হয় তোমার ভাগ্যই আমাকে এখানে নিয়ে এসেছিলো। যাকগে, উঠি, নইলে রাতের আগে পৌছতে পারবো না। ও, আসল কথাটাই এখনও জানা হয়নি। তীরটা কোন জায়গায় খেলে?'

'পশ্চিমে ক্যাম্প করেছে ব্যাটারা। এখান থেকে মাইল সাতেক হবে।'

'তাহলে তো কাছেই। লোকও যখন পাচ্ছো, আশা করি ধরে ফেলতে পারবে। তোমাদের সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুশি হলাম, বয়েজ। আবার সাবধান করছি। মনে রেখো, এটা আমেরিকার আধুনিক শহর নয়,' বলে, আবার একটা মিষ্টি হাসি উপহার দিয়ে বেরিয়ে গেলেন জজ।

'দিন একটা গেল বটে তোমাদের!' জোরে নিঃশ্বাস ফেললেন জজ। 'আমার জন্যে আর ভেবো না, ঠিক হয়ে যাবো। যাও, গিয়ে বিশ্রাম নাও। তিন নম্বর ব্যাণ্ডায় তোমাদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছে। কিছু দরকার হলে যে-কোনো একজন রেঞ্জারকে ডেকে বলো। ওদেরকে নির্দেশ দেয়া আছে।'

কেবিন থেকে বেরিয়ে দেখলো ওরা, একটা গাড়ি চলে যাচ্ছে। নিশ্চয় জজ নির্মল পাণ্ডার গাড়ি। ভুরু কুঁচকে তাকালো কিশোর। ওদিকে যাচ্ছে কেন? নাইরোবির সড়ক তো উত্তরে। ওটা যাচ্ছে পশ্চিম দিকে!

পড়ন্ত বেলার রোদ লাগছে চোখেমুখে। চোখ ছোট ছোট করে গাড়িটার দিকে তাকিয়ে রইলো ওরা, যতোক্ষণ না ওটা ছায়াঢাকা বুনোপথে ঢুকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

'খাইছে!' বলে উঠলো মুসা। 'ওদিকে গেল কেন? নাইরোবি তো ওদিকে নয়।'

'লোকটার আচরণ ভারি অদ্ভুত লেগেছে আমার,' রবিন বললো।

কিশোর কিছু বললো না। ঘন ঘন চিমটি কাটছে নিচের ঠোঁটে।

*

কেবিন, বা কটেজের আফ্রিকান নাম, ব্যাণ্ডা। তিন নম্বর ব্যাণ্ডায় বেশ বড় একটা লিভিংরুম আছে, বড় বড় চেয়ারে আরাম করে বসা যায়। ওপর দিকে তাকালেই চোখে পড়বে খড়ের চালায় অসংখ্য টিকটিকি, মাছি পেলেই ঝাঁপিয়ে পড়ছে, ধরে খেয়ে ফেলছে। পাশেই বেডরুম, তাতে তিনটে বিছানা পাতা। গোসলখানা আছে, ভাঁড়ার ঘর আছে। সব চেয়ে লোভনীয় মনে হলো ওদের কাছে, রেলিঙে ঘেরা বেশ ছড়ানো একটা বারান্দা। ডাইনিং টেবিল আছে ওখানে, আর কিছু ক্যাম্প চেয়ার—বসে বহুদূর পর্যন্ত দেখা যায়। জন্তুজানোয়ার আর প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখতে পারবে যতো খুশি।

তিরিশ ফুট দূরে আলাদা একটা কুঁড়েতে রান্নাঘর বানানো হয়েছে। একটা আফ্রিকান ছেলে দৌড়ে এসে জিজ্ঞেস করলো, খাবার লাগবে কিনা। হাসি এসে গেল মুসার।

খোলা জায়গায় বসে খাওয়া আর চমৎকার প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখা চললো একই সঙ্গে। সবুজ উপত্যকার পরে লাল পাহাড়, দূরে নীলকিলিমানজারো পর্বতের উনিশ হাজার ফুট উঁচু তুষারে ঢাকা চূড়া।

উপত্যকা থেকে রোদ চলে গেছে। নামছে গোধূলির আবছা অন্ধকার। কিন্তু সূর্য যে একেবারে ডুবে যায়নি, কিলিমানজারোর চকচকে চূড়ার দিকে তাকালেই বোঝা যায়। সাদা তুষার এখন গাঢ় লাল। সূর্য যতোই দিগন্তের নিচে হারিয়ে যেতে লাগলো, ফ্যাকাসে হয়ে গেল লাল রঙ, শেষে আর কিছুই থাকলো না। ঝুপ করে হঠাৎ যেন নেমে এলো অন্ধকারের চাদর। আকাশে ফুটলো বড় বড় উজ্জ্বল তারা।

দূরে দূরে ছিলো এতোক্ষণ জন্তুজানোয়ারেরা,রাত নামতেই খাবারের গন্ধে আর পানির লোভে পায়ে পায়ে এসে হাজির হলো অনেকে।

বসে বসে কিছুক্ষণ দেখলো ছেলেরা। সারা দিন প্রচণ্ড পরিশ্রম গেছে। ঘুমে জড়িয়ে এলো চোখ। বসে থাকতে পারলো না আর। উঠে, শুতে চললো।

ছয়

ওদের মনে হলো, সবে শুয়েছে এই সময় দরজায় থাবা দিয়ে জাগিয়ে দেয়া হয়েছে। চোখ মেলে দেখলো, বাইরে অন্ধকার কেটে গেছে। খোলা জানালা দিয়ে দেখা যাচ্ছে ভোরের ধূসর আকাশ।

দরজা খুলে ঘরে ঢুকলেন টমসন। 'সকালের পেট্রলে যেতে চাও? জানোয়ার

দেখার এটাই সবচেয়ে ভালো সময়।'

ওয়ারডেনকে দেখে অবাক হলো তিন গোয়েন্দা। অসামান্য ক্ষমতা তাঁর শরীরের। এতো বড় একটা ধকলের পর এতো তাড়াতাড়ি সামলে নিলেন!

'আপনার হাত কেমন?' ব্যাণ্ডেজ বাঁধা হাতের দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলো কিশোর।

'ভালোই। এই যে, নাড়তে পারছি। কপাল ভালো, মাংসে গেঁথে ছিলো তীরটা, হাড়-টাড়ে লাগেনি। ক'দিনেই ভালো হয়ে যাবে। ওঠো, উঠে কাপড় পরে নাও। আমি কফির কথা বলছি।'

হাতমুখ ধুয়ে কাপড় পরে বারান্দায় এসে দেখলো ওরা, টেবিলে বড় এক পাত্র কফি আর কয়েকটা কাপ সাজানো। বাইরে এখনও কুয়াশা। কিলিমানজারোর নিচের অংশটা দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু রোদ পড়ে চকচক করছে চূড়া। কাঁচা রোদে এখন হয়ে গেছে সোনালি। ভাসছে যেন কুয়াশার ওপর। দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল তিন গোয়েন্দা।

মুসাকে ঘন ঘন রান্নাঘরের দিকে তাকাতে দেখে হেসে ফেললেন টমসন। 'এখানে অন্যরকম নিয়ম আমাদের। ভোর বেলা অলস হয়ে থাকে জানোয়ারের দল, বেশির ভাগই বাইরে থাকে। টুরিস্টদেরকে তাই এই সময়ই দেখানোর জন্যে নিয়ে যাওয়া হয়। শুধু কফি খেয়েই চলে যাই। ন'টার দিকে ফিরে এসে নাস্তা।'

'টুরিস্ট কই?' রবিন জিজ্ঞেস করলো। 'আর কাউকে তো দেখছি না। ওই ব্যাণ্ডগুলো সব খালি নাকি?'

'হ্যাঁ,' জানালেন ওয়ারডেন। 'এখন টুরিস্ট সীজন নয়। তবে আগে এসময়ও কিছু কিছু আসতো। এখন সীজনের সময়ও আসে না, পোচারদের জ্বালায়। শয়তানগুলোকে দমাতে না পারলে কেনিয়া সরকারের একটা বড় ইনকাম নষ্ট হয়ে যাবে।'

কফি খেয়ে এসে ওয়ারডেনের ল্যাণ্ড রোভারে উঠলো সবাই। আধ মাইল এগোতেই দেখা গেল, সামনে পথ রুদ্ধ। এক পাল মোষ দাঁড়িয়ে আছে। শ'খানেকের কম হবে না। বিশাল কালো শরীর, মস্ত শিং।

গাড়ি থামিয়ে দিলেন টমসন। 'ভেতর দিয়ে যাওয়া যাবে না।'

দলের সব চেয়ে বড় মোষটা শিং বাগিয়ে তেড়ে এলো, থেমে গেল গাড়ির বিশ ফুট দূরে। ভয়ানক ভঙ্গিতে শিং নেড়ে হুমকি দিলো।

'ব্যাটা দলের সর্দার,' নিচু কণ্ঠে বললেন টসমন। 'বিপদ বুঝলেই হামলা চালাবে। চোখের পলকে সব ক'টা এসে ঝাঁপিয়ে পড়বে আমাদের ওপর।'

'খাইছে! তাহলে?' কুঁকড়ে গেল মুসা।

'বসে থাকতে হবে আমাদের। ওরা চলে গেলে তারপর এগোবো।'

মাটিতে পা ঠুকে কিছুক্ষণ ফোঁস ফোঁস করলো মোষটা। প্রতিপক্ষকে লড়াই ঘোষণা করতে না দেখে যেন নিরাশ হয়েই ফিরে চললো। কয়েক কদম গিয়ে ফিরে চেয়ে বিচিত্র একটা শব্দ করলো, যেন 'ভীতুর ডিম' বলে ব্যঙ্গ করলো। তারপর গিয়ে ঢুকলো পালের মধ্যে। উত্তেজিত হয়ে সর্দারের হাবভাব লক্ষ্য করছিলো দলটা, ভাটা পড়লো উত্তেজনায়। কেউ মুখ নামিয়ে ঘাস ছিঁড়তে শুরু করলো, কেউ বা বাচ্চার পরিচর্যায় মন দিলো। কয়েক মিনিট ওভাবেই কাটানোর পর রওনা হলো দলটা। হারিয়ে গেল বনের ভেতরে।

আবার চললো ল্যাণ্ডরোভার। 'পোচারস লুকআউটে চলে যাবো,' বললেন ওয়ারডেন।

খোলা জায়গা পেরিয়ে বনে এসে ঢুকলো গাড়ি। জঙ্গল এখানে পাতলা, ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে গাছপালা। অ্যাকেইশাই বেশি। কাঁটা ঝোপঝাড় রয়েছে অনেক। ওগুলোর ফাঁকে ফাঁকে দেখা যাচ্ছে হার্টবীস্ট, ওয়াটারবাক, জেরিনুক, আর হাই-জাম্প লং-জাম্প দুটোতেই ওস্তাদ সুন্দর ইমপালা হরিণ। ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে পথের ওপর এসে পড়ছে 'বনের ভাঁড়' নামে পরিচিত শুয়োর, ওয়ার্টহগ। গাড়ি দেখে চমকে উঠে হাস্যকর ভঙ্গিতে শরীর মাথা নাচিয়ে গিয়ে আবার ঢুকে পড়ছে। বড় একটা গাছের মাথায় বসে থাকতে দেখা গেল এক ঝাঁক বেবুনকে। গাড়িটা নিচ দিয়ে যাওয়ার সময় কুকুরের মতো দাঁত ভেঙচে অনেকটা কুকুরের মতোই ঘেউ ঘেউ করে উঠলো।

এক জায়গায় দেখা গেল, গাছের ডাল-পাতা ভেঙে ভেঙে খাচ্ছে ডজনখানেক ছোট-বড় হাতি। একেবারে পাশ দিয়ে গেল গাড়িটা, ফিরেও তাকালো না ওরা। নিজের কাজে ব্যস্ত।

নানারকম জানোয়ার আর পাখি দেখতে দেখতে চলেছে ওরা। শটাশট ক্যামেরার শাটার টিপছে মুসা, যা দেখছে তারই ছবি তুলছে। কিশোরও তুলছে, তবে বেছে বেছে।

বন থেকে বেরিয়ে, উপত্যকা পেরিয়ে পাহাড়ের গোড়ায় পৌঁছলো ল্যাণ্ডরোভার। পাহাড়ী পথ বেয়ে উঠে এলো ওপরে, পোচারস লুকআউটে। টেলিস্কোপ চোখে লাগিয়ে যন্ত্রটার মতোই স্থির হয়ে আছে একজন রেঞ্জার। টমসন ডাকতে ফিরে চেয়ে স্যালুট করলো।

'কিছু দেখা যাচ্ছে?' জিজ্ঞেস করলেন ওয়ারডেন।

'তেমন কিছু না। শুধু শকুন।'

টেলিস্কোপে চোখ রেখে দেখলেন টমসন। সরে জায়গা করে দিলেন ছেলেদের

জন্যে। ওরাও একে একে দেখলো। বনের কিনারে আকাশে চক্কর মারছে কয়েকটা শকুন। মরা দেখতে পেলে যেমন করে।

'পোচার আছে?' কিশোর জিজ্ঞেস করলো।

'মনে হয় না। আমাদের লজ থেকে জায়গাটা মাত্র দু'মাইল। এতো কাছে আসার সাহস করবে না ব্যাটারা। তবু চলো, গিয়ে দেখি।'

গাড়ি চলে গেল ওখানে। ছোট ছোট কয়েকটা গাছের গোড়ায় পড়ে আছে বিরাট একটা দেহ। ধারেকাছে পোচারদের ছায়াও নেই। ওরা গাড়ি থেকে নেমে এগোতেই ডানা ঝাপটে উড়ে গেল কয়েকটা শকুন।

'গণ্ডার,' বললেন টমসন।

মৃত জানোয়ারটার পাশে গিয়ে দাঁড়ালো ওরা। পেটে পিপার মুখের সমান বড় এক ফোকর। ভেতরে নাড়িভুঁড়ি কিছু নেই, সব সাফ করে খেয়ে ফেলেছে। দুর্গন্ধে পাক দিয়ে ওঠে পেটের ভেতর। সইতে না পেরে নাকে রুমাল চাপা দিলো মুসা। রবিন তো 'ওয়াক থু' করে বমিই করতে বসে গেল।

উঁকি দিয়ে গর্তের ভেতরে দেখলো কিশোর। বিড় বিড় করলো, 'বেচারা! কি করে মরলো? অসুখে?'

'তাই হবে হয়তো,' মুসা বললো।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে গণ্ডারটার মাথার দিকে তাকিয়ে আছেন টমসন। 'ভুল করেছি আমি,' বললেন তিনি। 'ভেবেছিলাম, পোচাররা এতো কাছে আসার সাহস পাবে না, ভুল বলেছি। দেখো, শিং নেই। কেটে নিয়ে গেছে। গণ্ডারের শিং খায় না কোনো জানোয়ার। তার মানে পোচাররা নিয়ে গেছে। ওরাই মেরেছে এটাকে,' গলার কাছে একটা ক্ষত দেখালেন। 'দেখো, বল্লম দিয়ে মেরেছে।'

'ইস্, পিশাচ নাকি ওরা!' গণ্ডারটার ক্ষতবিক্ষত লাশের দিকে তাকাতে পারছে না রবিন।

'এটা আর এমন কি? ওদের নিষ্ঠুরতা তো দেখোইনি। চলো, দেখাবো।'

কয়েক মিনিট গাড়ি চালিয়ে একটা জায়গায় এসে থামলেন টমসন। 'এই যে, টিসাভো নদী।'

কোনো নদী চোখে পড়লো না ছেলেদের। শুধু কালো রুক্ষ একটা ছোট পাহাড়।

'কই, নদী কোথায়?' জিজ্ঞেস করলো মুসা।

'নদীর ওপর দিয়ে হেঁটেছো কখনও?' মুসার প্রশ্নের জবাব না দিয়ে বললেন ওয়ারডেন, হাসছেন মিটিমিটি। 'না হাঁটলে এটাই সুযোগ। হেঁটে নাও।'

কালো পাথরে উপত্যকার ওপর দিয়ে ছেলেদের নিয়ে চললেন তিনি।

একখানে থেমে জোরে লাথি দিলেন মাটিতে। ফাঁপা আওয়াজ হলো।

'লাভার স্তর মনে হচ্ছে?' কিশোর বললো।

'লাভা-ই। আদিমকালে কোনো সময় কিলিমানজারো থেকে নেমে এসে ঢেকে দিয়েছে নদীটা। আমাদের পায়ের নিচেই বইছে ওটা। ভাটির দিকে যাচ্ছি আমরা।'

যতোই এগোচ্ছে, কানে আসছে একটা ঝিরঝির শব্দ। বাড়ছে শব্দটা। শেষে, একটা টিলা ঘুরে এসে দেখতে পেলো, টিলার গোড়ার বিশাল ফোকর থেকে সগর্জনে ছিটকে বেরোচ্ছে তীব্রস্রোতা পাহাড়ী নদীর পানি। অতিকায় এক ড্রেনের মুখ দিয়ে বেরোচ্ছে যেন। নিচে যেখানে পড়ছে, বড় একটা দীঘি তৈরি করেছে সেখানে, কিংবা বলা যায় ছোট হ্রদ+হ্রদ থেকে বেরিয়ে উপত্যকা ধরে এঁকেবেঁকে বয়ে গেছে সরু নদী।

'এর নাম মিজিমা স্প্রিং। স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ থাকে পানি,' ওয়ারডেন বললেন।

কিন্তু এখন পানি পরিষ্কার নয়। লালচে বাদামী, দুর্গন্ধ হয়ে আছে।

'এতোক্ষণ নদীর ওপর দিয়ে এসেছো,' বললেন তিনি। 'এবার তলায় নিয়ে যাবো।'

ছেলেদের নিয়ে একটা ঝোপের ভেতরে ঢুকলেন টমসন। মাটিতে একটা গর্ত দেখা গেল। ওটা দিয়ে ঢুকে, ঢালু সুড়ঙ্গ বেয়ে একটা প্রাকৃতিক গুহায় এসে ঢুকলো ওরা। গুহাটাকে কেটে ঘরের মতো বানিয়ে নেয়া হয়েছে। আণ্ডারওয়াটার অভজারভেটরি, নদীর তলার দৃশ্য দেখার জন্যে। জানালার ভেতর দিয়ে নদীর নিচটা দেখা গেল পরিষ্কার। পানির ওপরে রোদ ঝলমল করছে, নিচেও আসছে আলো।

জানালার কাচে নাক ঠেকালো তিন গোয়েন্দা। বাইরের দৃশ্য দেখে গা গুলিয়ে উঠলো। অসংখ্য জলহস্তী, নদীর তলায় চরে বেড়াচ্ছে না আর ওগুলো, জলজ ঘাস ছিঁড়ে খাচ্ছে না, মরে ফুলে ঢোল হয়ে আছে। মরা লাশের স্তূপ, কোনো কোনোটা বেশি ফুলে গিয়ে ভেসে উঠেছে ওপরে। মারাত্মক ক্ষতগুলো থেকে এখনও রক্ত চুঁইয়ে বেরিয়ে মিশে যাচ্ছে পানির সঙ্গে। লেজ কাটা। জায়গায় জায়গায় চামড়া ছিলে নেয়া হয়েছে। বড় বড় শ্বদন্তগুলো সব উপড়ে তুলে নিয়ে গেছে পোচাররা। কিছু জানোয়ারের মাথা কেটে নিয়ে গেছে, বিশেষ করে মাদীগুলোর।

কয়েকটা শিশু জলহস্তী এখনও জীবিত, ক্ষুধায় কাহিল হয়ে বার বার গিয়ে নাক ঘষছে মৃত মায়ের গায়ে। অবোধ শিশুগুলো বুঝতে পারছে না, আর কোনোদিন জাগবে না মা, আদর করে গা চেটে দিয়ে দুধ খাওয়াবে না।

বড় বড় কুমির দল বেঁধে এসে মহানন্দে জলহস্তীর মাংস ছিঁড়ে-খাচ্ছে। বুড়ো

মাংসে অরুচি ধরে যাওয়াতেই বোধহয় কোনো কোনোটা মরা হাতি বাদ দিয়ে শিশু হাতির নধর কচি মাংস দিয়ে নাস্তা সারছে। বিরাট হাঁ একেকটার, আর ইয়া বড় বড় দাঁত। দেখলে গায়ে কাঁটা দেয়। মাঝে মাঝে লড়াই লেগে যাচ্ছে পছন্দসই মাংসের মালিকানা নিয়ে, শক্তিশালী লেজের জোরালো ঝাপটায় আলোড়িত হচ্ছে পানি। শুধু কুমিরই না, শ'য়ে শ'য়ে মাংসাশী মাছও গপ গপ করে গিলছে জলহস্তীর মাংস।

বেশিক্ষণ এই দৃশ্য দেখা যায় না। জানালার কাছ থেকে সরে এলো ছেলেরা। নীরবে ফিরে চললো ওয়ারডেনের পিছু পিছু। রবিন নীরব। কিশোরের চেহারা থমথমে। মুসার চোখে পানি। পোচার ধরতে টমসনকে সাহায্য করবে কথা দিয়েছিলো ওরা। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলো এখন, দলের সবক'টার হাতে হাতকড়া না পরিয়ে টিসাভো থেকে যাবে না।

ন'টার মধ্যেই লজে ফিরে এলো। নাস্তা করতে বসলো, কিন্তু রুচি নষ্ট হয়ে গেছে। মুসাও তেমন গিলতে পারছে না। বার বার চোখের সামনে ভাসছে অসহায় বাচ্চাগুলোর চেহারা।

সাত

সেদিনই বেলা বারোটার দিকে এলো তিরিশ জন লোক, লরিতে করে। তাদের স্বাগত জানালেন টমসন। দমে গেলেন মনে মনে। ট্রেইনড রেঞ্জার নয় একজনও। কুলিকামিন গোছের লোক। একজন ট্র্যাকার, আর দু'তিন জন পেশাদার শিকারী আছে, এককালে শ্বেতাঙ্গ শিকারীর সহকারী ছিলো ওরা, পয়সার বিনিময়ে টুরিস্টদের নিয়ে সাফারিতে যেতো। কি আর করা? নেই মামার চেয়ে কানা মামা ভালো, ভেবে নিজেকে প্রবোধ দিলেন ওয়ারডেন।

ব্যাণ্ডার পেছনে তাঁবু খাটিয়ে তিরিশ জন লোকের থাকার ব্যবস্থা হলো। খাবার এনে দিলো লজের বাবুর্চিরা।

খেতে খেতে ওদের সঙ্গে আলোচনা চললো। কাজটা কি, জেনেশুনেই এসেছে ওরা। মাসাই উপজাতির লোক, নেহায়েত মাংসের দরকার না হলে কখনও শিকার করে না। পোচারদের ঘৃণা করে। টিসাভোতে ওদের নিষ্ঠুর অত্যাচারের কাহিনী শুনে জ্বলে উঠলো সবাই। চেঁচাতে শুরু করলো, 'এক্ষুণি চলুন!' 'কল্লা আলাদা করে ফেলবো ব্যাটাদের!' 'খুন করে ফেলবো!'

বুঝিয়ে শুনিয়ে ওদের শান্ত করলেন ওয়ারডেন। বললেন, 'ব্যাটাদের খুন করতে পারলে আমিও খুশি হতাম। কিন্তু করা যাবে না। মানুষ খুনের অপরাধে

আমাদেরকেই জেলে যেতে হবে তাহলে।'

'তো কি করবো? এমনি এমনি ছেড়ে দেবো শয়তানগুলোকে?' রেগে উঠলো বিশালদেহী এক মাসাই, যেন একটা দৈত্য। ট্র্যাকারের কাজ করেছে অনেক দিন। নাম মুগামবি।

'ছাড়বো কেন? ধরে নিয়ে যাবো কোর্টে। ব্যস, আমাদের কাজ শেষ। এরপর ওদেরকে জেলে পাঠানোর দায়িত্ব জজ সাহেবের।'

'কিন্তু ধরবোটা কিভাবে? পায়ে গুলি করে?'

'না, বন্দুক নেয়া যাবে না সঙ্গে। উত্তেজনার সময় মাথা ঠিক থাকবে না। পায়ে না করে যদি মাথায় কিংবা বুকে গুলি করে বসে কেউ?'

'বুঝতে পারছেন না, ওদের সঙ্গে বিষাক্ত তীর আছে, বল্লম আছে। আমরা না মারলেও আমাদেরকে ছাড়বে না ওরা। ঠিক খুন করবে।'

'তা করবে,' স্বীকার করলেন ওয়ারডেন। 'সে-জন্যেই ওদেরকে ধরা খুব বিপজ্জনক হবে। জানোয়ারেরও অধম ওরা।'

হাসি মুছে গেছে মাসাইদের মুখ থেকে। খালি হাতে সিংহ ধরতে রাজি আছে ওরা, কিন্তু পোচার নয়।

'দেখ,' ওদের মনের কথা বুঝতে পেরে বললেন টমসন। 'নিজেদের ইচ্ছেয় এসেছো তোমরা, কাজ করলে পয়সা পাবে, এই শর্তে। যার পয়সার দরকার, যাবে আমার সঙ্গে, যার দরকার নেই, যাবে না। জোর করবো না কাউকে। ধরতে পারলে ধরবো, না পারলে ফিরে আসবো। পুলিশকে জানাবো। যা করার করবে ওরা। আমি বন্দুক সাথে নিয়ে গিয়ে খুনের আসামী হতে রাজি নই।'

নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটছিলো কিশোর। হাত তুললো, 'স্যার, তীর-ধনুক আর বল্লমও কি নেয়া যাবে না?'

'না। কারণ ওসব দিয়েও মানুষ খুন করা যায়। মারাত্মক অস্ত্র।'

'তাহলে, এমন কোনো অস্ত্র যদি নেয়া হয় সঙ্গে, যেটা অবশ্যই মারাত্মক, কিন্তু ব্যবহারের ওপর নির্ভর করে কতোখানি মারাত্মক হবে?'

ভুরু কোঁচকালেন ওয়ারডেন। 'কি বলতে চাইছো?'

হাসলো কিশোর। 'জানোয়ার ধরার অস্ত্র।'

'খুলে বলো। মনে হচ্ছে কোনো একটা প্ল্যান করেছো তুমি।'

খুলে বললো কিশোর।

আট

কয়েক মিনিট পর যখন রওনা হলো দলটা, দেখা গেল একজন মাসাইও বাদ পড়েনি। সবাই এসেছে। আর এসেছে টমসনের পাঁচজন রেঞ্জার। অন্য পাঁচজন ক্যাম্পে নেই, ডিউটিতে গেছে পার্কের বিভিন্ন জায়গায়, পোচার খোঁজার জন্যে।

তবে পাঁচজন রেঞ্জারের জায়গা দখল করার মতো পোচার-শিকারী একটা আছে দলে। মানুষ নয়, কুকুর। মিশ্র রক্ত ওর ধমনীতে। মা, এক শ্বেতাঙ্গ শিকারীর অ্যালসেশিয়ান; বাবা, আফ্রিকার জঙ্গলের ভয়ঙ্করতম শিকারী হিংস্র বুনো কুকুর। বনের মধ্যে অসহায় অবস্থায় বাচ্চাটা কুড়িয়ে পেয়েছিলো সাফারিম্যান কালিমবো, নিয়ে এসে যত্ন করে বড় করে তুলেছে, নাম রেখেছে সিমবা, অর্থাৎ সিংহ। গায়ে-গতরে সিংহের সমান না হলেও হিংস্রতায় যে পশুরাজকে ছাড়িয়ে যাবে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই মুসার। দেখেই সিমবাকে ভালোবেসে ফেলেছে সে, মনে মনে আফসোস করছে, ইস্, ওরকম একটা কুকুর যদি থাকতো তার!

পশ্চিমে এগিয়ে চলেছে জীপ, ভ্যান,ট্রাক আর লরির লম্বা মিছিলটা।

একেবারে সামনের ল্যাণ্ড-রোভারে রয়েছেন ওয়ারডেন, গাড়ি চালাচ্ছেন, পাশে কিশোর। মুসা আর রবিন বসেছে পেছনে।

'এমনও হতে পারে,' টমসন বললেন। 'লাগতেই আসবে না ওরা। এতোগুলো গাড়ি দেখলেই ভয়ে পালাবে।'

'ওরা পালাক, এটা নিশ্চয় চান না আপনি?' কিশোর বললো। 'ওদের ধরতে চান।'

'চাইলেই তো আর হবে না। ওদেরকেও এগিয়ে আসতে হবে।'

'আপনার কি মনে হয়, সত্যি পালাবে?'

'নির্ভর করে। নেতা না থাকলে পালাবে। আর সিলভার যদি সাথে থাকে, উত্তেজিত করে ওদেরকে, সাহস দেয়, তাহলে আক্রমণ করবে।'

আরে, তাই তো! কিশোর ভুলেই গিয়েছিলো সিলভারের কথা।

'ওই পালের গোদাটাকে ধরতে না পারলে হাজার পোচার ধরেও লাভ হবে না,' আবার বললেন টমসন। 'এক জায়গা থেকে তাড়ালে আরেক জায়গায় গিয়ে পোচিং শুরু করবে।'

'হুঁ!' মাতা দোলালো কিশোর।

আরও কয়েক মিনিট চলার পর গাড়ি থামাতে বললো সে। রবিন আর মুসাকে নিয়ে নেমে গিয়ে উঠলো সাপ্লাই ভ্যানে। আবার চললো মিছিল।

ক্যাম্প থেকে কয়েক ডজন ডার্ট নিয়ে আসা হয়েছে, ওগুলোতে ওষুধ ভরতে হবে। ডার্টগুলো দেখে মনেই হয় না, হাতিকে ঘুম পাড়িয়ে দিতে পারে নিমেষে। আট ইঞ্চি লম্বা, কড়ে আঙুলের মতো মোটা। এক মাথায় ইঞ্জেকশনের সুচের মতো সুচ, তবে আরও খাটো। আরেক মাথায় হালকা এক গুচ্ছ পালক বাঁধা, ভারসাম্য বজায় রেখে যাতে নিশানা মতো গিয়ে আঘাত হানতে পারে ডার্ট সে-জন্যে।

বার বার এপাশে ওপাশে মোড় নিচ্ছে গাড়ি, ভীষণ ঝাঁকুনি। জানালা দিয়ে মুখ বের করে দেখলো কিশোর। পথ ছেড়ে বিপথে নেমেছে ভ্যান, কিংবা বলা ভালো উঠেছে। চাকার নিচে ছোট ছোট টিলা-টক্কর। আশেপাশের কোনো কোনোটা বেশ বড়,পনেরো-বিশ ফুট উঁচু। উইয়ের ঢিবি। ছোটগুলোর ওপর দিয়ে চলেছে গাড়ি, বড়গুলোর পাশ কাটাচ্ছে।

ঢিবিগুলো পেরিয়ে এসে গাড়ি থামলো। সামনে পাঁচশো গজ মতো দূরে পোচারদের বেড়া। বেড়া থেকে দূরে গাড়ি থামানোর কারণ আছে। পোচাররা থাকলে তীর ছুঁড়তে পারে। বেশি কাছে গেলে গায়ে লাগবে তীর, ঝুঁকি নেয়ার মানে হয় না। তাই দূরেই রেখেছেন ওয়ারডেন।

'এসো, জলদি হাত লাগাও,' দুই সহকারীকে বললো গোয়েন্দপ্রধান। প্লাস্টিকের ব্যাগ খুলে ভ্যানের মেঝেতে ঢাললো ডার্টগুলো। বড় একটা শিশি বের করলো, তার মধ্যে পানির মতো পাতলা সাদাটে ওষুধ।

'জিনিসটা কি?' মুসা জিজ্ঞেস করলো। 'অ্যাকোর রঙ তো কালো…'

'এটা সেরনিল, মাসকিউলার অ্যানাসথেটিক। জানোয়ার ধরার জন্যে ব্যবহার হয়। রক্তে ঢুকলেই ঘুমিয়ে যায়।'

দ্রুত ডার্টে ওষুধ ভরে নিতে লাগলো ওরা। ভরা শেষ করে তিনটে চামড়ার বাকেটে ডার্টগুলো নিয়ে, নামলো ভ্যান থেকে। চলে এলো ল্যাণ্ড-রোভারের পাশে।

পোচারদের দেখা নেই। বেড়ার ওপাশে ওদের কুঁড়েগুলো আছে। আর আছে বেড়ার ফাঁকে ফাঁদে আটকা পড়া অসহায় জানোয়ারের দল। যন্ত্রণা আর আতঙ্কে চিৎকার করছে।

মাসাইরা সবাই নেমে এসেছে। তাদের মাঝে ডার্ট বিলি করে দিলেন ওয়ারডেন আর তিন গোয়েন্দা। বেড়ার দিকে মুখ করে পাশাপাশি এক সারিতে রাখা হয়েছে গাড়িগুলো। ওগুলোর সামনে লাইন দিয়ে দাঁড়ালো 'ঘুম-যোদ্ধারা'। ডার্ট ছোঁড়ার জন্যে নিশপিশ করছে হাত। কিন্তু শত্রু কই? অধৈর্য হয়ে আগে বাড়লো কয়েকজন মাসাই।

'এই, থামো!' চেঁচিয়ে বললেন ওয়ারডেন। 'কোথায় যাচ্ছো? পিছাও।'

'আরে, দেখো দেখো,' হাত তুললো মুসা। 'এহ্হে, সরে গেল! বেড়ার ফাঁক

দিয়ে মাথা বের করেছিলো। কালো চাপদাড়ি।'

কাউকে দেখলো না রবিন। কিশোরও না। সিলভার না তো?—ভাবলো সে। মুসা যখন বলছে দেখেছে, নিশ্চয় দেখেছে। তার কান আর চোখের ওপর পুরোপুরি ভরসা করা যায়।

দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে বিরক্ত হয়ে উঠেছে সবাই, কিন্তু কাউকে এগোতে দিলেন না ওয়ারডেন। কে জানে বেড়ার ওপাশে ঘাপটি মেরে আছে কিনা পোচাররা।

হঠাৎ তারস্বরে ঘেউ ঘেউ শুরু করলো সিমবা। ঝাড়া দিয়ে কালিমবোর হাত থেকে গলার বেল্ট ছাড়িয়ে ছুটে যাওয়ার জন্যে জোরাজুরি করতে লাগলো। ফাঁদে পড়ার ভয় আছে, ছাড়লো না তাকে তার মালিক।

অবশেষে, এক ফাঁকে দেখা দিলো একটা কালো মাথা। আরেক ফাঁকে আরেকটা। তারপর আরেকটা।

'ব্যাটারা দেখছিলো আমাদের,' রবিন বললো। 'বোঝার চেষ্টা করছিলো আমারদের উদ্দেশ্য।'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকালো কিশোর। 'নিরাপদ বুঝে এখন বেরিয়ে এসেছে।'

ঠিকই বলেছে দু'জনে। লুকিয়ে থেকে দেখছিলো পোচাররা। রাইফেল নেই দেখে সাহস পেয়ে বেরিয়ে এসেছে এখন। মুমূর্ষু জানোয়ারগুলোর আশপাশ দিয়ে পা টিপে টিপে বেরোলো ওরা। হাতে তীর-ধনুক, পিঠে বাঁধা বল্লম। ফলায় বিষ মাখানো, সন্দেহ নেই। বেড়ার এপাশে এসে সারি দিয়ে দাঁড়ালো ওরাও। জনা পঞ্চাশের কম না।

এমনভাবে চেয়ে আছে পোচাররা, যেন বিশ্বাস করতে পারছে না। গাধা নাকি! ক্যাম্প থেকে এসেছে শত্রু এলাকায়, অথচ সঙ্গে রাইফেল-বন্দুক কিচ্ছু নেই, শুধু ছোট ছোট কয়েকটা লাঠির মতো জিনিস। উপজাতীয় আধা-জঙলী ওরা, এ-ধরনের আধুনিক ডার্টগান দেখেনি জীবনে, অস্ত্রগুলোর মাহাত্ম্য জানে না। একজন তো হেসেই ফেললো। ব্যস, সংক্রামিত হয়ে গেল হাসিটা। হাসতে শুরু করলো সবাই। আর সে-কি হাসি! হাসতে হাসতে বাঁকা হয়ে গেল সবাই, উরুতে চাপড় মারছে ঠাস ঠাস করে। শেষে উল্লুকের মতো নাচতে আরম্ভ করলো। তীর ছুঁড়লো কয়েকজন। পাঁচশো গজ অনেক দূর, নিশানায় পৌছার বহু আগেই মাটিতে পড়ে গেল সেগুলো।

তীর-ধনুক আর বল্লম তুলে, শরীর সামান্য কুঁজো করে, এক পা এক পা করে এগোতে শুরু করলো পোচাররা। দেখে দেখে সাবধানে পা ফেলছে। নইলে নিজেদের পাতা ফাঁদে নিজেরাই আটকাবে। লম্বা ঘাসের ভেতরে পেতে রাখা

হয়েছে ওসব ফাঁদ।

'রেডি থাকো,' বললেন ওয়ারডেন। 'আমি না বললে ফায়ার করবে না কেউ।'

মাসাইদের অনেকে ইংরেজি বোঝে না। দেশীয় ভাষায় সেটা অনুবাদ করে বললো মুগামবি।

বেড়ার ওপাশ থেকে আদেশ শোনা গেল। এগোতে বলছে পোচারদের। আড়াল থেকে বেরিয়ে একটা ফাঁকে এসে দাঁড়ালো সে। দলের আর সবার মতো শুধু নেংটি পরা আধা-উলঙ্গ নয়। গায়ে বুশ জ্যাকেট, পরনে সাফারি ট্রাউজারস। দাড়িতে ঢাকা মুখ, চামড়ার রঙেই বোঝা যায় আফ্রিকান নয় লোকটা।

'ওই যে,' চেঁচিয়ে উঠলো মুসা। 'বলেছিলাম না। নিশ্চয় সিলভার।'

'আস্ত হারামী,' রবিন বললো। 'নিজে পেছনে থেকে দলের লোক পাঠিয়েছে। মরলে ওরা মরবে, তার কি?'

আবার আদেশ দিলো লোকটা। যাদের হাতে ধনুক ছিলো, তাড়াতাড়ি কাঁধে ঝুলিয়ে খুলে নিলো পিঠে বাঁধা বল্লম।

'বল্লম নিচ্ছে কেন?' রবিনের প্রশ্ন।

'তীর দিয়ে লঙ রেঞ্জে লড়াই করে,' ওয়ারডেন জবাব দিলেন। 'কাছে থেকে বল্লম বেশি মারাত্মক। ওরা মনে করেছে আমরা নিরস্ত্র, তাই কাছে এসে খুঁচিয়ে মারতে চাইছে। জানোয়ার মেরে সাহস এতো বেড়েছে, মানুষ মারতেও আর দ্বিধা নেই এখন। হুঁশিয়ার থাকবে। বল্লমের মাথায়ও বিষ লাগায়।'

টমসনের দিকে তাকিয়ে আছে মাসাইরা। কখন তিনি আদেশ দেন। কিন্তু চুপ করে রইলেন তিনি। বিশ ফুটের মধ্যে চলে এলো পোচাররা।

'রেডি!' চেঁচিয়ে বললেন ওয়ারডেন।

ডার্ট তুললো সবাই। নিজেদের কাছেই হাস্যকর লাগছে তাদের এই অস্ত্র, পোচাররা তো হাসবেই। আট ফুট লম্বা বিষাক্ত বল্লমের বিরুদ্ধে কয়েক ইঞ্চি লম্বা কতগুলো খাটো লাঠি! তবে, উগাণ্ডা কিংবা কঙ্গোর লোক হলে হাসতো না ওরা, ঠিকই বুঝতো বল্লমের চেয়ে কতো বেশি মারাত্মক 'লাঠিগুলো'। কেনিয়ায় এই অস্ত্র এখনও সাধারণ মানুষের কাছে অপরিচিত।

ভাবতে অবাক লাগছে কিশোরের, ডার্টগান কি সিলভারও চেনে না? নাকি দূর থেকে বুঝতে পারছে না?

দূর থেকে প্রথমে চিনতে পারেনি, বোঝা গেল। হঠাৎ চেঁচিয়ে কি বলতে শুরু করলো সে। সোয়াহিলি ভাষা। মুগামবি অনুবাদ করে বললো, 'চিনে ফেলেছে। ওদের ফিরে যেতে বলছে সে।'

চিনতে অনেক দেরি করে ফেলেছে সিলভার। লড়াইয়ের উন্মাদনা রক্তে নাচন

তুলেছে তখন পোচারদের, নেতার কথা শুনলো না। বিজয় তো অনিবার্য, কেন ফিরে যাবে? ফিরেও তাকালো না ওরা। বল্লম বাগিয়ে হল্লোড় করে ছুটে এলো।

'ফায়ার!' আদেশ দিলেন ওয়ারডেন।

চোখের পলকে ছুটে গেল একঝাঁক খুদে-বর্শা। কালো দেহগুলোতে বিঁধে গেল ইঞ্জেকশনের সুচ, চোখের পলকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ওষুধ ঢুকিয়ে দিলো শরীরে।

চমকে গেল পোচাররা। ওরা ভাবলো, অ্যাকো। টান দিয়ে দিয়ে শরীর থেকে খুলে ফেলতে লাগলো ডার্টগুলো। সুচের মাথা থেকে টপটপ করে ঝরছে সাদা তরল। অ্যাকোর রঙ কালচে বাদামী, এটার রঙ সাদা, তারমানে অ্যাকো নয়। আতঙ্ক দূর তো হলোই না, আরও বাড়লো ওদের। ভাবলো, অ্যাকোর চেয়েও খারাপ কোনো বিষ। ভয়েই পড়ে গেল কয়েকজন, মাটিতে পড়ে হাত-পা ছুঁড়তে শুরু করলো।

অ্যাকোর চেয়ে অনেক দ্রুত কাজ করলো সেরনিল। অবশ করে দিলো মাংসপেশী। ক্ষণিক আগের শক্তিশালী পাগুলো গেল দুর্বল হয়ে, শরীরের ভার রাখতে পারছে না আর। ভয়ে যারা পড়েছিলো, তারা বেহুঁশ হলো। যারা দাঁড়িয়ে ছিলো, টলে উঠে ধড়াস ধড়াস করে পড়তে লাগলো কাটা কলা গাছের মতো। আর যারা ডার্ট খেয়ে দৌড় দিয়েছিলো, তারাও বাঁচতে পাড়লো না, হুমড়ি খেয়ে পড়লো এক এক করে। কয়েকজন পড়লো সত্যিকার বিপদে। এলোপাতাড়ি দিশেহারা হয়ে ছোটার সময় মনেই রইলো না, ফাঁদ পাতা আছে। ধরা পড়লো ওই ফাঁদে। ভীষণ দুঃসাহসী কয়েকজন ভাবলো এমনিতেও মরেছি, ওমনিতেও, এগিয়ে এসে বল্লম দিয়ে খোঁচা মেরে তিনজন মাসাইকে আহত করে দিলো বেহুঁশ হওয়ার আগে।

যেমন শুরু হয়েছিলো তেমনি প্রায় হঠাৎ করেই শেষ হয়ে গেল লড়াই। ঘাসের ওপর লুটিয়ে আছে অসংখ্য কালো দেহ। ফাঁদে আটকা পড়েছে যারা, তারাও গোঙাচ্ছে না ব্যথায়, গভীর ঘুমে অচেতন।

'তোলো সব ক'টাকে,' ওয়ারডেন আদেশ দিলেন। 'খাঁচায় ভরো।'

পার্কের এক জায়গা থেকে অনেক সময় আরেক জায়গায় জানোয়ার স্থানান্তরের প্রয়োজন পড়ে, তখন ওসব খাঁচা ব্যবহার হয়। এতো বড় খাঁচা আছে, জিরাফকেও ভরে রাখা যায়। পাওয়ারওয়াগনে করে বয়ে নেয়া হয় সেসব খাঁচা। কিশোরের বুদ্ধিতেই কয়েকটা ওয়াগন নিয়ে আসা হয়েছে সঙ্গে করে, একটাতে হাতির খাঁচা। খুশি হয়েই অচেতন দেহগুলোকে বয়ে এনে খাঁচায় ভরতে লাগলো মাসাইরা।

ছোট জানোয়ারের ফাঁদে যারা ধরা পড়েছে তাদেরকে ছাড়ানো কঠিন হলো

না, মুশকিল হলো হাতি আর সিংহের ফাঁদে যারা আটকেছে। পায়ে কেটে বসেছে ইস্পাতের দাঁত।

ওরকম একটা ফাঁদের কাছে গিয়ে হাত নেড়ে ডাকলেন ওয়ারডেন তিন গোয়েন্দাকে।

কাছে গিয়ে দাঁড়ালো ওরা।

'আমাদের দু'জন রেঞ্জার এরকম ফাঁদেই আটকে মরেছে?' ওয়ারডেন বললেন। 'বোঝো এখন কারণটা। নিশ্চয় ভেবে অবাক হয়েছো, কেন ওরা নিজেদের ছাড়াতে পারেনি। মানুষের শরীরে দুটো চমৎকার টুলস আছে, হাত। জানোয়ারের নেই। দেখি তো, ফাঁদ থেকে খোলো তো লোকটাকে।'

কিশোর চেষ্টা করে বিফল হলো। রবিন গেলই না। শার্টের হাতা গুটিয়ে ব্যায়াম পুষ্ট পেশল বাহু বের করে বীর-বীক্রমে এগোলো মুসা আমান, ভাবখানা— এটা একটা কাজ হলো নাকি? ফাঁদের দুটো চোয়াল দুই হাতে ধরে টান দিলো। নড়লোও না ওগুলো। জোর বাড়ালো সে, কপালে ঘাম জমলো, চামড়া ফেটে বেরিয়ে আসবে যেন হাতের পেশী। শেষে হাল ছেড়ে দিয়ে ফোঁস করে মুখ দিয়ে বাতাস ছাড়লো। 'খাইছে! সাঙ্ঘাতিক শক্ত!'

'হ্যাঁ,' মাথা দোলালেন টমসন। 'হাতিও পা ছাড়াতে পারে না। খালি হাতে খোলা যাবে না, যন্ত্র লাগবে।'

কিশোর তাকিয়ে আছে ফাঁদ বাঁধার শেকলটার দিকে। দশ ফুট লম্বা লোহার শেকল, এক মাথা ফাঁদের সঙ্গে আটকানো, আরেক মাথা লোহার গজালের সঙ্গে। গজালটা মাটিতে পুঁতে দেয়া হয়েছে।

'কি ভাবছো বুঝতে পারছি,' হেসে বললেন ওয়ারডেন। 'রেঞ্জাররা ওই খুঁটি টেনে তুললো না কেন, এই তো? তাহলে ফাঁদ নিয়েই খোঁড়াতে খোঁড়াতে গিয়ে গাড়িতে উঠতে পারতো। তোমার তো দুটো পা-ই ভালো। যাও, দেখো ওপড়াতে পারো কিনা।'

টানতে টানতে নীল হয়ে গেল কিশোরের মুখ। তার সঙ্গে গিয়ে মুসাও হাত লাগালো। দু'জনে মিলে টেনেও নাড়তে পারলো না গজালটা। পোঁতা হয়েছে উইয়ের ঢিবিতে। গোলমাল শুনে বিরক্ত হয়েই যেন কি হচ্ছে দেখতে বেরোলো উইয়েরা।

'পারবে না,' মাথা নাড়লেন টমসন। 'খামোকা কষ্ট করছো। তিন ফুট লম্বা একেকটা। বড় হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে বসানো হয়েছে। উইয়ের ঢিবিগুলো দেখতে দেখা যাচ্ছে মাটি, আসলে সিমেন্টের মতো শক্ত। হাতির পায়ে শেকল বেঁধে দিয়ে দেখো, তারও টেনে তুলতে কষ্ট হবে। আর ফাঁদে আটকা থাকলে তো পারেই না,

ভীষণ ব্যথা লাগে পায়ে। যাও, সাপ্লাই ভ্যান থেকে শাবল নিয়ে এসো। চাড় মেরে খুলতে হবে।'

গিয়ে শাবল আনলো মুসা।

দাঁতের ফাঁকে শাবল ঢুকিয়ে চাড় দিয়ে চোয়াল দুটো ফাঁক করলেন টমসন। বেচারা লোকটার রক্তাক্ত পা-টা বের করে আনা হলো। মাংস কেটে হাড়ে গিয়ে বসেছিলো দাঁত। তাড়াতাড়ি অ্যানটিসেপটিক আর ব্যাণ্ডেজ এনে, ক্ষত পরিষ্কার করে বেঁধে দিতে লাগলো কিশোর।

নয়

'আরি!' বেড়ার দিকে তাকিয়ে আছে রবিন। 'দাড়িওয়ালা কোথায়?'

প্রচণ্ড উত্তেজনায় সিলভারের কথা ভুলে গিয়েছিলো সবাই।

হাঁটু গেড়ে বসে কিশোরের ব্যাণ্ডেজ বাঁধা দেখছিলো মুসা, লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালো। চেঁচিয়ে ডাকলো, 'মুগামবি, কালিমবো, জলদি এসো। সিমবাকে নিয়ে এসো।'

আগে আগে ছুটলো ট্র্যাকার মুগামবি, লম্বা ঘাস এড়িয়ে থাকছে যতোটা সম্ভব, যাতে ফাঁদে পা না পড়ে। তার পেছনে রইলো অন্যেরা।

বেড়ার একটা ফাঁক দিয়ে আরেক পাশে চলে এলো। কেউ নেই।

'কুঁড়েগুলোতে দেখো,' বলেই একটা কুঁড়ের দিকে দৌড় দিলো মুসা।

সব ক'টা কুঁড়েতে খুঁজে এলো সে আর কালিমবো। ফিরে এসে দেখলো, এক জায়গায় মাটিতে ঝুঁকে কি যেন দেখছে মুগামবি।

মাটিতে পায়ের ছাপের ছড়াছড়ি, পোচারদের নগ্ন পা। পাঁচটা করে আঙুলের ছাপ স্পষ্ট। ওগুলোর মাঝে এক সারি ছাপ আছে, যেগুলোর আঙুল নেই।

'বুট,' মুগামবি বললো। 'দাড়িওয়ালাটা। বুট পরেছিলো। ধরে ফেলা যাবে।'

বুটের ছাপ অনুসরণ করে চললো ট্র্যাকার। বারো-তেরো কদম এগিয়েই দাঁড়িয়ে গেল। চোখে বিস্ময়। ছাপ নেই আর। আচমকা যেন বাতাসে মিলিয়ে গেছে বুটধারী। গাছে চড়লো নাকি?

ওপরে তাকালো মুগামবি। নেই। একটা নিচু ডালও নেই, যেটাতে উঠতে পারবে বুট পরা লোকটা।

'মহা শয়তান,' বাতাসে থাবা মারলো মুগামবি। 'বুট খুলে নিয়েছে। কেউ যাতে পিছু নিতে না পারে।'

এখানেও পায়ের ছাপ অনেক আছে, বুট পরা একটাও নেই, সব নগ্ন।

সিলভারের ছাপ কোনটা এখন আর বোঝার উপায় নেই।

'সিমবা!' তুড়ি বাজালো মুসা। 'কুকুরটাকে দিয়ে চেষ্টা করালে কেমন হয়?'

ডেকে সিমবাকে সেই জায়গাটায় নিয়ে গেল কালিমবো, বুটের ছাপ যেখান থেকে শুরু হয়েছে। শুঁকতে বললো। কথা বুঝলো বুদ্ধিমান কুকুরটা। নাক নিচু করে বুটের ছাপ শুঁকলো কয়েকবার, ওপরে মাথা তুলে গন্ধ নিলো বাতাসে। ছাপ অনুসরণ করে চলে এলো যেখানে বুটের চিহ্ন শেষ হয়েছে। থেমে ওপরের দিকে নাক তুলে আবার গন্ধ শুঁকলো। মৃদু ঘড়ঘড় আওয়াজ বেরোচ্ছে গলা থেকে।

টমসনও এসে দাঁড়িয়েছেন। বললেন, 'কুকুরটা চালাক বটে। কিন্তু বুট আর খালি পায়ের ছাপ আলাদা করে চিনতে পারবে না।'

'দেখুন না কি করে?' হেসে বললো কালিমবো।

ফিরে গিয়ে আবার শুরুর জায়গায় বুটের ছাপ শুঁকলো সিমবা। তারপর আশপাশের অন্য ছাপগুলো। আশা-নিরাশায় দুলছে মুসার মন। সবই নির্ভর করছে এখন ছাপগুলো নতুন না পুরনো তার ওপর। নতুন হলে চামড়ার গন্ধে ঢাকা পড়ে যাবে লোকটার ঘামের গন্ধ। কিন্তু যদি পুরনো হয়, এই গরমে ঘামে ভিজে গন্ধ হয়ে যাবে জুতোর চামড়া, তীব্র সেই গন্ধ কিছুতেই ফাঁকি দিতে পারবে না কুকুরের প্রখর ঘ্রাণশক্তিকে।

হলোও তাই। খেঁকিয়ে উঠলো সিমবা। আবার নাক নামিয়ে বুটের ছাপ শুঁকলো। তারপর জোরে ঘেউ করে উঠে দৌড়ে এলো বুটের ছাপ যেখানে শেষ হয়েছে তার কাছে। কয়েকটা নগ্ন পায়ের ছাপ শুঁকলো। একটার কাছে এসে আরেকবার চেঁচিয়ে উঠে দিলো দৌড়। কয়েক পা গিয়ে আবার শুঁকলো। চললো আবার।

'পেয়েছে!' বাচ্চা ছেলের মতো হাততালি দিয়ে উঠলো মুসা। 'পেয়ে গেছে!' সে-ও ছুটলো কুকুরটার পেছনে।

কিন্তু লোকটা বোকা নয়। মাসাইদের সঙ্গে কুকুর আছে, নিশ্চয় দেখেছে। কিছু দূর গিয়ে আরেক ফন্দি করেছে ধোঁকা দেয়ার জন্যে। নিজের রক্তের ওপর পড়ে রয়েছে একটা মরা মোষ। সোজা গিয়ে সেই রক্তে পা ভিজিয়েছে সিলভার। পচা রক্তের গন্ধে ঢাকতে চেয়েছে নিজের গায়ের গন্ধ। মোষটার চারপাশে ঘুরেছে কয়েকবার, যতোক্ষণ না পা থেকে রক্ত মুছে গেছে, বালি লেগেছে পায়ে। তারপর অন্য আরও অনেক চাপের সঙ্গে পা মিলিয়ে চলে গেছে। এখন বের করবে কি করে সিমবা?

নিরাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন ওয়ারডেন।

কিন্তু কালিমবোর বিশ্বাস আছে তার কুকুরের ওপর?

ছাপ চিনতে বেশ দেরি হলো সিমবার। বিচিত্র ভঙ্গিতে মাথা ঝাড়ছে, যেন শিওর নয় সে।

তবে এখন তাকে সাহায্য করতে পারলো আরেক ওস্তাদ। পিছিয়ে গিয়ে সিলভারের খালি পায়ের ছাপ ভালো মতো দেখলো মুগামবি। মাপ নিলো। এগিয়ে এসে রক্তে ভেজা ছাপ মাপলো। বেরিয়ে যাওয়া ছাপগুলো থেকে ঠিক বের করে ফেললো, কোনটা দাড়িওয়ালার ছাপ। সিমবা যে জোড়া বেছে নিয়েছে, ওগুলোই।

'গুড,' বললো মুগামবি। 'আঙুলগুলো একটার সঙ্গে আরেকটা চেপে রয়েছে...বুট...যা সিমবা, এগো।'

'চেপে রয়েছে...বুট বলে কি বোঝালো?' জিজ্ঞেস করলো মুসা।

'বুটের জন্যে ওরকম হয়েছে বললো,' হাঁটতে হাঁটতে জবাব দিলেন টমসন। 'সব সময় কেউ শক্ত বুট পরে থাকলে পায়ের আঙুল পাশাপাশি চেপে মাঝের ফাঁক কমে যায়। আর যারা সব সময় খালি পায়ে হাঁটে তাদের আঙুল ছড়িয়ে যায়, বড় হয়ে যায় ফাঁক।'

কিছু দূর গিয়ে আবার নতুন কায়দা করেছে সিলভার। মোড় নিয়ে এগিয়ে সোজা নেমে গেছে টিসাভো নদীতে।

হতাশ হয়ে গর্জে উঠলো সিমবা। অ্যালসেশিয়ানের ডাকের সঙ্গে মিল নেই, একেবারে বুনো কুকুরের চিৎকার। আফ্রিকার তৃণভূমিতে, জঙ্গলে ওই ডাক অহরহ শোনা যায়।

'আর হবে না,' মুগামবিও হাল ছেড়ে দিলো। 'সরাসরি ওপারে গিয়ে নিশ্চয় ওঠেনি। হয় উজানে গেছে, নয়তো ভাটিতে। সাঁতরে ভাটিতে যাওয়ারই বেশি সুবিধে। অনেক দূর গিয়ে ওপারে কোনো ঝোপের ভেতর দিয়ে উঠে গেছে। হাজার খুঁজলেও পাওয়া যাবে না আর। আমি শিওর, ঘাসের ওপর উঠেছে সে। আর যা গরম। ঘাসের ওপর পড়ার সঙ্গে সঙ্গে শুকিয়ে গেছে পানি। ব্যাটা গেছে অনেকক্ষণ হয়েছে। আমরা যেতে যেতে ছাপের কোনো চিহ্নই থাকবে না।'

দশ

সাতচল্লিশ জন ঘুমন্ত পোচারকে মরা মাছের মতো গাদাগাদি করে ভরা হলো হাতির খাঁচার মধ্যে। অন্তত আরও ঘন্টা চারেক ঘুমিয়ে থাকবে ওরা, একশো তিরিশ মাইল পেরিয়ে মোমবাসা যাওয়ার জন্যে যথেষ্ট সময়। ওখানে জেলখানায় ঘুম ভাঙবে ওদের।

জেল-ওয়ারডেনের কাছে একটা নোট লিখে দিলেন টমসনঃ পোচিঙের

অপরাধে সাতচল্লিশ জন পোচারকে ধরে পাঠালাম, বিচারের জন্যে। একজন রেঞ্জারের হাতে নোটটা দিয়ে ওয়াগনের সঙ্গে যেতে বললেন।

অন্যদের থাকতে হবে, অনেক কাজ পড়ে আছে। শ'খানেকের বেশি জানোয়ার আটকা পড়ে আছে ফাঁদে, যেগুলো এখনও মরেনি, ছাড়াতে হবে।

মরা কিংবা মুমূর্ষু জানোয়ারগুলোকে মাছির মতো ছেঁকে ধরেছে শকুনের দল। মানুষ কাছে যেতেই উড়ে গেল। হায়েনা আর শেয়ালের পালও সরে গেল, একেবারে গেল না অবশ্য, মানুষ চলে গেলেই আবার আসবে।

ছাড়া পাওয়ার জন্যে ছটফট করছে কিছু কিছু জানোয়ার। তাতে গলায় আরও চেপে বসছে তারের ফাঁস, ধারালো ছুরির মতো চামড়া কেটে ঢুকে যাচ্ছে মাংসের গভীরে। রক্ত ঝরছে। এভাবে বেশিক্ষণ টানাটানি করতে থাকলে আপনা-আপনি জবাই হয়ে যাবে।

বাঁচার সম্ভাবনা আছে এমন কিছু জীবকে মারাত্মক ঝুঁকি নিয়ে ফাঁস-মুক্ত করলো মাসাইরা। যেগুলোর জখম কম, ছাড়া পেয়েই ছুটে পালালো। বেশি জখমিগুলোকে লরিতে তুলে নেয়া হলো, হাসপাতালে নিয়ে যাবে।

প্রতিটি ফাঁস কেটে দেয়া হলো, নষ্ট করা হলো মাটিতে পেতে রাখা ফাঁদ।

'কুঁড়েগুলোর কি হবে?' কিশোর জিজ্ঞেস করলো।

'বেড়া, কুঁড়ে, সব পুড়িয়ে দেবো,' বললেন ওয়ারডেন।

আগুন লাগানো হলো বেড়ায়। দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো এক মাইল লম্বা শুকনো কাঁটালতা। জিনিসপত্র সব বের করে এরপর কুঁড়েগুলোতেও আগুন লাগানো হলো। মনে হচ্ছে যেন দাবানল লেগেছে।

জিনিসগুলো আলাদা আলাদা জায়গায় জড়ো করা হয়েছে।

'জীবনে দেখিনি এরকম কাণ্ড!' আনমনে বিড়বিড় করতে করতে মাথা নাড়লো রবিন। চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে রয়েছে প্রায় তিনশো হাতির পায়ের দিকে। ফুটখানেক ওপর থেকে কেটে নেয়া হয়েছে, মাঝের হাড়মাংস সব ফেলে দিয়ে ওয়েইস্ট-পেপার বাস্কেট বানানো হবে।

আরেক জায়গায় স্তূপ করে রাখা হয়েছে অসংখ্য চিতাবাঘের মাথা। প্রতিটি মাথা কয়েক হাজার ডলারে বিকোবে। ইউরোপ-আমেরিকা থেকে সাফারিতে আসে লোকে। তাদের মাঝে অনেক ধনী মানুষ থাকে, যারা চিতাবাঘ শিকার করে মাথা নিয়ে গিয়ে নিজের বাড়ির ড্রইংরুমে সাজাতে চায়। চিতাবাঘ নিশাচর জীব, অসাধারণ ধূর্ত, দক্ষ শিকারীর পক্ষেও শিকার করা কঠিন। আনাড়ি টুরিস্ট সেটা পারে না। কয়েক রাত গাছের ডালে কিংবা মাচায় কাটিয়েই বিরক্ত হয়ে যায়। শেষে সহজ কাজটাই করে। সোজা গিয়ে নাইরোবি থেকে একটা মাথা কিনে নিয়ে

বাড়ি ফেরে, হয়তো বাহাদুরি দেখিয়ে বলে আমি মেরেছি। কে দেখতে আসছে, সে সত্যি কথা বলছে না মিথ্যে?

চিতাবাঘের মাথার পাশে জমানো হয়েছে চিতার চামড়া। সোফার কাভার হবে হয়তো ওগুলো দিয়ে, কিংবা ডিভানের পায়ের কাছের কার্পেট। শান্ত, ভদ্র, মিষ্টি যে মহিলাটি ঘর সাজাবেন ওগুলো দিয়ে, এয়ারগান দিয়ে শিকার করা চড়ুই পাখি ছেলের হাতে দেখলে শিউরে ওঠেন যিনি, মুহূর্তের জন্যেও ভাববেন না, শুধু তাঁর ড্রইংরুমের শোভা বাড়ানোর জন্যেই অকালে প্রাণ দিতে হয়েছে কতগুলো অপূর্ব সুন্দর জানোয়ারকে।

'ওগুলো কি?' কয়েকটা কাঠের পাত্রে রাখা অদ্ভুত কিছু বাঁকা বাঁকা চুল দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলো মুসা।

'মনে হয় হাতির চোখের পাপড়ি,' জবাব দিলো রবিন।

'দূর, কি বলো? ওসব দিয়ে কি করবে?'

'করবে বলেই তো নিয়েছে।'

'কি হয়?'

'আসলে হয়তো হয় না কিছুই,' সুযোগ পেয়ে বিদ্যে ঝাড়তে শুরু করলো বইয়ের পোকা শ্রীমান রবিন মিলফোর্ড, ওরফে চলমান জ্ঞানকোষ। 'সব কুসংস্কার। কিন্তু সিঙ্গাপুরে এর দারুণ চাহিদা। কুসংস্কারে বিশ্বাসী লোকেরা মনে করে, যার কাছে যতোটা হাতির চোখে পাপড়ি থাকবে, সে ততোটা ছেলেপুলের বাপ হবে। নানারকম অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারীও নাকি ওই চুল। বইয়ে পড়েছি, একজন পিগমী রাজা নাকি বায়ান্ন শো পাউণ্ড দামের হাতির দাঁত দিয়ে ফেলেছিলো শুধু একটি মাত্র পাপড়ি জোগাড়ের জন্যে। অ্যারাবিয়ানদের অনেকের কাছেও এর যথেষ্ট কদর। তাদের বিশ্বাস, ওই পাপড়ি দিয়ে মালা বানিয়ে গলায় ঝোলালে রাইফেলের গুলি লাগে না শরীরে, কাছে এসেও পাশ কাটিয়ে অন্যদিকে চলে যায়।'

'বাহ্, দারুণ বর্ম তো!'

'মালমশলা তো হাতের কাছেই আছে,' হেসে বললেন ওয়ারডেন। 'বানিয়ে ঝুলিয়ে ফেলো না একটা। তীর লাগবে না আর শরীরে।'

'ওদের মতো বলদ নাকি আমি?' মুখ বাঁকালো মুসা।

তার কথার ধরনে হা-হা করে হেসে ফেললেন টমসন।

কতগুলো গণ্ডারের শিং দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলো মুসা, 'রবিন, এগুলো দিয়ে কি হয়? পুড়িয়ে গুঁড়ো করে ফেলে গণ্ডারের মতো শিং গজায় নাকি ব্যাটাদের মাথায়? শত্রুকে গুঁতোতে পারে?'

ওর কথায় ওয়ারডেন তো হাসছেনই, কিশোর আর রবিনও হাসতে শুরু করলো। হাসতে হাসতেই রবিন বললো, 'এগুলোর বেশি ভক্ত চীনারা। গুঁড়ো করে চায়ের সঙ্গে মিশিয়ে খায়।'

'কেন, পাগলামি সারানোর জন্যে?'

'না, শক্তিশালী হওয়ার জন্যে। গায়ে নাকি গণ্ডারের জোর আসে, বুকে সিংহের সাহস।'

'হয়?'

'মনের জোর বাড়ে হয়তো। মানসিক ব্যাপার। কিন্তু ওদের ওই বিশ্বাসের কারণে সর্বনাশ হয়ে যাচ্ছে গণ্ডারের। ইনডিয়ান গণ্ডার তো শেষই করে দিয়েছে চীনারা, এ-হারে মারা পড়তে থাকলে আফ্রিকান গণ্ডারও শীঘ্রি খতম হয়ে যাবে। শেষে চিড়িয়াখানা ছাড়া আর কোথাও দেখা যাবে না ওদের।'

পুড়ে ছাই হলো বেড়া আর ঘাসের কুঁড়েগুলো।

ট্রাকে তোলা হলো সমস্ত হাতির দাঁত, লেজ, চোখের পাপড়ি, পায়ের পাতা, জলহস্তীর দাঁত আর চর্বি, জিরাফের লেজ, পেছনের পায়ের শিরা, সিংহের মাথা আর চর্বি, চিতাবাঘের মাথা, চিতার চামড়া, অ্যানটিলোপ আর গ্যাজেল হরিণের শিং, কুমির আর অজগরের চামড়া, ইগ্রেট, ফ্ল্যামিংগো, উটপাখি আর লম্বা-গলা ধবল-বকের পালক; আরও নানা রকম জানোয়ারের শরীরের বিভিন্ন অংশ। তারের ফাঁস আর নষ্ট ফাঁদগুলোও তুলে নেয়া হলো। নইলে অন্য পোচাররা এসে ওগুলো আবার কাজে লাগাবে।

'কি হবে ওসব দিয়ে?' কিশোর জিজ্ঞেস করলো। 'বিক্রি করবেন?'

'না,' বললেন ওয়ারডেন। 'নিরীহ পশুর রক্তে ভেজা ওই টাকা আমাদের চাই না। তার চেয়ে নিয়ে গিয়ে কোনো মিউজিয়মে রাখার ব্যবস্থা করবো। লোকে দেখবে। পোচারদের ওপর রাগ হবে তাদের, পোচিঙের বিরুদ্ধে তৈরি হবে শক্তিশালী জনমত। প্রতিবাদের ঝড় উঠবে।'

লজে ফিরে এলো গাড়ির মিছিল। ওয়ারডেনের ব্যাঙায় ঢুকলেন টমসন, সাথে তিন গোয়েন্দা। হাসিমুখে তাদের স্বাগত জানালেন জজ নির্মল পাণ্ডা। মুখে মোলায়েম হাসি।

'তুমি!' চেঁচিয়ে উঠলেন টমসন। 'দেখা হয়ে ভালোই হলো। নাইরোবিতে ঠিকঠাক মতো গিয়েছিলে তো?'

'হ্যাঁ। মোমবাসায় ফিরে যাচ্ছি। ভাবলাম, দেখেই যাই পোচারদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে কতোটা লাভ হলো।'

'লাভ মানে! বললে বিশ্বাস করবে না, সাতচল্লিশ জনকে ধরে পাঠিয়েছি

মোমবাসা জেলে। কাল সকালে হাজির করবে তোমার কোর্টে।'

'তাই নাকি, তাই নাকি? ভারি আনন্দের কথা,' জজের কণ্ঠ শুনে রবিনের মনে হলো, আনন্দে ঘড়ঘড় করছে যেন বেড়াল। 'হাতে পেয়ে নিই আগে, উচিত শিক্ষা দেবো ব্যাটাদের। পোচিঙের নাম ভুলিয়ে ছাড়বো। সর্দারটাকে ধরেছো?'

'সিলভার? নাহ্। পালিয়ে গেল।'

'হায় হায়, করলে কি? আসল বদমাশটাকেই ধরতে পারলে না। গিয়ে তো আরেক জায়গায় দল বানাবে, আর জানোয়ার মারা শুরু করবে। পালালো কিভাবে?'

'ভীষণ চালাক, ব্যাটা। দলের লোকদের আগে বাড়তে বলে নিজে রইলো পেছনে। দলের লোক যখন হেরে গেল, আমরা ওদেরকে ধরায় ব্যস্ত, সেই সুযোগে পালালো। কুকুর নিয়ে অনেক খুঁজলাম। পেলাম না। নদীতে নেমে গায়েব হয়ে গেছে।'

কুকুরটার দিকে তাকালেন জজ। 'বাহ্, ভারি সুন্দর কুকুর। একেবারে বাঘের বাচ্চা। এটাকে ফাঁকি দিয়েছে সিলভার?' হাত বাড়িয়ে মাথায় চাপড় দিতে গেলেন তিনি।

অপরিচিত লোককে পছন্দ করতে পারলো না সিমবা। মৃদু ঘড়ঘড় করে পিছিয়ে গেল। দাঁড়িয়ে গেল ঘাড়ের রোম। চোখ দেখে মনে হলো এখুনি ঝাঁপিয়ে পড়বে। তাড়াতাড়ি ওর কলার চেপে ধরলো মুসা। কি জানি কেন, শুরু থেকেই তাকে পছন্দ করে ফেলেছে সিমবা। কালিমবোর মতোই মুসার কথাও শোনে।

আরও দু'চারটে কথা বলে বিদায় নিয়ে বেরোলেন জজ। তাঁকে এগিয়ে দিতে চললেন ওয়ারডেন, পিছু নিলো তিন গোয়েন্দা।

তীক্ষ্ণ চোখে জজ সাহেবের গাড়িটা দেখছে কিশোর। নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটছে। আকাশ থেকেই দেখেছে নাইরোবি যাওয়ার কাঁচা সড়কটা লাল মাটিতে ঢাকা। গাড়ি চললেই লাল ধুলো ওড়ে। জমার কথা লাল ধুলো, অথচ তাঁর গাড়িটাতে পড়ে আছে সাদা ধুলোর হালকা আস্তরণ। বলেই ফেললো,'গাড়িটা পরিষ্কার পরিষ্কার লাগছে? লাল ধুলোয় ঢেকে থাকার কথা।'

অবাক হলেন জজ। সামান্য ওপরে উঠে গেল একটা ভুরু। তারপর হেসে ফেললেন। 'ও, হ্যাঁ হ্যাঁ, ভুলেই গিয়েছিলাম তোমরা গোয়েন্দা। তা বলেছো ঠিকই, ওই রাস্তায় একবার গেলেই লালে লাল। ফেরার সময় এতো ময়লা হয়ে গেল, শেষে পরিষ্কার না করিয়ে আর পারলাম না। পার্কে ঢোকার মুখেই পেট্রোল স্টেশনটা, ওখানে ওয়াশ করিয়েছি,' আবার হাসলেন। 'আর কোনো প্রশ্ন?'

'না,' লজ্জিত মনে হলো গোয়েন্দাপ্রধানকে। অভিনয় কিনা বোঝা গেল না।

জজ সাহেবও মাইণ্ড করেননি তার কথায়, অন্তত তাঁর চেহারা দেখে তা-ই মনে হলো। ওয়ারডেনকে বললেন, 'চলি, ডেভিড। সাবধানে থাকবে, ওই পোচার হারামজাদাগুলোর কথা কিছুই বলা যায় না। কখন আবার লুকিয়ে-চুরিয়ে তীর মেরে বসে,' তিন কিশোরকে বললেন। 'গোয়েন্দারা, আশা করি সিলভারকে ধরে ফেলতে পারবে। চলি, গুড বাই।'

এগারো

'কি ভাবছো, কিশোর?' পরদিন সকালে নাস্তার টেবিলে বসে জিজ্ঞেস করলেন ওয়ারডেন।

খাচ্ছে না কিশোর, বসে বসে ভাবছে। ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে কফি। মুসা আর রবিনের সঙ্গে এতোক্ষণ কথা বলেছেন তিনি, তাদের আলোচনায় যোগ দেয়নি সে।

মুখ তুলে হাসলো কিশোর। 'অ্যাঁ?'

'বলবে আমাকে?'

দ্বিধা করলো কিশোর। 'ইয়ে...আপনার বন্ধু...জজ নির্মল পাণ্ডা। খুব বিশ্বাস করেন তাঁকে, না?'

'করি,' স্বীকার করলেন টমসন। 'যখন-তখন অযাচিত ভাবে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়। আমার অনেক উপকার করেছে। এই তো, গত পরশুই তো আমার প্রাণ বাঁচালো। তোমরা দেখেছো।'

'উনি...,' বলতে গিয়ে কিশোরের চোখের দিকে চেয়ে থেমে গেল রবিন। আরেকটু হলেই বলে ফেলেছিলো—বাঁচাননি, বরং আমরা না থাকলে খুন করতেন।

'আর, একটা ব্যাপারে আমাদের খুব মিল,' বলে চললেন ওয়ারডেন। 'পোচার। আমিও ওদের দেখতে পারি না, সে-ও পারে না। ওকে না পেলে যে কি করতাম...আমি ওদেরকে ধরতে পারি, কিন্তু শাস্তি দেয়ার ক্ষমতা আমার নেই। শাস্তি দেয় নির্মল। সে ওদেরকে ফাইন করে, জেলে পাঠায়। পোচিঙের বিরুদ্ধে আইন খুব কড়া। কঠিন শাস্তি হয়, অনেক দিন জেল।'

'শাস্তি দেন তো ঠিকমতো?'

'বলে তো দেয়। আর বলে যখন, নিশ্চয়ই দেয়।'

'বিচারের সময় কখনও কোর্টে ছিলেন?'

'না, এতো বেশি ব্যস্ত থাকি, যেতে পারিনি। তবে আমার যাওয়ার দরকার

নেই। আমার কাজ আমি করি, ওর কাজ ও।'

ডিম ভাজার প্লেটটা টেনে নিলো কিশোর। নীরবে খেলো কয়েক মিনিট। হঠাৎ বললো, 'ভেরি ইনটারেস্টিং! জজ সাহেবের কথা বলছি, ভারি মজার মানুষ। তাঁর কাজ দেখতে খুব ইচ্ছে হচ্ছে। আজ অনেক লোকের বিচার করবেন। গিয়ে দেখতে পারবো?'

'আমি যেতে পারবো না,' মাথা নাড়লেন টমসন। 'তবে ইচ্ছে করলে তোমরা যেতে পারো। কিন্তু যাবে কিভাবে? যেতে-আসতে প্রায় আড়াইশো মাইল, পথও খুব খারাপ। এখানে আমি ছাড়া এখন আর কেউ নেই যে গাড়ি চালাতে জানে, নিয়ে যাবে তোমাদেরকে।...একটা কাজ করলে অবশ্য পারো। মুসা বেশ ভালো পাইলট, সেদিন স্টর্কটাকে যেভাবে সামলেছে শুনলাম। প্লেন নিয়ে যেতে পারো। বসো, আসছি।'

ডেস্ক থেকে একটা ম্যাপ বের করে নিয়ে এলেন তিনি। 'এই যে মোমবাসা...আর এই এখানে আমাদের লজ। জানো নিশ্চয়, শহরটা গড়ে উঠেছে একটা দ্বীপের ওপর। মেন ল্যাণ্ডের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে কজওয়ের সাহায্যে। এই এখানটায় হলো ল্যাণ্ডিংফীল্ড,' পেন্সিল দিয়ে একটা গোল দাগ দিলেন টমসন। 'প্লেন রেখে ট্যাক্সি নিয়ে আদালতে চলে যেও।...এই এখানটায় আদালত,' আরেকটা চিহ্ন আঁকলেন তিনি।

'লাইসেন্স লাগবে না?' রবিন জিজ্ঞেস করলো। 'মুসার তো প্লেন চালানোর লাইসেন্স নেই।'

'বলে দেবো শিক্ষানবীস। একটা চিঠি লিখে দেবো, এয়ারপোর্টের ম্যানেজারকে দেখিও, অসুবিধে হবে না,' মুসার দিকে ফিরলেন ওয়ারডেন। 'চলো, আরও প্র্যাকটিস করে নাও।'

এয়ারস্ট্রিপে এসে প্রথমে বিমানটায় তেল ভরলেন তিনি। দুই ডানার ট্যাঙ্ক তো বোঝাই করলেনই, পেছনের ইমারজেন্সি ট্যাঙ্কও ভরে দিলেন। বিমানের ভেতরের একটা হ্যাণ্ডপাম্প দেখালেন তিন গোয়েন্দাকে, প্রয়োজন হলে ওই পাম্পের সাহায্যে পেছনের ট্যাঙ্ক থেকে ডানায় তেল সরিয়ে আনা যায়।

ককপিটের যন্ত্রপাতিতে লেখা জার্মান শব্দগুলো পড়ে পড়ে বুঝিয়ে দিলেন কোনটা কোন যন্ত্র, কিভাবে কাজ করে।

'যাও, উড়ে এসো খানিকক্ষণ,' মুসাকে বললেন তিনি। 'ওঠা আর নামাটাই আসল, ভালোমতো প্র্যাকটিস দরকার।'

পাইলটের সীটে উঠে বসলো মুসা। রবিন আর কিশোরকে মানা করলো, 'তোমরা এখন না। আগে আমি দেখে আসি উড়ে।' 'কেন, আমাদের নিয়ে

প্র্যাকটিস হবে না?' রবিন বললো।

'হবে,' ঝকঝকে সাদা দাঁত বের করে হাসলো মুসা। 'তবে, অ্যাক্সিডেন্ট করে মরলে আমি বরং একাই মরি। তিনজন একসাথে মরে লাভ কি? কি বলো, কিশোর মিয়া? তুমি যেমন একা বুদ্ধির প্র্যাকটিস করো, আমিও এখন ফ্লাইং প্র্যাকটিস করি, নাকি?'

সুযোগ পেয়ে খুব একহাত নিচ্ছে তাকে মুসা, বুঝে মুখ গোমড়া করে সরে এলো কিশোর। রবিন তর্ক করতে লাগলো।

'মুসা ঠিকই বলেছে,' পক্ষ নিলেন ওয়ারডেন। 'মরবে না ও,' হাসলেন তিনি। 'অপরিচিত একটা মেশিনকে যেভাবে সামলেছে, শুনে অবাকই লেগেছে আমার। একেবারে জাত-বৈমানিক। ভবিষ্যতে ভালো পাইলট হবে...'

'তাহলে আর আমাদের যেতে অসুবিধে কি?' ফস করে বললো রবিন।

'তবু,' তার কথা কানে তুললেন না টমসন। 'ঝুঁকি নিয়ে লাভ নেই। অ্যাক্সিডেন্টের কথা কিছু বলা যায় না,' কিশোর আর রবিনের দিকে চেয়ে আবার হাসলেন। 'একজন জাত-বৈমানিকের সঙ্গে সঙ্গে হাত-পা ভেঙে অকেজো হয়ে থাকুক একজন জাত-গোয়েন্দা আর একজন জাত-গবেষক, তা-ও চাই না।'

হাসি ফুটলো গোয়েন্দাপ্রধান আর নথি-গবেষকের মুখে।

'তাহলে আসি,' হাত তুলে বিদায়ী ভঙ্গিতে সালাম জানালো মুসা, করুণ করে তোলার চেষ্টা করলো মুখটাকে। কিন্তু অভিনেতা নয় সে, হাসি ঢাকতে পারলো না। 'পাঁচ মিনিটের মধ্যেই ফিরে আসবো। যদি ভুলভাল বোতাম টিপে না বসি।'

উইণ্ড-সকের দিকে তাকালো সে। সামনের বড় বড় গাছগুলোর দিকে চেয়ে দমে গেল। সময় মতো উড়াল দিতে পারবে ওগুলোর মাথার ওপর দিয়ে! পারবে, পারবে, নিজেকে বোঝালো সে। মন শক্ত করে স্টার্ট দিলো এঞ্জিন। বুস্টার পাম্প পরীক্ষা করে দেখলো। তারপর অপেক্ষা করতে লাগলো অয়েল টেম্পারেচার বাড়ার জন্যে।

থ্রটল দিতেই ট্যাক্সিইং করে চললো প্লেন। গতি বাড়তে চাইছে না। দাঁতে দাঁত চেপে রেখেছে মুসা, যেন তাতেই শক্তি পাবে এঞ্জিন। আফসোস করছে, ইস্, ঘাসের না হয়ে যদি অ্যাসফল্টে বাঁধানো হতো স্ট্রিপটা! দুলছে প্লেন, ঝাঁকুনি খাচ্ছে, তবে গতি বাড়ছে দ্রুত।

কন্ট্রোলে নড়াচড়া করছে মুসার হাত। ঘাসের ওপর ভেসে উঠলো প্লেন।

তীব্র গতিতে ধেয়ে আসছে বড় বড় গাছগুলো। আড়াআড়ি বইছে বাতাস, ঠেলে নিয়ে যেতে চাইছে ডানে। প্লেনটা ছোট, ডানার দৈর্ঘ্য মাত্র উনচল্লিশ ফুট, অথচ এটার তুলনায়ও এয়ারস্ট্রিপটা সরু। প্লেন একটু এদিক ওদিক সরলেই

বিপদ। লেগে যাবে গাছের সঙ্গে।

শেষ মুহূর্তে ঝটকা দিয়ে নাক অনেকখানি উঁচু করে ফেললো বিমান। উড়ে বেরিয়ে গেল গাছের মাথার সামান্য ওপর দিয়ে। হাঁপ ছেড়ে বাঁচলো কিশোর বৈমানিক। আনমনেই হাসলো দাঁত বের করে। ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে এলো স্নায়ু।

গাছপালার ওপরে কিছুক্ষণ চক্কর দিয়ে বেড়ালো মুসা। শাঁ করে উড়ে গেল দুই বন্ধু আর ওয়ারডেনের মাথার ওপর দিয়ে। ওরা হাঁ করে তাকিয়ে আছে ওপর দিকে। হাত নাড়লো সে।

হয়ে গেছে। ওড়াটা কোনো কঠিন ব্যাপার নয়। এবার নিরাপদে নামতে পারলেই, ব্যস। পরশু জানতো না স্টর্কের ব্রেক কোথায়, আজ জানে। গাছ পেরিয়ে এসে নাক নামিয়ে দিলো বিমানের। ঝরা পাতার মতো যেন ঝরে পড়তে লাগলো বিমানটা, অন্তত তার তা-ই মনে হলো। ঘাস ছুঁলো চাকা। ব্রেক চাপলো সে।

ঝাঁকুনি এড়াতে পারলো না। এই নিয়ে যতোবার ল্যাণ্ড করেছে সে, যতো প্লেন, কোনোটাই মসৃণ ভাবে নামতে পারেনি। তার মানে ওই কাজটাই বেশি কঠিন। দক্ষ পাইলটের বাহাদুরিই ওখানটায়।

ট্যাক্সিইং করে আগের জায়গায় এসে থামলো বিমান। বাবল্‌ খুলে বেরিয়ে এলো মুসা।

'চমৎকার!' প্রশংসা করলেন টমসন। 'সত্যি, খুব ভালো উড়তে পারবে তুমি।'

'থ্যাঙ্ক ইউ, স্যার।'

মোমবাসায় যাওয়ার জন্যে তৈরি হয়ে প্লেনে চড়লো তিন গোয়েন্দা। এবার আর বিমান ওড়াতে কোনো অসুবিধে হলো না মুসার। ছ'হাজার ফুট ওপর দিয়ে টিসাভো নদী বরাবর এগিয়ে চললো পুবমুখো।

টিসাভো রেল স্টেশন পেরিয়ে ডানে মোড় নিলো। ম্যাপ দেখে দেখে বলে দিচ্ছে কিশোর, কোন দিকে যেতে হবে। নিচে এক পাশে লাল সড়ক, আরেক পাশে রেল লাইন।

'এই সেই জায়গা,' জ্ঞানকোষের পাতা খুললো যেন রবিন। 'অনেক রক্ত লেগে আছে ওই রেললাইনে। অনেক বছর আগের কথা। খবরের কাগজের পাতা খুললেই নাকি তখন দেখা যেতো সেই রোমাঞ্চকর হেডলাইনঃ আবার আঘাত হেনেছে টিসাভোর মানুষখেকো! ভয়ানক কতগুলো সিংহ মানুষখেকো হয়ে উঠেছিলো, রোজই ধরে নিয়ে যেতো রেললাইনের শ্রমিকদের। ওগুলোর যন্ত্রণায় রাতে ঘরেও থাকতে পারতো না শ্রমিকরা। বেড়া ভেঙে ঢুকে ধরে নিয়ে যেতো ভয়াবহ সিংহের দল। শেষে...'

বাঁয়ে গ্যালানা নদীর চকচকে রূপালী রূপ দেখে স্তব্ধ হয়ে গেল রবিন। চোখ বড় বড় করে দেখছে। সবুজ চাদরের ওপর অবহেলায় আঁকাবাঁকা হয়ে পড়ে থাকা একটা ফিতে যেন। সেই ভারত মহাসাগরে গিয়ে পড়েছে নদীটা, জানে সে। উত্তরে শত শত মাইল জুড়ে বিছিয়ে রয়েছে টিসাভো পার্কের বুনো প্রান্তর, মাঝে মাঝে ঠেলে উঠেছে লাল পাহাড়।

চোখে পড়লো লুগার্ডস ফল। জলপ্রপাতের নিচে যেন টগবগ করে ফুটছে পানি, পুরু হয়ে জমেছে সাদা ফেনা, অপরূপ লাগছে সকালের আলোয়। প্রপাতের পানি জমে এক জায়গায় একটা পুকুরমতো সৃষ্টি হয়েছে, তার পাড়ে ভিড় করেছে হাতি, গণ্ডার, জিরাফ। আশপাশে ছোট ছোট আরও অনেক ডোবা আছে, ওগুলোর পাড়ে নানারকম জন্তুজানোয়ারের ভিড়, পানি খেতে এসেছে। পাশের সবুজ তৃণভূমিতে চরছে মোষ, জেব্রা আর ওয়াইল্ডবীস্টের দল। ঝোপের কিনারে উঁকিঝুঁকি মারতে দেখা গেল একটা সিংহ পরিবারকে, শিকার ধরবে বোঝা যাচ্ছে। চিতাবাঘ একটাও চোখে পড়লো না। নিশাচর জীব ওরা, রাতে বেরিয়ে শিকার করে, দিনে ঘুমিয়ে থাকে পাহাড়ের গুহায়, কিংবা গভীর বনের অন্ধকারে।

এক গুচ্ছ গাছের ভেতর থেকে হালকা ধোঁয়া উঠতে দেখা গেল।

'পোচারদের ক্যাম্প?' কিশোর বললো।

'দেখো দেখো, ওই যে ট্র্যাপ-লাইন!' চেঁচিয়ে উঠলো মুসা। বেড়া বানিয়ে ফাঁদ পেতেছে পোচাররা, সেদিকে তাকিয়ে আছে সে। 'খাইছে। পাঁচ মাইলের কম হবে না।'

জোরে জোরে হিসেব শুরু করলো কিশোর, 'তারমানে ছাব্বিশ হাজার ফুট। প্রতি পাঁচ ফুট পর পর যদি একটা করে ফাঁদ পাতা হয়, তাহলে কম করে হলেও পাঁচশো ফাঁদ। এর অর্ধেক ফাঁদেও যদি জানোয়ার ধরা পড়ে…সর্বনাশ…!' থেমে গেল সে।

'অর্ধেক হবে কেন?' রবিন বললো। 'কাল যেটা নষ্ট করলাম আমরা, কোনো ফাঁকই বাদ ছিলো না। প্রত্যেকটাতে জানোয়ার পড়েছিলো। প্রতি হপ্তায় একবার করে ফাঁদ পরিষ্কার করে নতুন করে পাতে ব্যাটারা। তারমানে মাসে দু'হাজার! নাহ্, আমার বিশ্বাস হচ্ছেনা!'

'আর মনে রেখো,' কিশোর বললো। 'বেড়া এই একটা নয়। এর চেয়ে অনেক বড় বড় ফাঁদ পাতা রয়েছে পূর্ব আফ্রিকার নানান জায়গায়…ওয়ারডেন কি বললেন, শোনোনি?'

সহজ পথ। ম্যাপ দেখার প্রয়োজনই পড়ছে না। রেলপথ, সড়কপথ দুটোই গেছে মোমবাসায়। ওগুলো ধরে উড়লেই হলো।

অবশেষে সাগর চোখে পড়লো। ভারত মহাসাগরের মাঝে যেন মূল্যবান ঝকঝকে পাথরের মতো ফুটে রয়েছে প্রবাল দীপগুলো, সব চেয়ে বড়টার নাম মোমবাসা।

শহরের আট মাইল দূরে এয়ারফীল্ড। প্লেন থেকে নেমে ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করলো তিন গোয়েন্দা। টমসনের চিঠি দেখালো।

এয়ারফীল্ড থেকে বেরিয়ে ট্যাক্সি নিয়ে আদালতে রওনা হলো ওরা।

কি জানি কি মনে হলো, বিচার-কক্ষে ঢোকার আগে ডাবলডোরের ফাঁক দিয়ে ভেতরে তাকালো কিশোর।

ঘরের শেষ মাথায়, উঁচু মঞ্চের ওপর ডেস্কের ওপাশে বসে আছেন জজ নির্মল পাণ্ডা। তাঁকে এখন আর ছোট লাগছে না। পরনের কালো আলখেল্লা আভিজাত্য এনেছে। তাঁর সামনে দাঁড় করিয়ে দেয়া হয়েছে সাতচল্লিশ জন পোচারকে। ঘরের বাকি অংশে সারি সারি চেয়ারে বসে আছে অনেক দর্শক। কোনো জুরি নেই, বাদী পক্ষের উকিল নেই, আসামী পক্ষেরও না। সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী এখানে একজন লোক, জজ সাহেব। বাদী পক্ষ সব অসহায় জানোয়ার, তাদের হয়ে কে আর ওকালাতি করবে?

'জজ যেন আমাদের দেখতে না পান,' ফিসফিসিয়ে বন্ধুদের বললো গোয়েন্দাপ্রধান। 'মাথা নিচু রেখে চট করে ঢুকে পড়বে। ও-কে?'

নীরবে ঢুকে গেল তিন গোয়েন্দা। চোখের পলকে মিশে গেল চেয়ারের পেছনে দাঁড়ানো জনতার ভিড়ে।

পোচারদের ভাষা বোঝেন না বোধহয় জজ। একজন দোভাষী রেখেছেন। জজের প্রশ্নের জবাবে একজন পোচার যা বললো, সেটা ইংরেজিতে অনুবাদ করে জানালো দোভাষী, 'ও বলছে, খুব গরীব লোক। আট ছেলেমেয়ে। আরও চারজন আসছে।'

'চারজন আসছে।'

'হ্যাঁ। ওর চার স্ত্রী।'

ভয়ঙ্কর হয়ে উঠলেন জজ। 'ব্যাটা বুঝতে পারছে, আমি ওকে দশ বছরের জেল দিতে পারি?'

'পারছে।'

'বেশ, ভুল যখন বুঝতে পারছে, অনুশোচনা হচ্ছে, মাপ করে দেয়া গেল তাকে। ষোলোজনের ভরণ-পোষণ করতেই ব্যাটার মাথা খারাপ হয়ে যাবে। জ্বালিয়ে খাক করে ফেলবে তাকে চার স্ত্রী মিলে। জেলের চেয়ে সেটা বড় শাস্তি।'

হেসে উঠলো জনতা। ঠিকই বলেছেন জজ, রসিক লোক।

'কেস ডিসমিসড,' রায় দিলেন বিচারক।

তাঁর এই 'বদান্যতায়' সবাই খুশি হতে পারলো না। কিশোরের পাশে দাঁড়ানো এক আফ্রিকান তরুণ নিচু কণ্ঠে বিড়বিড় করলো, 'এভাবে পোচিং বন্ধ করতে পারবে নাকি!'

মাথা নাড়লো কিশোর, লোকটার সঙ্গে একমত। প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে এতো কষ্ট করে লোকগুলোকে ধরা হলো এতো সহজে ছেড়ে দেয়ার জন্যে!

আরেকজনকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছেন জজ, 'তুমি জানো না, জানোয়ার মারা অন্যায়?'

'না,' দোভাষীর মুখে জবাব দিলো লোকটা। 'আমার গাঁয়ের লোকেরা সব সময়ই জানোয়ার মারে, না হলে খাবে কি? যুগ যুগ ধরে শিকার চলে আসছে আমাদের সমাজে, এটা আমাদের প্রথা। আমাদের বাবারা শিকার করেছে, তাদের বাবারা করেছে, তাদের বাবারা করেছে, তাদের বাবারা করেছে, তাদের বাবারা...'

'আরে থামো, থামো,' হাত তুললেন জজ। 'যাই হোক, ঠিকই বলেছো তুমি। যুগ যুগ ধরে যে নিয়ম তোমার রক্তে মিশে আছে, সেটা আর ভাঙবে কি করে? কেস ডিসমিসড!'

পরের লোকটা আরেক কৈফিয়ত দিলো। বললো, 'আমি খুব ভালো মানুষ, মন নরম। জানোয়ার মারতে একটুও ভাল্লাগে না আমার। কিন্তু সিলভার বাধ্য করে, না মেরে কি করবো?'

বিষণ্ন হয়ে গেল জজের চেহারা। মাথা নেড়ে সহানুভূতি জানিয়ে বললেন, 'তাই তো, কি করবে? ওরকম একটা খুনীর বিরুদ্ধে...নিজের ইচ্ছেয় সত্যি মারো না তো?'

'না।'

'সিলভারটা একটা আস্ত শয়তান। ওকে নিশ্চয় খুব ভয় করো?'

'আমরা সবাই করি।'

'গুড। মানে...,' চট করে জনতার দিকে তাকালেন জজ। 'তুমি নিজের ইচ্ছেয় করো না তো, সে জন্যে গুড বললাম। যে অপরাধ মন থেকে করোনি, সেটার শাস্তি দিই কি করে? আর কোনদিন করো না। কেস ডিসমিসড।'

পরের লোকটা কেন জানোয়ার মারে, জিজ্ঞেস করলে জানালো, তার কিছু ছাগল আছে। মেরে শেষ করে বুনো জানোয়ারে। ছাগল বাঁচাতেই জানোয়ার মারে সে।

'কি জানোয়ার মারো?'

'এই গণ্ডার, জিরাফ, হাতি, জলহস্তী, জেব্রা, হরিণ...'

'তাই নাকি? তাহলে আর কি শাস্তি দিই তোমাকে? নিজের ছাগল বাঁচাতে যে কেউই জানোয়ার মারবে,' বলে ঘোষণা করলেন জজ। 'কেস ডিসমিসড।'

কিশোরের গায়ে কনুই দিয়ে গুঁতো মারলো আফ্রিকান তরুণ। রাগে গজগজ করলো, 'যেসব জানোয়ারের নাম বললো, সব ক'টা ঘাস খায়, নাকের কাছে এসে বসে থাকলেও ছাগল মারবে না। পুরো ব্যাপারটাই প্রহসন।'

ঝটকা দিয়ে ঘুরে বেরিয়ে গেল সে।

বারো

ছেলেরাও বিরক্ত হয়ে গেছে। তবু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সাতচল্লিশ জন পোচারের হাস্যকর কৈফিয়ত আর জজের খোঁড়া যুক্তি শুনলো। বার বার 'কেস ডিসমিসড' শুনতে ভালো লাগে না, এটা তিনিও বোঝেন, আর সে জন্যেই কয়েকজনকে শাস্তি দিলেন।

একজনকে জেল দেয়া হলো। না, দশ বছরের নয়, মোটে তিন দিন। রায় শুনে দাঁত বের করে হাসলো লোকটা। জেলে আরাম করে বিশ্রাম নিতে পারবে তিন দিন, আর ভালো খাবার পাবে, বাড়িতে ওরকম খাবার পায় না।

আরেকজনের তরমুজ খেত আছে জানালো। তাকে জরিমানা করা হলো একটা তরমুজ।

অন্য একজনের আছে মুরগীর খামার। তাকে দিতে হবে দুটো ডিম, জরিমানা।

তবে বেশির ভাগই বেকসুর খালাস পেয়ে গেল।

জজের অলক্ষ্যেই আবার বিচার-কক্ষ থেকে বেরিয়ে এলো তিন গোয়েন্দা। রাগে, ক্ষোভে গম্ভীর হয়ে আছে তিনজনেই।

'প্রাণের পরোয়া করলাম না,' বাইরে বেরিয়েই ফেটে পড়লো রবিন। 'আর কিনা এভাবে ছেড়ে দিলো! ধরে এনে তাহলে লাভটা হলো কি?'

'ব্যাটা আরও ক্ষতি করে দিলো,' মুসা সব চেয়ে বেশি রেগেছে। 'পোচার হারামজাদারা বুঝে গেল, ধরা পড়লেও কিচ্ছু হবে না। বেপরোয়া হয়ে উঠবে এখন ওরা আরও।'

'কিন্তু জজের ব্যাপারটা কি, বল তো কিশোর?' রবিন বললো। 'এতো বড় বড় কথা বলে এলো আমাদের কাছে, পোচারদের হেন করবে, তেন করবে। জন্তুজানোয়ারের কথা বলতে বলতে কেঁদে ফেললো। সব কি তবে মিস্টার টমসনকে ধোঁকা দেয়ার জন্যে? আমার কথা বুঝতে পারছো? আমার বিশ্বাস,

সিলভারের সঙ্গে যোগসাজশ আছে তার। লাভের বখরা।'

মাথা নাড়লো কিশোর। 'বুঝতে পারছি না। লোকটাকে দেখে মনে হয় না খারাপ। সিলভারের মতো বাজে লোকের সঙ্গে···নাহ্, বিশ্বাস হয় না। আরেকটা কথা ভাবছি। মায়াদরদ দেখিয়ে শয়তানকে পথে আনার চেষ্টা করছেন হয়তো···'

'গোড়ার ডিম করছেন!' বুড়ো আঙুল নাচালো মুসা। 'হাজী মোহাম্মদ মহসীন সেজেছেন! শয়তান কোথাকার!'

'আহাআ, ভদ্রলোক সম্পর্কে ওভাবে কথা বলা উচিত না।'

পথের পাশ দিয়ে ধীরে ধীরে হাঁটছে ওরা। তিনজনেই নীরব। নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটছে কিশোর।

'দেখো,' হঠাৎ বলে উঠলো মুসা। 'তোমার ডিটেকটিভ ব্রেন এখন কোথায়? কাজ করছে না কেন? আমি বলছি, ব্যাটা একটা শয়তান। সিলভারের দোস্ত। ওর মুখোশটা খুলে দেয়া উচিত আমাদের।'

মৃদু হাসলো শুধু কিশোর, কিছু বললো না। তার মনে হচ্ছে, মুসার অনুমান ঠিক নয়। অন্য কোনো ব্যাখ্যা আছে জজের এই রহস্যময় আচরণের। সিলভারের দোস্ত নয় লোকটা।

উদ্দেশ্যহীন ভাবে ঘুরতে ঘুরতে মেন রোড থেকে সরে এলো ওরা। বড় বড় সুন্দর অট্টালিকাগুলো পেছনে পড়লো। ঢুকলো এসে পুরনো শহরের এক সরু গলিতে, আরবদের বসবাস বেশি শহরের এদিকটায়। দোকানগুলোর দরজা খোলা, কিন্তু শো-কেস বা জিনিসপত্র কিছু চোখে পড়ছে না। দরজার পরেই অন্ধকার, যেন অজগরের হাঁ, তার পরে রহস্যময় এক জগৎ, কি আছে বোঝার উপায় নেই। কিছু দোকানের ভেতর থেকে আসছে ফল আর সজির গন্ধ, কোনো কোনোটা থেকে মাংসের। একটা দোকানের সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় অদ্ভুত গন্ধ পেলো মুসা, লোহা, তার, তেলের—হার্ডওয়্যারের দোকানে যেমন থাকে। সে কথা জানালো দুই বন্ধুকে।

পরামর্শ করে দোকানটায় ঢুকলো তিনজনে। ঢুকেই একটা ধাক্কা খেলো যেন। দেয়ালে, মাটিতে যেখানেই চোখ পড়লো, দেখা গেল রাশি রাশি ফাঁদ, জানোয়ার ধরার জন্যে যতো রকম থাকতে পারে। তারের ফাঁস থেকে শুরু করে সব।

কোণের বিষণ্ণ অন্ধকার থেকে হাত ডলতে ডলতে বেরিয়ে এলো লম্বা-নাক এক আরব। 'কি, ফাঁদের ব্যাপারে আগ্রহ?'

'খুউব,' জবাব দিলো কিশোর। 'পোচারদের কাছে বিক্রি করেন, না?'

মাথা ঝোঁকালো দোকানদার।

'কাজটা বেআইনী হয়ে গেল না?'

'আইন?' হা-হা করে হাসলো লোকটা। 'এই দেশে আবার আইন আছে নাকি? এখানে আইনের কথা যারা বলে তারাই বেআইনী লোক। যাকগে। তোমরা কে? কোনো দল-টল পোষো?'

'দল?'

'শিকারীর দল, শিকারী। আইনের লোকদের "পোচার"। সিলভারের মতো দল।'

'সিলভারকে চেনেন নাকি?'

'চিনি না মানে? ও আমার সবচে বড় কাস্টোমার। একেবারে এক হাজারের কম কেনে না।'

'কতো করে পড়ে দাম?'

'আড়াই গজী তারের ফাঁস আধ ডলার করে। ওই হিসেবে যতো বড় নাও। তবে একসঙ্গে অনেক নিলে কিছু কম হবে, পাইকারী।'

'আচ্ছা, বুঝলাম। এখন বলুন, এক হাজার ফাঁস যদি নিই, কতোগুলো জানোয়ার ধরতে পারবো?'

'সেটা সীজনের ওপর নির্ভর করে। আর তাছাড়া একেক শিকারীর একেক রকম হিসাব। সিলভার বলে, জানুয়ারি থেকে জুলাই পর্যন্ত প্রতি ফাঁসে হপ্তায় একটা করে জানোয়ার, মাসে চার। তার মানে, হাজার ফাঁসে আটাশ হাজার, সাত মাসে। শুকনোর সময়, মানে আগস্ট থেকে অক্টোবরে মাসে একটা। তিন মাসে ধরো আরও তিন হাজার। মাইগ্রেশন সীজনে সবচে বেশি। মাসে দশটা। নভেম্বর আর ডিসেম্বর শুধু এই দু'মাসেই ধরা পড়ে বিশ হাজার। সব মিলিয়ে বছরে হলো গিয়ে একান্ন হাজার।'

'ভালো ব্যবসা!'

'খুব ভালো। এদেশের সবচে বড় ব্যবসা।'

'সবচে বড় শয়তানী!' রাগ চাপতে না পেরে ফস করে বলে বসলো মুসা। কিশোরের আরও কিছু জানার ছিলো, দিলো সব ভণ্ডুল করে। 'জানোয়ারদেরকে জিজ্ঞেস করে দেখেছো মিয়া, ফাঁসে গলা ঢোকাতে কেমন লাগে?'

ক্ষণিকের জন্যে থ হয়ে গেল আরবটা। 'মানে··· মানে···তোমরা জন্তু-প্রেমিক!' রাগে বেগুনী হয়ে উঠলো চোহারা। 'হায় হায়, কতো কথা বলে ফেলেছি! এই, বেরোও বেরোও আমার দোকান থেকে! নইলে···'

'নইলে কি করবে?' হাতা গোটাতে শুরু করলো মুসা। আফ্রিকায় এসে যেন জোর বেড়ে গেছে তার, যদিও বাড়ি এখান থেকে অনেক দূরে।

ঝগড়া বাড়তে দিলো না কিশোর আর রবিন। দু'জনে মিলে টেনে দোকান

থেকে বের করে নিয়ে এলো মুসাকে।

রাস্তাটা ধরে আবার এগোলো ওরা। আরেকটা দোকানের সামনে থমকে দাঁড়ালো কিশোর, তীব্র বোঁটকা গন্ধ আসছে ভেতর থেকে। ওই গন্ধ তিনজনেরই পরিচিত। মনে করিয়ে দিলো পোচারদের ক্যাম্পের কথা। কাঁচা চামড়ার স্তূপ, কাটা মাথা···

এই দোকানেও ঢুকলো ওরা। মস্ত ঘর, এক মাথা থেকে আরেক মাথা দেখা যায় না ভালো মতো। মেঝে থেকে ছাত পর্যন্ত স্তূপ করে রাখা হয়েছে নানা জানোয়ারের শরীরের বিভিন্ন অংশ। সিংহ, চিতাবাঘ, চিতা, জিরাফ, মহিষ, জেব্রা, ওয়াইল্ডবীস্ট, গণ্ডার, জলহস্তী আর হরিণের মাথা, হাতির পায়ে তৈরি ময়লা ফেলার ঝুড়ি আর ছাতা রাখার স্ট্যাণ্ড; হাতির দাঁত, গণ্ডারের শিং, সব জাতের বানরের স্টাফ করা দেহ, বিরাট হাতি থেকে খুদে বুশ-বেবি পর্যন্ত প্রায় সব জানোয়ারের চামড়া; আর আরও নানারকম জিনিস।

মালিকের চেহারা দেখেই বোঝা গেল, সে ভারতীয়।

ছোট টমি হরিণের ডালপালা ছড়ানো শিংওয়ালা সুন্দর একটা মাথা তুলে নিলো কিশোর। জিজ্ঞেস করলো, 'কতো?'

'ক'টা চাই?'

'এটার দাম কতো?'

'সরি, ইয়াং ম্যান, একটা করে বেচি না। পাইকরী। এটা পাইকারী দোকান।'

'অ। তা পাইকারী কি হিসেবে? ডজন, শ', নাকি হাজার?'

হাসলো দোকানদার। 'না, ভাই, এতো কম না। সবচেয়ে কম, দশ হাজার। আসলে, জাহাজ হিসেবে বিক্রি করি আমরা। এক জাহাজ এতো, দুই জাহাজ এতো, এভাবে। এই তো, কাল সকালেই তিন জাহাজ মাল চালান দিলাম। আজ সকালেই ছেড়ে যাওয়ার কথা ওগুলোর।'

'কোত্থেকে? আই মীন, কোন বন্দর থেকে?'

'ওল্ড হারবার।'

'দেখুন, আমরা এখানে নতুন। মোমবাসা দেখতে এসেছি। চিনিটিনি না কিছু···'

'সোজা চলে যাও। বন্দরটা এই পথের শেষ মাথায়।'

দ্বীপের উত্তর-পূর্ব কোণে, প্রবালের দেয়াল ঘেরা একটা বেসিন মতো জায়গায় তৈরি হয়েছিলো মোমবাসার 'ওল্ড হারবার' বা পুরনো বন্দর। গা ঘেঁষাঘেঁষি করে নোঙর করে আছে অসংখ্য আরব 'ডাউ'। বড় বড় এই জাহাজগুলোর পেছনে পুরনো

ধাঁচের উঁচু মঞ্চ দেখলে জলদস্যু আমলের কথা মনে পড়ে। কোন-কোনটা ছাড়ার জন্যে তৈরি, দেখলেই বোঝা যায়। বিশাল ল্যাটিন পাল তুলে দেয়া হয়েছে, পতপত করছে বাতাসে।

ছাড়তে প্রস্তুত, ওরকম ডাউগুলোর সবচেয়ে বড়টার গ্যাঙওয়েতে দাঁড়িয়ে আছে বাদামী-চামড়ার এক আরব। চেহারা, পোশাক-আশাকে ছেলেদের মনে হলো, কবর থেকে উঠে এসেছে বুঝি সেই তিনশো বছর আগের কোনো জলদস্যু-সর্দার।

কাছে গিয়ে দাঁড়ালো তিন গোয়েন্দা। কিশোর জিজ্ঞেস করলো, 'আপনিই বোধহয় এই জাহাজের ক্যাপ্টেন?'

মাথা ঝাঁকালো লোকটা।

অভিনয় শুরু হয়ে গেল। অলসভঙ্গিতে দুলছে জাহাজের মস্ত পাল, সেদিকে চেয়ে বিস্ময়ে বড় বড় হলো কিশোরের চোখ। কাঁধ থেকে ক্যামেরা নামিয়ে অনুরোধ করলো, 'ছবি তুলি?'

নীরবে মাথা কাত করলো ক্যাপ্টেন।

ছবি তুললো কিশোর। জিজ্ঞেস করলো, 'কোথায় যাবেন?'

'বমবাই।'

'বোম্বে? ভালো। খুব সুন্দর আপনার জাহাজটা। পাল আরও সুন্দর। এখান থেকে সুবিধে হচ্ছে না। ডেকে উঠে যদি তুলি, কিছু মনে করবেন?'

হাত নেড়ে ডেক দেখিয়ে দিলো ক্যাপ্টেন, অর্থাৎ যাও। লোকটা যদি মত বদলায়, এই ভয়ে এক মুহূর্ত দেরি করলো না কিশোর। মুসা আর রবিনকে নিয়ে ডেকে উঠে এলো। আরও দুটো ছবি তুলে ফিরে চেয়ে দেখলো, পাশে এসে দাঁড়িয়েছে ক্যাপ্টেন। চট করে তারও একটা ছবি তুলে নিলো। হাসিতে বিগলিত হলো লোকটার মুখ, গোয়েন্দাপ্রধানের মনে হলো, হাসিটাও জলদস্যুদের মতো।

'বোম্বেতে কি নিয়ে যাচ্ছেন?' জিজ্ঞেস করলো কিশোর।

সত্যি কথা শুনবে, আশা করেনি সে। কিন্তু লুকোছাপার ধার দিয়েও গেল না ক্যাপ্টেন। বোঝা গেল, গুপ্তচর, সাদা পোশাকে পুলিশ কিংবা কাস্টমের লোকের ভয় করছে না। ভয় করার কারণই নেই হয়তো। 'চলো, দেখাচ্ছি।'

টান দিয়ে একটা তারপুলিনের কোণা তুললো ক্যাপ্টেন। ফাঁক দিয়ে দেখা গেল নিচের ডেক। খোলে বোঝাই হয়ে আছে জন্তুজানোয়ারের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, খানিক আগে দোকানটায় যা দেখে এসেছে তিন গোয়েন্দা, সেসব জিনিস। গর্বের হাসি ফুটলো 'জলদস্যুর' মুখে। 'দারুণ, না?'

জবাব না দিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করলো কিশোর. 'কতোগুলো আছে এখানে?'

'দেখতে হবে,' বলে, গিয়ে বিল অভ লেডিং বের করে আনলো লোকটা। কোন জানোয়ারের কয়টা অঙ্গ আছে, কতো টাকার জিনিস, সব লেখা আছে। হিসেব করে জানালো সে, অন্তত এক লাখ আশি হাজার জানোয়ার মেরে জোগাড় করতে হয়েছে ওগুলো।

স্তব্ধ হয়ে গেল তিন গোয়েন্দা। যে তিনটা জাহাজ ছেড়ে যাওয়ার কথা, তার একটাতেই আছে ওই পরিমাণ মাল! কি হারে জানোয়ার মারা হচ্ছে, ভেবে এই গরমের মাঝেও গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠলো কিশোরের, শীত শীত লাগলো।

'কিছুই বুঝতে পারছি না,' মাথা নাড়লেন ওয়ারডেন, তিন গোয়েন্দার রিপোর্ট শুনে। 'নির্মল ওরকম করলো কেন? আসলে ওর মনটা বেশি নরম, কারো কষ্ট সইতে পারে না। না জানোয়ারের, না মানুষের। জজ না হয়ে ঋষি হওয়া উচিত ছিলো তার। দেখি, দেখা হলে জিজ্ঞেস করবো, ' বলে অন্য প্রসঙ্গে চলে গেলেন তিনি। 'মুসা, আরেকবার কষ্ট করতে হবে তোমাকে। প্লেনে করে দুটো যাত্রীকে পৌঁছে দিয়ে আসতে হবে। ইচ্ছে করলে তোমরাও যেতে পারো,' রবিন আর কিশোরের দিকে ইঙ্গিত করলেন।

আবার প্লেন নিয়ে বেরোতে পারবে শুনে খুব খুশি মুসা। জিজ্ঞেস করলো, 'যাত্রীরা কে?'

'এসো, দেখাচ্ছি।'

তেরো

জানোয়ারের হাসপাতালে তিন গোয়েন্দাকে নিয়ে এলেন টমসন। ঘড়ঘড়, গোঁ গোঁ; ঘোঁৎ ঘোঁৎ, চিঁ চিঁ, কিঁউ কিঁউ আর আরও নানা রকম বিচিত্র শব্দ হচ্ছে হাসপাতালে। রোগী নানা ধরনের আফ্রিকান জন্তুজানোয়ার।

'আফ্রিকার সুন্দরতম বানরের সঙ্গে পরিচিত হও,' হেসে নাটকীয় ভঙ্গিতে বললেন ওয়ারডেন। 'ইনি মিস্টার কোলোবাস।'

বানরটা সত্যি খুব সুন্দর। কোলোবাস মাংকি আগেও চিড়িয়াখানায় দেখেছে তিন গোয়েন্দা, তবে ওগুলো কোনোটাই এটার মতো সুন্দর নয়। বন থেকে সদ্য এসেছে তো। সব জীবই তার প্রিয় প্রাকৃতিক পরিবেশে অন্যরকম থাকে। কুচকুচে কালোর মাঝে তুষার-শুভ্র ছোপ যেন ফুটে রয়েছে। পিঠের নিচে, পেটের সামান্য ওপরে আর মুখমণ্ডলে ওই সাদা রঙ। লেজের ডগায় ফোলা রোমগুলোও সাদা।

'সাঙ্ঘাতিক সুন্দর তো!' অবাক হয়ে দেখছে রবিন।

'হ্যাঁ,' মাথা ঝোঁকালেন টমসন। 'আর এ-কারণেই মরতে হচ্ছে এগুলোকে। খুব চাহিদা, মহিলাদের পোশাক তৈরি হয়। দামও অনেক বেশি। ফলে পোচাররা লেগে আছে পেছনে। কোলোবাসের বংশ নির্বংশ করার প্রতিজ্ঞা করেছে যেন। অনেক কমে গেছে ওরা, খুব সামান্যই আছে আর। শীঘ্রি পোচিং থামাতে না পারলে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, ডোডো পাখির মতো নামটাই শুধু অবশিষ্ট থাকবে।'

'কি একখান লেজ!' মুগ্ধ চোখে দেখছে মুসা। 'এতো লম্বা কেন? অন্য বানরের তো এতো বড় না।'

'হ্যাঁ, বড়ই। বত্রিশ ইঞ্চি বানরের চল্লিশ ইঞ্চি লেজ। কেন লম্বা, বলতে পারবো না। প্রকৃতির খেয়াল, নিশ্চয় কোনো কারণ আছে।'

'তা কোথায় নিয়ে যেতে হবে এটাকে?'

'যেখানে বেশি নিরাপদ। এখানকার বনে ছাড়লে আবার পোচারদের খপ্পরে পড়ার ভয় আছে। আর এই অঞ্চল কোলোবাসের বাড়িও নয়। কি করে এদিকে এসে পড়লো কে জানে। উঁচু অঞ্চলে এদের বাস, বিশেষ করে অ্যাবেরডেয়ার পার্বত্য এলাকায়। বড় বড় গাছ আছে ওখানে, বাতাসে সব সময় শীতের আমেজ—বড় বড় রোম দেখছো না? চির-শীতের দেশে থাকার জন্যে ওগুলো দরকার। ওখানেই নিয়ে গিয়ে যদি রেখে আসো, ভালো হয়।'

'যাবো,' বলতে এক মুহূর্ত দেরি করলো না গোয়েন্দা-সহকারী। 'কিন্তু মিস্টার কোলোবাস যেতে রাজি হবেন তো?'

'না হওয়ার কোনো কারণ নেই। ফাঁসে আটকেছিলো, গলা কেটেছে। শুকিয়ে গেছে এখন।'

'প্লেনের ভেতর থাকবে শান্ত হয়ে?'

'কি জানি। তোমাদের বিশ্বাস করতে পারলে গোলমাল না-ও করতে পারে। আমাজান থেকে জানোয়ার ধরে এনেছো, কি করে সামলাতে হয় নিশ্চয় ভালো জানো। এটাকেও না পারার কোনো কারণ দেখি না।'

সুন্দর মুখটা কাত করে, বড় বড় কোমল বাদামী চোখ মেলে তিন কিশোরকে দেখছে বানরটা। দাড়ি চুলকালো। গাল আর থুতনির লম্বা সাদা রোমগুলোকে দাড়ির মতোই দেখতে লাগে। চাপদাড়ি।

'খাইছে!' চেঁচিয়ে উঠলো মুসা। 'বুড়ো আঙুল কই? কেটে ফেলেছে নাকি?'

'না,' বিদ্যে ঝাড়ার সুযোগ পেয়ে গেল রবিন। 'কাটেনি। কোলোবাসের থাকেই না। ভাবো একবার, বুড়ো আঙুল ছাড়া জিনিসপত্র ধরার কথা? কঠিন না? খুব কঠিন। আমার তো বিশ্বাস মানুষের বুড়ো আঙুল না থাকলে আজকের এই মানব সভ্যতাই গড়ে উঠতে পারতো না।'

'একেবারে ভুল বলোনি,' রবিনের সঙ্গে একমত হলেন ওয়ারডেন। 'এসো, তোমাদের আরেক যাত্রীকে দেখবে।'

ওদেরকে একটা খাঁচার কাছে নিয়ে এলেন তিনি। ভেতরে খচ্চরের সমান একটা জীব। দেখতে মোটেও খচ্চরের মতো নয়।

'ইনি আফ্রিকার সব চেয়ে দুর্লভ প্রাণীদের একজন,' তর্জনী তুলে জানোয়ারটার দিকে বাতাসে খোঁচা মারলেন ওয়ারডেন। 'মিস্টার ওকাপি।'

বিচিত্র জীব। একই অঙ্গে নানা রঙের বাহার। যেন হাতের কাছে যতগুলো রঙ পেয়েছেন শিল্পী তুলিতে লাগিয়ে সবগুলোর পরশ বুলিয়েছেন। হলুদ, লাল, পিঙ্গল, কালো, সাদা, কালচে নীল, মেরুন, কালচে-বাদামী, মাখন, কমলা, বেগুনী, সমস্ত রঙ খুব নিখুঁতভাবে লাগানো হয়েছে চকচকে নরম চামড়াটাতে।

আর একটাতেই কয়েক জানোয়ারের মিশ্রণ। মাথায় জিরাফের খাটো শিং, গায়ে জেব্রার ডোরাকাটা, বুনো কুকুরের বড় ছড়ানো কান, আর অ্যানটিলোপ হরিণের মতো সরু পায়ের খুরের ওপরে সাদা রোমশ মোজা। ও, জিভটাও অন্য জানোয়ারের, অ্যান্ট-ঈটার বা পিঁপড়ে-খেকোর। ফুটখানেক লম্বা লিকলিকে ওই জিভ দিয়ে সহজেই কানের গোড়া আর পেছনটা চুলকাতে পারে।

'কোলোবাসের মতোই এটাও এখানে এসেছে অন্য জায়গা থেকে,' ওয়ারডেন বললেন। 'এখানকার বনে ছাড়লে মারা পড়বে। এরা থাকে উত্তর কঙ্গোর গহীন অন্ধকার জঙ্গলে। মাত্র তিরাশি বছর আগে এর নাম জেনেছে শ্বেতাঙ্গরা। পিগমীরা বহু আগে থেকেই জানতো, কথায় কথায় বলে দিয়েছিলো শ্বেতাঙ্গ শিকারীকে। কেউ বিশ্বাস করেনি তখন। তারপর যখন দেখে ফেললো, আর কোনো সন্দেহ রইলো না। কে জানে, আরও কতো জানোয়ার লুকিয়ে আছে ওসব জঙ্গলে, যার কথা শুনিইনি এখনও আমরা!' ওকাপিটার দিকে আবার হাত তুললেন তিনি। 'এরা খুব লাজুক। মানুষের সামনে বেরোয় না, সাড়া পেলেই লুকিয়ে পড়ে আরও গভীর বনে। ওভাবেই লুকিয়ে থেকেছে তিন কোটি বছর ধরে।'

কপাল কুঁচকে ফেললো মুসা। 'তিইন কোওটি!'

'হ্যাঁ, উনি ঠিকই বলেছেন,' জ্ঞান বিতরণ শুরু করলো আবার রবিন। 'অনেক পুরনো ওরা, একেবারে খান্দানী বংশ। বিজ্ঞানীরা বলেন লিভিং ফসিল...'

'জ্যান্ত জীবাশ্ম,' বিড়বিড় করলো কিশোর।

'কি বললে?' ভুরু কোঁচকালেন টমসন।

'না, লিভিং ফসিলের বাংলা বললো,' আগের কথার খেই ধরলো রবিন। 'সেই তিন কোটি বছর আগে জন্মেছিলো ওকাপির প্রথম পূর্বপুরুষ। আরও অনেক জানোয়ারই জন্মেছিলো সেই আদিম পৃথিবীতে। অনেকেরই পরিবর্তন হয়েছে, হয়

ছোট হয়েছে, নয়তো বড়। অনেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, আজ আর বেঁচে নেই একটাও। কিন্তু ওকাপি রয়ে গেছে, তখন যেমন ছিলো এখনও তেমনি। তবে পোচারদের পোচিং না থামালে আর বেশি দিন থাকবে বলে মনে হয় না।'

'না, ভাই, মরার দরকার নেই,' মিস্টার ওকাপির দিকে চেয়ে হাত নাড়লো মুসা। 'দোয়া করি, আরও তিন কোটি বছর বেঁচে থাকো,'. ওয়ারডেনের দিকে ফিরলো। 'তা এই বিশেষ ভদ্রলোক কোথাকার বাসিন্দা? কোথায় রেখে আসতে হবে?'

হেসে ফেললেন টমসন। 'ইনি যে কোথাকার, কি করে বলি?' অবাকই লাগছে আমার, এলো কি করে এখানে? কঙ্গোতে নিয়ে গিয়ে ফেলতে পারলেই ভালো হতো, সেটা সম্ভব না। আরেক জায়গায় অবশ্য রাখা যায়, ওখানে পোচারদের হাত পড়েনি এখনও। আরও কিছু দিন পড়বে বলেও মনে হয় না।'

'কোথায়?' আগ্রহ দেখালো কিশোর।

'ভিক্টোরিয়া হ্রদের একটা বড় দ্বীপে। রুবনডো-র নাম শুনেছো? পঞ্চান্ন একর জায়গা নিয়ে গভীর বন, ওকাপিরা যেরকম পছন্দ করে। ওটা একটা নিরাপদ গেম স্যাংচুয়ারি, কড়া পাহারা। তাছাড়া চারপাশে পানি, যখন-তখন ঝড় ওঠে। ক্যানূ নিয়ে যেতেই পারবে না পোচাররা, ডুবে মরবে। তবে বলা যায় না, কোন দিন জাহাজ নিয়ে গিয়ে হাজির হবে। তবে ততোদিন নিরাপদেই থাকবে ওখানকার জন্তুজানোয়ার। এয়ারফীল্ড নেই দ্বীপটায়। মেন ল্যাণ্ডে নামতে হবে তোমাদের, তারপর বোট ভাড়া করে নিয়ে যেতে হবে। কি মনে হয়, পারবে?'

'ভেলায় করে আমাজানের জঙ্গল থেকে জাগুয়ার আর অ্যানাকোণ্ডা নিয়ে এলাম,' মুসা বললো। 'আর এটা তো কোনো ব্যাপারই না। নিশ্চয় পারবো। কতো আর সময় লাগবে? ফেরিতে করে বড় জোর এক-দুই ঘন্টা।'

হাসলেন টমসন। 'দুনিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম হ্রদ, লেক ভিক্টোরিয়া। দ্বীপে যেতে কমপক্ষে পনেরো ঘন্টা লাগবে। আর ওই পনেরো ঘন্টায় অন্তত পাঁচটা ঝড়ের কবলে যদি না পড়েছো, তো নাম বদলে ফেলবো আমার। ভেবে দেখো, ঝুঁকিটা নেবে?'

'কৌতূহল আরও বাড়িয়ে দিলেন আমাদের,' কিশোর বললো। 'এরপর আর না গিয়ে পারা যায় না। হ্রদটা দেখতেই হবে।'

'হ্যাঁ, দেখতেই হবে,' সুর মেলালো রবিন।

'বেশ, চলো অফিসে,' বলে ঘুরে হাঁটতে শুরু করলেন ওয়ারডেন।

চোদ্দ

'এই যে, অ্যাবারডেয়ার,' টেবিলে বিছানো পূর্ব আফ্রিকার ম্যাপের এক জায়গায় আঙুল রাখলেন টমসন। 'এই হলো নাইরোবি, এর উত্তরে। নাইয়েরিতে নামবে তোমরা, তারপর গরুর গাড়িতে করে যাবে ট্রীটপস-এ। নাম শুনেছো?'

মাথা ঝাঁকালো বইয়ের পোকা রবিন। 'নিশ্চয়ই। দানবীয় ক্যাপ চেস্টনাট গাছের ওপরে তৈরি হোটেলটার কথা বলছেন তো?'

'ওখানকার বেশির ভাগ গাছই দানবীয়। কোলোবাসের খুব পছন্দ। রাতে গাছের ওপরের বাড়িতে কাটাবে। পরদিন প্লেন নিয়ে চলে যাবে দক্ষিণ-পশ্চিমে, তিনশো মাইল দূরের মুয়ানজায়। এই যে, এখানে। পাশে এটা লেক ভিক্টোরিয়া। আর এই হলো রুবনডো দ্বীপ, সরাসরি গেলে একশো মাইল।'

'কখন রওনা হচ্ছি আমরা?' মুসা জিজ্ঞেস করলো।

'এখন বেরোলে রাতের আগেই পৌঁছে যাবে ট্রীটপসে।'

'চলো, যাই,' বন্ধুদের বললো কিশোর।

যাত্রীদের জায়গা করার জন্যে পেছনের দুটো সীট খুলে ফেলতে হলো। বাঁশের খাঁচায় ভরে, পাঁচজন লোকে বয়ে নিয়ে গিয়ে মিস্টার ওকাপিকে প্লেনে তুললো।

'বেশি ভারি হয়ে যাবে না?' মুসা জানতে চাইলো।

'না,' বললেন ওয়ারডেন। 'আড়াইশো হর্সপাওয়ারের এঞ্জিন। আড়াই টন ওজন তুলতে পারে। ওকাপিটা কোয়ার্টার টনের বেশি হবে না।'

তিন কোটি বছরের বনেদি জীবটা জীবনে কখনও বিমানে ওঠেনি, মোটেও পছন্দ করতে পারলো না ওই বদ্ধ পরিবেশ। উদ্বিগ্ন ঘোড়ার মতো চিঁ-চিঁ করে প্রতিবাদ জানাতে লাগলো। শক্ত মাথা দিয়ে জোরে জোরে বাড়ি মারলো খাঁচার বেড়ায়। গোয়েন্দাদের ভয় হলো, ভেঙে না যায়।

কচি পাতাওয়ালা একটা গাছের ডাল ভেঙে এনে খাঁচার ওপরে রেখে দিলেন টমসন, আড়াআড়ি বাঁধা বাঁশের কঞ্চির ফাঁক দিয়ে পাতাগুলো ঝুলে রইলো ভেতরে। সঙ্গে সঙ্গে বারো ইঞ্চি লম্বা ফিতের মতো জিভটা বের করে পাতায় পেঁচিয়ে শক্ত দাঁতের আওতায় টেনে নিয়ে এলো মিস্টার ওকাপি। যতোক্ষণ ওই লোভনীয় খাবার মাথার ওপর থাকবে, কোনো গোলমাল করবে না সে আর।

শান্ত স্বভাবের মিস্টার কোলোবাসের জন্যে খাঁচার প্রয়োজন হলো না। বুদ্ধিমান জীব, ফলে কৌতূহল তার জন্মগত। প্রথমেই কন্ট্রোল প্যানেলের

যন্ত্রপাতিগুলো ধরে ধরে দেখলো, তারপর চড়ে বসলো মুসার কাঁধে, সেখান থেকে এক লাফে গিয়ে উঠলো ওকাপির খাঁচার ওপর। ওখানে বসেই গম্ভীর হয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চোখ বোলালো পুরো কেবিনটায়। মুসার পাশে গাদাগাদি করে উঠে বসলো রবিন আর কিশোর। ওড়ার সময় বসতে কষ্ট হবে না তেমন, অসুবিধে হবে ওঠা আর নামার সময় সীটবেল্ট বাঁধা নিয়ে। শেষে একটা বেল্টই ঘুরিয়ে এনে দু'জনের পেটের ওপর বাঁধলো। এঞ্জিন স্টার্ট দিলো মুসা। লাফিয়ে এসে তার কাঁধে চাপলো মিস্টার কোলোবাস। চালাতে অসুবিধে হবে কিশোর পাইলটের, তাই ওটাকে সরিয়ে দিলো কাঁধ থেকে। কিন্তু কিভাবে আকাশে ওঠে প্লেন, দেখবেই যেন বানরটা, অগত্যা কিশোর আর রবিনের কাঁধে ভাগাভাগি করে বসলো।

স্টর্ক নিয়ে ওঠা-নামা করতে করতে হাত অনেক পেকে গেছে মুসার। ভারি বোঝা নিয়েও সহজে উঠে গেল গাছের মাথায়।

উত্তর-পশ্চিমে নাইরোবির দিকে চলে যাওয়া লাল সড়কের ওপর দিয়ে উড়ে চললো বিমান। কিছু দূর এগিয়ে মোড় নিলো উত্তরে মাউন্ট কেনিয়ার সতেরো হাজার ফুট উঁচু চোখ ধাঁধানো চূড়ার দিকে। পেছন থেকে বইছে বাতাস। গতি বেড়ে গেল বিমানের। প্রায় আড়াই ঘন্টার পথ তিনশো মাইল, পাড়ি দিয়ে এলো দু'ঘন্টায়। নামলো অ্যাবারডেয়ারে, বনের কিনারে একটা ছোট ল্যাণ্ডিংফীল্ডে।

কিভাবে কি করতে হবে সব ভালোমতো বুঝিয়ে দিয়েছেন মিস্টার টমসন। সেই মতোই কাজ করলো তিন গোয়েন্দা। প্লেন থেকে নেমে যেতে হবে আউটস্প্যান হোটেলে। গেম রিজার্ভে ঢুকে ট্রীটপসে রাত কাটানোর অনুমতি নিতে হবে ওখান থেকে।

সবে বিমানের চাকা মাটি ছুঁয়েছে, প্রায় ছুটে এসে হাজির হলো হোটেলের শ্বেতাঙ্গ শিকারী-কাম-পথপ্রদর্শক। ছেলেদের কাছে নিজের পরিচয় দিলো 'কল মী হাঙ্গার', অর্থাৎ আমাকে হাঙ্গার নামে ডেকো। মিস্টার-ফিস্টার বলার ঝামেলা করতে হবে না, সে-কথাও ঘোষণা করে দিলো মুক্তকণ্ঠে।

বিমানেই রেখে যাওয়া হলো ওকাপিটাকে। ঝামেলা করবে না। প্রচুর রসালো খাবার ঝুলিয়ে দেয়া হয়েছে খাঁচার ওপর। রাতের খাবারের পরও প্রচুর অবশিষ্ট থাকবে, নাস্তা সারতে পারবে।

'ওকে নিয়ে ভেবো না,' বললো হাঙ্গার। 'কি নাম যেন বললে? ও, মিস্টার ওকাপি। হ্যাঁ, ওকে দেখার লোক আছে হোটেলে। এখন দয়া করে আমার জীপে ওঠো, খুশি হবো।'

হাঙ্গারকে খুশি করলো তিন গোয়েন্দা। মুসার কাঁধে চড়ে বসলো মিস্টার কোলোবাস। কিছু মনে করলো না গোয়েন্দা-সহকারী। বনের ভেতর দিয়ে চলে

গেছে কাঁচা সড়ক, জায়গায় জায়গায় কাদা। তিন মাইল ওই বুনোপথ পেরিয়ে শেষ মাথায় পৌঁছলো গাড়ি। তারপর থেকে শুরু হয়েছে দানবীয় গাছের জঙ্গল, মাথার অনেক ওপরে খাড়া উঠে গেছে টাওয়ারের মতো।

'হাঁটতে হবে এবার,' জানালো হাঙ্গার। 'বেশি না, এই কোয়ার্টার মাইল।'

মৌন হয়ে থাকা বিশাল দানবগুলোর ফাঁক দিয়ে এঁকেবেঁকে চলে গেছে খুব সরু পায়েচলা পথ। ধীরে ধীরে উত্তেজিত হয়ে উঠছে বানরটা। বড় বড় গাছগুলো হাতছানি দিয়ে ডাকছে যেন তাকে, খাসা বাড়ি হবে এখানে। মাউন্ট কেনিয়ার তুষার ছুঁয়ে নেমে আসা বাতাস কনকনে ঠাণ্ডা। কোলোবাসের উপযুক্ত জায়গা এটা।

'মই কিসের ওটা?' গাছের গায়ে বড় বড় পেরেক দিয়ে আটকে রাখা লম্বা মই দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলো কিশোর। 'আরে, আরও আছে দেখছি।'

'এখুনি বুঝতে পারবে,' গম্ভীর হয়ে গেছে হাঙ্গার। 'ওই মই বেয়ে ওঠো, জলদি!'

'কেন?' রবিনের প্রশ্ন।

'আহ, কথা বাড়িও না! যা বলছি করো।'

আগে আগে উঠতে শুরু করলো মুসা, গলা জড়িয়ে ধরে রইলো বানরটা। তার পেছনে রবিন, কিশোর, সবার শেষে হাঙ্গার। বনের ভেতরে প্রচণ্ড শব্দ হচ্ছে, ভেঙেচুরে মাড়িয়ে একাকার করে ফেলছে যেন গাছপালা। শোনা গেল হাতির গুরুগম্ভীর চিৎকার। হুড়মুড় করে বেরিয়ে এলো গাছের আড়াল থেকে, পথের ওপরে।

'আরও ওপরে ওঠো!' চেঁচিয়ে বললো হাঙ্গার।

শেষ মাথায় উঠে গেল মুসা। মইটা অনেক লম্বা। সবার নিচে থাকা হাঙ্গারের পা-ও শুঁড় বাড়িয়ে ধরতে পারবে না হাতি। সে চেষ্টা অবশ্য করলোও না ওরা।

'বুঝতে পারলে তো এখন, কেন এই মই?' বললো হাঙ্গার। 'জন্তুজানোয়ারে বোঝাই এই বন। যখন তখন বেরিয়ে আসে পথের ওপর। এখানে একটা কথা প্রচলিত আছেঃ গণ্ডার আর মোষ হলে আট ফুট, হাতি হলে আঠারো ফুট। তার মানে কোন জানোয়ার আসছে সেটা বুঝে নিয়ে তার নাগালের বাইরে যেতে হলে ততোখানি উঠতে হবে।'

'পার্কের মধ্যেও বুনো-হয়ে আছে নাকি? মানুষের ক্ষতি করে?' কিশোর জিজ্ঞেস করলো।

'পার্ক কি আর পোষ মানানোর জন্যে? নিরাপদে রাখার জন্যে। বুনোই তো থাকবে। তবে মানুষ দেখতে দেখতে গা সওয়া হয়ে যায় ওগুলোর, না খোঁচালে

সহজে ক্ষতি করে না। তবুও, ঝুঁকি না নেয়াই উচিত। হাতি-গণ্ডার-মোষের মেজাজ-মর্জি বোঝা মুশকিল। আর আহত হলে তো সর্বনাশ। দেখা মাত্র মারতে আসবে।

'এখন কি করবো?'

'জাস্ট ওয়েইট। অপেক্ষা।'

'কতোক্ষণ?'

'পাঁচ মিনিট হতে পারে, পাঁচ ঘন্টাও লাগতে পারে। আমরা তাড়াহুড়ো করলে কিছু হবে না। ওদের যখন ইচ্ছে যাবে।'

অপেক্ষা করার জায়গাটা সুবিধের নয়, ভাবলো মুসা। মই আঁকড়ে ধরে থাকা, তার ওপর কাঁধে রয়েছে এক বানর।

বিন্দুমাত্র তাড়া নেই হাতিগুলোর। অলস ভঙ্গিতে ডালপাতা ভেঙে ভেঙে খাচ্ছে। চারা গাছ ওপড়াচ্ছে। মাঝে মাঝে ওপরে তাকিয়ে দেখছে, মানুষগুলো আগের জায়গাতেই আছে কিনা।

অস্থির হয়ে উঠছে মিস্টার কোলোবাস। বার বার ওপরে তাকাচ্ছে। মুসার মনে হলো, ওপরে জীবন্ত কিছু আছে, ওটাই বানরটার আকর্ষণ। সে-ও তাকালো। প্রথমে কিছু দেখলো না, তারপর মগডালে পাতার আড়ালে মৃদু নড়াচড়া চোখে পড়লো।

মুখটা দেখতে পেলো আরও পরে। কপাল-কান-মাথা সব কালো; কপালের নিচটা, গাল, থুতনি সাদা। নিশ্চয় কোলোবাস। আরেকটু মুখ বের করলো ওপরের বানরটা। কিচির-মিচির করে ডাকলো মিস্টার কোলোবাসকে, ওটার কাছে যাওয়ার জন্যে।

অন্যেরাও লক্ষ্য করেছে ব্যাপারটা।

'দেবো নাকি ছেড়ে?' মুসা জিজ্ঞেস করলো।

'দাও,' হাঙ্গার বললো। 'কোলোবাসের জন্যে ভালো জায়গা। তাছাড়া মিস ডাকছেন। মিস্টারের অনাদর হবে বলে মনে হয় না।'

'মিস, না মিসেস?' দাঁত বের করে হাসলো মুসা।

'এখন তো মিসই মনে হচ্ছে। মিস্টার গেলে পরে মিসেস হবেন আরকি।'

বানরটাকে ভালোবেসে ফেলেছে মুসা। ছাড়তে কষ্টই হলো। তবু, তার কাছে থাকার চেয়ে বনে অনেক ভালো থাকবে ভেবে মন শক্ত করলো। ওটার গায়ে হাত রেখে তারপর ডালে চাপড় মেরে দেখিয়ে বললো, 'যা, যা।'

লাফ দিয়ে গিয়ে ডালটায় বসলো মিস্টার কোলোবাস। ফিরে তাকালো মুসার দিকে, তাকিয়ে রইলো চিন্তিত চোখে। মনস্থির করে নিয়ে ঘুরলো। লাফিয়ে ধরে

ফেললো ওপরের আরেকটা ডাল। সে-ডাল থেকে আরেক ডাল করে করে উঠে গেল ওপরে। পাতার আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো আরও কয়েকটা বানর। আশ্চর্য দক্ষতায় লুকিয়ে ছিলো এতোক্ষণ। মেহমানকে স্বাগত জানাতেই যেন সম্মিলিত কিচির-মিচির জুড়ে দিলো। যাক, মিস্টার কোলোবাসকে সাদরেই গ্রহণ করেছে, তবে হয়তো মিস কোলোবাসের বদান্যতায়।

'আরে, কেঁদে ফেলছো কেন?' মুসার দিকে চেয়ে বললো হাঙ্গার। 'মন খারাপ করো না। আবার দেখতে পাবে ওকে। ট্রীটপস লেকে রোজ রাতে পানি খেতে যায় কোলোবাসেরা।'

রওনা হয়ে গেল হাতিরা। বনের ভেতর মিলিয়ে গেল ওদের শব্দ। মই থেকে নেমে আবার ট্রীটপসের দিকে চললো চারজনে।

গাছের ফাঁক দিয়ে চোখে পড়লো ট্রীটপস। অদ্ভুত দৃশ্য! মনে হচ্ছে যেন শূন্যে ভেসে রয়েছে একটা বড় বাড়ি। মাটি থেকে পঞ্চাশ ফুট ওপরে, দুলছে। বাতাসে গাছের ডাল দোলে, সেই সাথে বাড়িটাও। আরও কাছে এগিয়ে দেখা গেল ওটার ভিত--ডালপালা। দরজা থেকে নেমে এসেছে বিচিত্র কাঠের সিঁড়ি।

একটা হ্রদের দিকে মুখ করে আছে বাড়িটা। ছোট হ্রদ, তীরে ঘন বন। এই বিখ্যাত জায়গাটার কথা অনেক শুনেছে তিন গোয়েন্দা। রাতের বেলা বন থেকে বেরিয়ে হ্রদে পানি খেতে আসে অনেক রকম জানোয়ার। আরও একটা আকর্ষণ আছে ওগুলোর, হ্রদের আশেপাশে লবণের গর্ত। হোটেলের ব্যালকনি থেকে হ্রদ আর গর্তগুলো পরিষ্কার দেখা যায়। চুপ করে থাকলে, কোনো রকম শব্দ না করলে নিচের অনেক আশ্চর্য দৃশ্য দেখা যায় ওখানে বসে।

'অনেক বিখ্যাত লোক রাত কাটিয়ে গেছেন ওই হোটেলে,' রবিন বললো।

'জানি,' বললো কিশোর। 'রানী এলিজাবেথও নাকি এসেছিলেন।'

'তখনও তিনি রানী হননি, শাহজাদী ছিলেন। ওই হোটেলে থাকার সময়ই রাতে খবর এলো, তাঁর বাবা মারা গেছেন, সিংহাসনে বসতে হবে এবার তাঁকে।'

'রাজা ফিলিপ আসেননি?' মুসা প্রশ্ন করলো।

'কয়েকবার,' জবাব দিলো হাঙ্গার। 'আফ্রিকান ওয়াইল্ড লাইফ রক্ষায় তাঁর দান অপরিসীম। অনেক কিছু করেছেন তিনি এখানকার বুনো জানোয়ারের জন্যে।...এসো, ওপরে উঠি।'

সিঁড়ির নিচে জালে ঘেরা একটা ছোট জায়গায় গিয়ে ঢুকলো ওরা। অনেকটা টেলিফোন বুদের মতো, তবে ছাত নেই। সিঁড়ির নিচের ধাপটা বারো ফুট ওপরে। অবাক হয়ে ভাবলো তিন গোয়েন্দা, ওখানে উঠবে কি করে! একটা বোতাম টিপলো হাঙ্গার। হড়হড় করে নেমে এলো সিঁড়িটা, ঘেরা জায়গার ভেতরে। তাতে

তিন গোয়েন্দাকে তুলে দিয়ে হাঙ্গারও উঠলো। আরেকটা বোতাম টিপতেই স্বয়ংক্রিয়ভাবে ওপরে উঠতে লাগলো সিঁড়ি, বন্দর ছাড়ার আগে জাহাজের সিঁড়ি যেভাবে টেনে তুলে নেয়া হয় অনেকটা তেমনি ভাবে।

'এই ব্যবস্থা কেন?' জানতে চাইলো রবিন। 'জানোয়ারের ভয়ে?'

'হ্যাঁ,' হাঙ্গার বললো। 'বড় জানোয়ার এসে ভেঙে ফেলতে পারে। কিংবা ওপরে উঠে গিয়ে মহা অনর্থ ঘটাতে পারে চিতাবাঘ। সে-জন্যেই ওগুলোর নাগালের বাইরে তুলে রাখা হয় সিঁড়ি।'

'দুর্গের ড্রব্রিজের মতো,' বিড়বিড় করলো কিশোর।

গাছের মাথার সুরক্ষিত 'দুর্গের' দোরগোড়ায় পৌঁছলো ওরা।

ভেতরে ঢুকে ম্যানেজারের সঙ্গে তিন গোয়েন্দার পরিচয় করিয়ে দিলো হাঙ্গার।

হোটেল হিসেবে খুবই ছোট ট্রীটপস—মাত্র বারোজন মেম্বারের জায়গা হয়, কিন্তু গাছের মাথার বাড়ি হিসেবে আবার অনেক বড়। ডাল দুললেই বাড়ি দোলে। এমনকি কোনো লোক যদি জোরে হাঁটে, কিংবা আস্তেও লাফ দেয়, কেঁপে ওঠে গোটা বাড়ি।

ছেলেদের ঘরের বাইরে একটা ব্যালকনি। ওখানে বসে হ্রদের একপাশ স্পষ্ট দেখা যায়। ট্রীটপসের ছাতে যাওয়ার সিঁড়িও আছে। ওখান থেকে নিচে চারপাশেই নজর চলে।

পনেরো

এখানে যেন শুধুই ফিসফিসানী। নোটিশ লেখা রয়েছে, জোরালো শব্দ করে যাতে জন্তুজানোয়ারকে বিরক্ত না করা হয়। ফলে স্বাভাবিক ভাবে কথা বলছে না কেউ। মেহমানরা ফিসফিস করছে, ফিসফিস করছে হোটেলের পরিদর্শক, চাকর-বাকর সবাই। সবার পায়ে রবার সোলের জুতো। এটা নিয়ম। মেহমানদের কারও ওরকম জুতো না থাকলে হোটেল থেকে কিনে নিয়ে পরতে হবে, চামড়ার জুতো পরে মচমচ করা চলবে না।

'একটা ব্যাপার বুঝতে পারছি না,' মুসা বললো। 'আমাদের কথা নাহয় না শুনলো, গন্ধ তো পাবে? ওগুলোর কাছ থেকে মাত্র পঞ্চাশ ফুট ওপরে রয়েছি আমরা।'

'পঞ্চাশ ফুট কেন, সিকি মাইল দূরে থাকলেও পেতো,' জবাব দিলো হাঙ্গার। 'যদি নিচে থাকতাম আমরা, ওদের নাকের লেভেলে। কিন্তু এতো ওপরে রয়েছি,

আমাদের গায়ের গন্ধ নিচে নামতে পারছে না, তার আগেই সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে বাতাস, ওদের মাথার অনেক ওপর দিয়ে। আমরা আছি এটা বুঝতে পারবে শুধু শব্দ করলেই। সে-কারণে সর্দি লাগা কোনো লোকের এখানে আসা বারণ। একটা কাশি শুনলেই চোখের পলকে জঙ্গলে পালাবে সমস্ত জানোয়ার। পরে ফিরে আসবে অবশ্য। জায়গাটাকে ওরা ভালোবাসে। হ্রদের ধারে কাদামাটিতে লবণের ছড়াছড়ি। পানি তো বটেই, লবণও খেতে আসে।'

ডাইনিং রুমের লম্বা টেবিলে চমৎকার ডিনার দেয়া হলো। পেট পুরে খেলো সবাই। তারপর নিঃশব্দে ব্যালকনিতে চলে এলো বারোজন মেহমান। তাকিয়ে রইলো নিচের দিকে। পরনে ভারি পোশাক ওদের, ঠাণ্ডা যাতে না লাগে। কেউ কেউ তো বিছানা থেকে কম্বল এনে গায়ে জড়িয়েছে। সমুদ্র সমতলের সাত হাজার ফুট ওপরে রয়েছে, কনকনে শীত এখানে।

রাতের অন্ধকারে ঢাকা পড়লো নিচের দৃশ্য। জ্বলে উঠলো শক্তিশালী ফ্লাডলাইট। হ্রদের পাড়ের অনেকখানি জুড়ে ছড়িয়ে পড়লো আলো। জানোয়ারেরা এই আলোতে অভ্যস্ত, বোঝা গেল। দুটো শুয়োর, একটা ওয়ার্টহগ, আর একটা ওয়াটারবাক এসে ইতিমধ্যেই হাজির হয়েছে। আলোর দিকে চোখ তুলে তাকালো একবার। অবাক হলো না তেমন। হয়তো ভাবছে, এটাও খুদে কোনো সূর্য। আলোর জন্যে ব্যালকনিটা দেখতে পেলো না, ফলে ঘাবড়ালো না, লবণ খোঁটায় মন দিলো।

চারটে গণ্ডার বেরিয়ে এলো বন থেকে। এসেই লবণাক্ত কাদা চাটতে শুরু করলো। একটু পরেই লেগে গেল ঝগড়া, সব চেয়ে ভালো জায়গাটার দখল নিয়ে। এ-ওকে ধাক্কা মারছে, রেগে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করছে শুয়োরের মতো, তবে শুয়োরের চেয়ে ওদের গলার জোর অনেক বেশি—আকারটাও তো দেখতে হবে। কানগুলো বার বার এদিক-ওদিক নাড়ছে, অনেকটা রাডারের মতো, সন্দেহজনক সামান্যতম শব্দ পেলেই ছুটে পালাবে।

কাশির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারে হোটেল কর্তৃপক্ষ, কিন্তু খোলা জায়গায় মশার বিরুদ্ধে কি করবে? মিনি জেট প্লেনের মতো বোঁ বোঁ করে সোজা এসে কিশোরের নাক দিয়ে ঢুকে পড়লো একটা। আর কি থাকা যায়। গায়ের জোরে হ্যাঁচচো করে উঠলো সে।

দুপদাপ করে ছুটে পালালো জানোয়ারের দল। নিমেষে হ্রদের তীর খালি।

তবে, বেশিক্ষণ লাগলো না, পায়ে পায়ে আবার ফিরে আসতে শুরু করলো। গোটা চারেক গণ্ডারও এলো আবার, বোধহয় আগেরগুলোই, কিংবা অন্য জানোয়ার। একটার পেছনে আরেকটা সারি দিয়ে এলো, নাক দিয়ে বিচিত্র শব্দ

করছে, কয়লার রেল-এঞ্জিনের মতো।

তারপর এলো হাতি। বিরাট বিরাট দানব একেকটা। দল বেঁধে নেমে গেল পানিতে। শুঁড় দিয়ে নিজের গায়ে, একে-অন্যকে পানি ছিটালো কিছুক্ষণ, ধুয়ে গেল ধূসর-কালো চামড়ায় লেগে থাকা ধুলো-ময়লা। পানি থেকে উঠে এলো ওরা। গণ্ডারের পায়ের চাপে ছোট ছোট গর্ত হয়ে গেছে নরম পারে, পানি ঠেলে উঠছে। ওগুলোতে শুঁড়ের ডগা ডুবিয়ে দিলো হাতিরা, লবণ সংগ্রহ করে মুখে পাচার করতে লাগলো। মাঝে মাঝে কুতকুতে চোখ মেলে তাকাচ্ছে ফ্লাডলাইটের দিকে। ওই তাকানো পর্যন্তই, চাঁদ কিংবা সুরুজ মনে করেই হয়তো গুরুত্ব দিচ্ছে না। কি ভাবছে ওরাই জানে।

গণ্ডারের মতো বদমেজাজী নয় হাতি। অন্তত নিজেদের মধ্যে অযথা লড়াই করছে না। শান্তভাবে লবণ খাচ্ছে। কোনো শিশু কিংবা অল্পবয়েসী হাতি এসে বড়টার গর্তে শুঁড় ডোবানোর সঙ্গে সঙ্গে নিজের শুঁড় তুলে নিয়ে ওটাকে জায়গা দিয়ে দিচ্ছে বড়টা। নিজে খুঁজে নিচ্ছে অন্য গর্ত।

ভয়ঙ্কর চেহারার পাঁচটা মোষ বেরিয়ে এলো। গণ্ডারের চেয়েও বদমেজাজী। এসেই জায়গার দখল নিয়ে লেগে গেল নিজেরা, সেই ক্ষোভ অন্যের ওপর গড়াতে দেরি হলো না। গণ্ডার আর মোষে লড়াই বেধে গেল দেখতে দেখতে। শিংয়ের সঙ্গে শিংয়ের ঠোকাঠুকি, রাগতঃ ঘোঁৎ ঘোঁৎ, খুরের দাপাদাপি চললো কয়েক মিনিট। গায়ে পড়ে হাতিদের সঙ্গে গিয়ে লাগলো দুই জাতের বদমেজাজী। কতো আর সওয়া যায়? রাগলো হাতিরাও। মোষগুলোকে পিটুনি লাগালো প্রথমে। ওগুলো পিছু হটে যেতেই গণ্ডারের পিঠে মোটা চাবুকের মতো আছড়ে পড়তে লাগলো শুঁড়। কিছুক্ষণ গাঁইগুঁই করে সরে যেতে বাধ্য হলো ওরাও। এই বিরক্তিকর যুদ্ধের পর আর খাওয়া, খেলা কোনোটাই জমে না। হাতিগুলোও চলে গেল।

বন থেকে বেরিয়ে এসে পানি খেতে নামলো একটা জিরাফ। সামনের পা অনেক বেশি লম্বা, প্রকৃতিই গড়েছে ওদের ওরকম করে, গলা তুলে উঁচু ডাল থেকে পাতা ছিঁড়ে খাওয়ার সুবিধের জন্যে। একসাথে দুটো সুবিধে তো আর দেয়া যায় না, গলা নামিয়ে পানি খেতে তাই অসুবিধে হয় জিরাফের। সামনের দুই পা অনেক ছড়িয়ে ফাঁক করে মুখ দিয়ে পানির নাগাল পেতে হয়।

জানোয়ারের ভিড় লেগেছে হ্রদের তীরে। অনেক ধরনের হরিণ এসেছে ঃ ইমপালা, টমি, গ্র্যান্ট, কুডু, ওয়াটারবাক, ক্লিপস্প্রিঙ্গার।

মুসার গায়ে কনুই দিয়ে আলতো গুঁতো দিলো রবিন, নীরবে হাত তুলে দেখালো একদিকে।

বনের কিনারে একটা গাছের ডালে জমায়েত হয়েছে অনেকগুলো কোলোবাস

বানর। সতর্ক চোখে আলোর উৎসের দিকে তাকাচ্ছে। দ্বিধা করলো কিছুক্ষণ, তারপর দোল খেয়ে মাটিতে নামলো দলপতি। টুপটাপ করে লাফিয়ে পড়তে লাগলো অন্যগুলো। দল বেঁধে এগোলো পানির দিকে। প্রাকৃতিক পরিবেশে অপূর্ব সুন্দর লাগছে প্রাণীগুলোকে। তীব্র আলোয় চকচক করছে কালো-সাদা রোম। মহিলারা যে পছন্দ করে, খামোকা নয়। আর তাদের পছন্দের কারণে প্রতি মাসে জীবন দিতে হচ্ছে দশ হাজার করে কোলোবাসকে।

দৃষ্টি তীক্ষ্ণ করলো মুসা। মিস্টার কোলোবাসও কি আছে দলে? দূর থেকে বোঝা যাচ্ছে না। হাঙ্গারের কাছ থেকে একটা বিনকিউলার চেয়ে নিলো সে।

হ্যাঁ, আছে। গলার ওই ফাঁসের দাগ কোনো দিন মুছবার নয়। নতুন বন্ধুদের সঙ্গে খুব সুখেই আছে মনে হয় বানরটা। বুকের কোথায় যেন খচ করে উঠলো মুসার। একেই কি বলে জেলাসি? লজ্জিত হলো মনে মনে। তার কাছে থাকলে মিস্টার কোলোবাস অনেক আদর পেতো, সন্দেহ নেই, কিন্তু ওই স্বাধীনতা কি পেতো? হোক না একটা বানর, ওটার স্বাধীনতা কেড়ে নেয়ার কি অধিকার আছে তার? তাকে যদি কেউ খাঁচায় পুরে ভালো ভালো খাবার দিতো···আর ভাবতে পারলো না মুসা।

অনেক রাত পর্যন্ত বসে থাকলো মেহমানরা। তারপর একে একে উঠে চলে গেল যার যার ঘরে। তিন গোয়েন্দাও ঘুমাতে চললো।

ষোল

'ফ্যানটাসটিক আইডিয়া!' সকালে নাস্তা খেতে খেতে হাঙ্গারকে বললো কিশোর। 'হ্রদের ধারে গাছের ওপর হোটেল বানানো!'

একমত হলো পথপ্রদর্শক। 'হ্যাঁ, এর জন্যে কল্পনা-শক্তি দরকার। বেরিয়েছিলো এক ভদ্রমহিলার মাথা থেকে। তাঁর নাম লেডি বেটি ওয়াকার। অনেক দিন আগে ন্যাশনাল পার্কে বেড়াতে এসেছিলেন। বিখ্যাত ক্লাসিক সুইস ফ্যামিলি রবিনসনের খুব ভক্ত ছিলেন তিনি। সেই বই পড়া থাকায়ই গাছের ওপর বাড়ি বানানোর আইডিয়া ঢোকে তাঁর মাথায়। বেড়াতে এসে বন্ধুদের বলেছিলেন সেকথা। শুনে তো হেসেই খুন ওরা। কিন্তু লেডি ওয়াকার দমলেন না। বানিয়ে দেখিয়ে দিলেন।'

'একটা কাজের কাজই করেছেন তিনি,' রবিন বললো। 'তাঁর সৌজন্যেই কাল রাতে ওই চমৎকার দৃশ্য দেখার সুযোগ পেলাম।'

'তা তো পেলাম,' শূন্য প্লেটটা ঠেলে সরালো মুসা। 'আমি ভাবছি আজকের

কথা। সামনে খুব কঠিন কাজ পড়ে আছে।'

প্লেনে ফিরে দেখা গেল, খাঁচার মধ্যে আরামে পাতার নাস্তা চিবুচ্ছে মিস্টার ওকাপি। হাঙ্গারের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বিমানে চড়লো তিন গোয়েন্দা।

সিংহের জন্যে বিখ্যাত সেরেঙ্গেটি প্লেইন-এর ওপর দিয়ে মুয়ানজার দিকে উড়ে চলেছে বিমান। দুই ঘন্টা পর নামলো ভিক্টোরিয়া হ্রদের দক্ষিণ পারে।

বন্দরে এসে ভালো কোনো বোট পেলো না তিন গোয়েন্দা। অনেক চেষ্টার পর একটা নৌকা মিললো, নড়বড়ে ভেলাই বলা চলে ওটাকে। এককালে নদীতে ফেরী পারাপার করতো। একটিমাত্র আউটবোর্ড মোটর, বহু পুরনো, প্রচণ্ড আওয়াজ। অগত্যা ওটা নিয়েই রুবনডো আইল্যাণ্ডে চললো ওরা। ওয়ারডেন টমসন বলে দিয়েছেন, যেতে পনেরো ঘন্টা লাগবে, আর ওই সময়ে ঝড় আসবে অন্তত পাঁচবার। ভুল করেছেন তিনি। একটা ঝড়ই এলো, কিন্তু টিকে রইলো পনেরো ঘন্টারও বেশি।

বিশাল হ্রদ। উত্তর তীর থেকে দক্ষিণ তীরের দূরত্ব আড়াইশো মাইল। ঝড় এলো উত্তর থেকে, পুরো হ্রদটা পাড়ি দিয়ে বয়ে চললো দক্ষিণে। বড় বড় ঢেউ এসে আছড়ে পড়ছে ভেলার ওপর। ভিজিয়ে চুপচুপে করে দিচ্ছে যাত্রীদের।

বিমান-যাত্রা নির্বিবাদে সহ্য করেছে মিস্টার ওকাপি, নৌ-যাত্রা মোটেই পছন্দ করতে পারলো না। নানারকম বিচিত্র শব্দ করে প্রতিবাদ জানিয়েই চলেছে। অভ্যাস নেই, ভেলার দুলুনি সইতে পারলো না বেশিক্ষণ, বমি শুরু করলো। পেট থেকে বেরিয়ে এলো সমস্ত পাতা। ভেলার পাটাতনের কাঠামোতে শক্ত করে বাঁধা রয়েছে খাঁচাটা, এতো মচমচ করছে, গোয়েন্দারা আশঙ্কা করছে খুলে, ভেঙে না চলে যায়।

আর শুধু ঝড়ই নয়, ভিক্টোরিয়ার আরও দুর্নাম আছে। না না, মহারানী ভিক্টোরিয়া নন—যাঁর নামে নাম রাখা হয়েছে এই অগাধ জলরাশির, ভিক্টোরিয়া হ্রদের কথা হচ্ছে। মাঝে মাঝেই এর নিচে রয়েছে বালির চরা, পানির সমতলের ঠিক নিচে। ওগুলোতে আটকে যাচ্ছে ভেলা। ঢেউ তখন উপকারই করছে। আটকে থাকতে দিচ্ছে না। তবে সব সময় সেটা পারছে না। তখন ব্যাক গীয়ার দিয়ে পিছিয়ে আনতে হচ্ছে ভেলা। কখনও কখনও শুধু এঞ্জিনের জোরে কুলাচ্ছে না, চরায় নেমে ঠেলা লাগাতে হচ্ছে তিন গোয়েন্দাকে। একবার তো ওরকম ঠেলা লাগাতে গিয়ে রবিন পড়লো বিপদে, আরেকটু হলেই ভেসে গিয়েছিলো গভীর পানিতে, তাহলে আর বাঁচতো না। সবে চরায় নেমেছে ওরা, ছয় ফুট উঁচু এক ঢেউ এসে ধাক্কা দিয়ে চিত করে ফেলে দিলো ওকে। ভাগ্যিস মুসার হাত ধরে রেখেছিলো। সে আর কিশোর মিলে টেনে-হিঁচড়ে সোজা করলো রবিনকে।

বিপদ আরও আছে। কুমির আর জলহস্তী। অগুনতি। কিলবিল করছে যেন হ্রদের পানিতে, বিশেষ করে ইয়া বড় বড় কুমির। মাঝে মাঝে ঘ্যাশ্‌শ্‌ করে ঘষা লাগায় ভেলার নিচে, যেন গাছের গুঁড়ি একেকটা। উল্টে দেয়ার চেষ্টা করে। না পারলে পাশে ভেসে ওঠে। অসতর্ক আরোহী পেলে লেজের বাড়ি মেরে ফেলে দিতো পানিতে, তারপর, 'গাঁপ!'

জলহস্তীর ভয় আপাতত তেমন নেই। ঝড়ের দাপটে পানিতে থাকতে পারছে না ওরা, গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে হ্রদের মাঝে মাঝে জেগে ওঠা দ্বীপে। ওরকম একটা দ্বীপের কিনার দিয়ে চলার সময় ধুড়ুম করে হঠাৎ কিসের সঙ্গে যেন বাড়ি লাগলো ভেলার। মুহূর্ত পরেই দেখা গেল, এক পাশ ঠেলে উঠছে ওপর দিকে। নিচে থেকে কিসে যেন ঠেলে কাত করে যাত্রীদের ফেলে দেয়ার চেষ্টা করছে। সুবিধে করতে না পেরে বেরিয়ে এলো ওটা। বিরাট এক মদ্দা হিপো, মানে জলহস্তী। বিরাট হাঁ করে মোটা মোটা দাঁত দেখিয়ে ভেঙচি কাটলো, তারপর বন্ধ করলো। এমন বিকট শব্দ হলো, মনে হলো সিন্দুকের ডালা পড়েছে। একটা বলে সুবিধে করতে পারেনি, ওটার একটা সহকারী থাকলেই দিয়েছিলো ভেলার সর্বনাশ করে।

দিনটা কাটলো কোনোমতে, এলো অন্ধকার রাত। বুনো হ্রদে উত্তাল ঝড়ের মাঝে শুরু হলো যেন ভয়াবহ দুঃস্বপ্ন। প্রাণের আশা ছেড়ে দিয়েছে তিন গোয়েন্দা, এই সময়, বহু যুগ পরে যেন চোখে পড়লো দূরে ক্ষীণ আলো, সেই সঙ্গে জাগলো আশার আলো। রুবনডো আইল্যাণ্ড! ক্ষণিকের জন্যে দেখা গেল আলোটা, তারপরেই মুষলধারে বৃষ্টি আর কুয়াশার মাঝে হারিয়ে গেল। শুধু আন্দাজের ওপর ভেলা চালাচ্ছে চালক। এই হ্রদের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ পরিচয় না থাকলে অনেক আগেই হাল ছেড়ে দিতো।

কিছুক্ষণ পর আবার দেখা গেল আলো। ঠিক সময়মতো। আরেকটু হলেই পাশ দিয়ে সরে চলে গিয়েছিলো ভেলা। এমনিতেই অনেকখানি বিপথে সরে গেছে।

যা-ই হোক, দুর্গম নৌ-যাত্রার অবসান ঘটলো অবশেষে। দ্বীপের কিনারে ছোট একটা খাঁড়িতে ঢুকলো ভেলা। বাতাস তেমন ঢুকতে পারে না এখানে, ফলে ঢেউও খোলা হ্রদের তুলনায় অনেক কম। চেঁচিয়ে ডাকলো চালক।

সাড়া এলো তীর থেকে।

কাছে এসে দাঁড়ালেন এখানকার ওয়ারডেন। নাম জানালেন, অরিফিয়ানো ডেল মারটিগা হিসটো। হেসে বললেন, 'খুব লম্বা নাম, না? তোমাদের এতো কষ্ট করতে হবে না। শুধু অরিফ বললেই চলবে,' খাঁচাটা নামাতে সাহায্য করলেন তিনি। জিজ্ঞেস করলেন, 'কি নিয়ে এসেছো?'

'একটা ওকাপি।'

'সেটা বুঝতেই পারছি। মিস্টার, না মিসেস?'

প্রশ্নটা অদ্ভুত মনে হলো তিন গোয়েন্দার কাছে। পুরুষ না মাদী, তাতে কি এসে যায়?

'মিস্টার,' জবাব দিলো কিশোর।

'গুড। এই দ্বীপে আর একটা মাত্র ওকাপি আছে, মিসেস। বংশবৃদ্ধির চান্স হলো। খুব দুর্লভ জানোয়ার, ওকাপির কথা বলছি। দাঁড়াও, আসছি।'

দৌড়ে ছোট কেবিনে গিয়ে ঢুকলেন ওয়ারডেন। ফিরে এলেন একটা বড় তোয়ালে নিয়ে। ভিজে একেবারে হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে গোয়েন্দাদের, ওরা ভাবলো ওদের জন্যে এনেছেন। তা নয়। খাঁচার দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে পড়লেন তিনি। মোলায়েম হাতে ওকাপিটার গা মুছতে শুরু করলেন।

একেবারে জামাই আদর। ওকাপির গায়ের প্রতিটি ইঞ্চি যত্ন করে মুছলেন মিস্টার হিসটো, ওটার ঠাণ্ডা শরীর গরম করলেন। 'ব্যস, হয়েছে, আর ঠাণ্ডা লাগার ভয় নেই।'

'খাওয়ার কি ব্যবস্থা?' মুসা জিজ্ঞেস করলো।

'আছে। বনের মধ্যে ঢুকলেই পেয়ে যাবে। যেদিকে ফিরবে সেদিকেই খাবার। পানির তো অভাবই নেই...'

'তাহলে কি এখন শুধু ছেড়ে দিলেই হবে?' বাধা দিয়ে বললো রবিন।

'সেটাই উচিত। নিজের দায়িত্ব নিজেই নেয়া ভালো। এই দ্বীপে ওর কোনো শত্রু নেই। সিংহ, চিতাবাঘ, পোচার, কিচ্ছু না।'

'বড় জানোয়ার নেই?' কিশোর জানতে চাইলো।

'আছে। নিরাপদে রাখার জন্যে গণ্ডারের মতো বড় জানোয়ারও তুলে আনা হয়েছে। তবে মাংসাশী কাউকেই আনা হয়নি। ফলে তৃণভোজীদের বেহেশত হয়ে দাঁড়িয়েছে রুবনডো দ্বীপ।'

গা গরম হয়েছে। খাঁচার দরজা খোলা। দীর্ঘ দিন বন্দি থাকতে থাকতে হাঁফিয়ে উঠেছে, তাই সুযোগ পেয়ে আর দেরি করলো না মিস্টার ওকাপি। খাঁচা থেকে বেরিয়ে রওনা হয়ে গেল তার সবুজ বেহেশতের দিকে।

'আমি কিন্তু ওটার খাবারের কথা বলিনি,' আবার বললো মুসা। 'আমার পেটে এখন ছুঁচোর বেহেশত। সেই যে কবে কোন কালে খেয়েছি মনেই নেই। নাড়িভুঁড়ি সব হজম। পেটের চামড়াটাই আছে যা শুধু এখন...'

হো হো করে হেসে উঠলেন মিস্টার অরিফিয়ানো ভেন মারটিগা হিসটো। 'আরে তাই তো! ওকাপিটাকে পেয়ে ভুলেই গিয়েছিলাম...চলো, চলো!'

সতেরো

গা মুছে, আগুনে হাত-পা সেঁকে গরম হয়ে খাবার খেতে খেতে মাঝরাত পেরোলো।

শোয়ার পর মিনিট খানেকের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়লো মুসা। রবিন দুই মিনিট। কিন্তু কিশোর জেগে রইলো আরও কিছুক্ষণ। ফেরার কথা ভাবছে। সাংঘাতিক ওই হ্রদের পানিতে আবার পনেরো ঘন্টা কাটানোর কথা ভাবতেই হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে যেতে চাইছে তার। তারপর রয়েছে দুই ঘন্টার বিমানযাত্রা। কাল রাতের আগে কিছুতেই টিসাভোয় ফিরতে পারবে না। আর অন্ধকারে সরু ওই ল্যাণ্ডিং স্ট্রিপে প্লেন নামাতে পারবে মুসা?

কখন যে ঘুমিয়ে পড়লো কিশোর, বলতে পারবে না। ঘুম ভাঙলো ডিম আর মাংস ভাজার চমৎকার সুগন্ধে।

নাস্তার টেবিলে সুখবর দিলেন ওয়ারডেন। বললেন, 'আমাদের লঞ্চে মুয়ানজায় যেতে পারবে। তাতে মাত্র সাত ঘন্টা লাগবে, অর্ধেকের বেশি সময় বাঁচবে তোমাদের। তবে একটা শর্ত আছে।'

'কী?' আগ্রহে খাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে কিশোর। ভাবতেই পারেনি, এরকম একটা সুবিধে পাবে। ওই ভেলায় আর পা রাখতে চায় না সে, লঞ্চে করে যাওয়ার জন্যে যে-কোন শর্তে রাজি।

'তোমাদের প্লেনে করে টিসাভোয় লিফট দিতে হবে আমাকে,' ওয়ারডেন বললেন। 'টমসনের সঙ্গে কিছু জরুরী আলোচনা আছে। রুবনডোয় চারটে গণ্ডার চালান দেয়ার ব্যাপারে।'

ফেরার পথেও ঝড় এলো কয়েকবার। তবু, ভেলার তুলনায় লঞ্চে করে যাওয়াটাকে মনে হলো আনন্দভ্রমণ। দুপুরের পর বিমানে চড়লো ওরা। উড়ে চললো রহস্যময় সেরেঙ্গেটি প্লেইন-এর ওপর দিয়ে।

'একটা জিনিস দেখাবো তোমাদেরকে,' হিসটো বললেন। 'ওই যে কাটা দাগটা দেখছো, ওর ওপর দিয়ে যাও।'

লম্বা গভীর একটা খাত, অনেকটা গিরিখাতের মতো দেখতে। ওটার ওপর দিয়ে উড়ে চললো মুসা।

কি যেন মনে করার চেষ্টা করছে রবিন। বললো, 'ওলডুভাই গর্জ না ওটা?'

অবাক হয়ে তার দিকে তাকালেন ওয়ারডেন। 'ডক্টর লীকি-র নাম তাহলে শুনেছো?'

শুনেছে কিশোরও।

এঁকেবেঁকে গেছে গর্জ, ঠিক ওটার ওপর দিয়ে এঁকেবেঁকে বিমান চালালো মুসা। হঠাৎ একটা তীক্ষ্ণ বাঁক ঘুরে অন্যপাশে আসতেই লোকগুলোকে দেখা গেল, ফাটলের তলায় খুঁড়ছে। এঞ্জিনের শব্দে মুখ তুলে তাকালো। হাত নাড়লো, ওয়ারডেনও হাত নেড়ে জবাব দিলেন। দেখতে দেখতে ওদেরকে পেছনে ফেলে এলো বিমান।

মুসা এই গর্জের নাম শোনেনি। জিজ্ঞেস করলো, 'কি দেখাবেন বলেছিলেন?'

'দেখলে না?' ওয়ারডেন বললেন। 'মাটি খুঁড়ছে।'

'সেটা এমন কি স্পেশাল ব্যাপার হলো?'

'ও, ওলডুভাইয়ের নাম তাহলে শোনোনি তুমি? অনেক বছর আগে ডক্টর লীকি বিশ লক্ষ বছরের পুরনো আদিম মানুষের হাড় খুঁজে পেয়েছিলেন ওখানে। সারা পৃথিবীতে সাড়া পড়ে গিয়েছিলো তখন। তার পর থেকেই লেগে আছে বিজ্ঞানীরা। আরও পুরনো ফসিল পাওয়া যায় কিনা খুঁজছে।'

'অ,' আদিম মানুষের ব্যাপারে আগ্রহ নেই মুসার। 'প্লেন ঘোরাবো?'

'ঘোরাও।'

পৃথিবীর বৃহত্তম জ্বালামুখ দেখালেন ছেলেদেরকে ওয়ারডেন। অদ্ভুত নাম মুখটার, ন্‌গোরোংগোরো। বহু দিন আগেই মরে গেছে আগ্নেয়গিরিটা। জ্বালামুখে চারপাশের দেয়াল আড়াই হাজার ফুট উঁচু। দেয়ালের গোড়া থেকে শুরু হয়েছে ঘন সবুজের রাজত্ব, ছড়িয়ে গেছে দেড়শো বর্গমাইল। ঘন বনের মাঝে মাঝে বিস্তীর্ণ তৃণভূমি, কোথাও বা নীল হ্রদ। জন্তুজানোয়ারে বোঝাই এই এলাকা।

'অনেক জানোয়ার দেখা যাচ্ছে,' কিশোর বললো।

'কি কি জানোয়ার?' জিজ্ঞেস করলো মুসা।

'চলো, নিজের চোখেই দেখবে,' ওয়ারডেন বললেন। 'নিচে দিয়ে ওড়ো।'

সিংহ, হাতি, গণ্ডার অনেক দেখা গেল। তৃণভূমিতে চরছে হাজার হাজার গরু-ছাগল-মোষ। পোষা। মাঝে মাঝে লাঠি হাতে লম্বা মাসাই রাখালদের দেখেই সেটা বোঝা যায়।

জ্বালামুখ পেছনে ফেলে এলো ওরা। সামনে দেখা গেল বিশাল এক হ্রদ, ওটার নাম লেক মনিয়ারা, জানালেন ওয়ারডেন। হ্রদের পানি নীল নয়, কালোও নয়, আশ্চর্য লাল! কাছে আসার পর বোঝা গেল কারণটা। কোটি কোটি ফ্ল্যামিংগো ভাসছে, সাঁতার কাটছে হ্রদের পানিতে। এতো ঘন হয়ে, দূর থেকে আলাদা করে চেনা যায় না, মনে হয় হ্রদের পানিই বুঝি লাল।

'এতো পাখি থাকে কি করে একখানে!' বিশ্বাস করতে পারছে না মুসা।

'থাকে যেমন, মরেও,' ওয়ারডেন বললেন। 'আগে এতো মরতো না, ইদানীং শুরু হয়েছে। কেন যেন হ্রদের পানি অতিরিক্ত লবণাক্ত হয়ে যাচ্ছে। এতো লবণ, পাখিগুলোর পায়ে দানা জমে যায়। জমে জমে তিন-চার ইঞ্চি পুরু হয়ে গেলে পা বেজায় ভারি হয়ে যায়, তখন আর উড়তে পারে না ফ্ল্যামিংগো। এই হ্রদে এখন আর ওদের খাবার নেই। অন্য জায়গা থেকে খেয়ে আসতে হয়। উড়তে না পারলে যেতেও পারে না, না খেয়ে মরে।'

'ফিরে আসে কেন?'

'হয়তো বাপ-দাদার ভিটে ছেড়ে যেতে মন চায় না,' রসিকতা করলো রবিন।

'আসলেও কিন্তু তাই,' ওয়ারডেন বললেন। 'আদিম কোনো প্রবৃত্তি কাজ করছে পাখিগুলোর রক্তে। তাই লেক মনিয়ারায় ফিরে ফিরে আসে।'

'ওদের বাচানোর কোনো উপায় নেই?' জানতে চাইলো কিশোর।

'বাঁচাতে হলে হ্রদের পানির লবণ কমাতে হবে, সেটা সম্ভব নয়। ওই যে, ছেলেগুলোকে দেখছো, ওরা বাঁচানোর চেষ্টা করছে। হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে পা থেকে লবণ ভেঙে দিচ্ছে, যাতে উড়ে যেতে পারে।'

'যাক, আফ্রিকান ছেলেরা তাহলে সচেতন হয়েছে,' খুশি হলো মুসা। 'বুড়োগুলোর মাথা থেকে শয়তান নামলেই এখন বেঁচে যেতো অনেক জানোয়ার।'

মাউন্ট কিলিমানজারোর ওপর দিয়ে আসার সময় এক ঝলক বরফ-শীতল বাতাস এসে লাগলো গায়ে। সরে আসতেই আবার গরম বাতাস। চোখে পড়লো টিসাভো ন্যাশনাল পার্ক।

অফিসেই আছেন ওয়ারডেন টমসন। হিসটোকে দেখে লাফিয়ে উঠলেন। আন্তরিক শুভেচ্ছা জানালেন একে অন্যকে।

নিরাপদে ওকাপি আর বানরটাকে রেখে এসেছে, টমসনকে শুধু একথা জানিয়ে ব্যানডায় রওনা হলো তিন গোয়েন্দা। গোসল সেরে এসে পরে সব কথা খুলে বলবে।

দরজার নিচে ফেলে রাখা কাগজটা আগে রবিনের চোখে পড়লো। নিচু হয়ে তুলে নিলো। ভাঁজ খুলে পড়লো। গম্ভীর হয়ে গেল চেহারা। কিশোরের হাতে তুলে দিতে দিতে বললো, 'হুমকি দিয়েছে।'

জোরে জোরে পড়লো কিশোরঃ

বাড়ি যাও, বিচ্ছুরা। দ্বিতীয়বার আর সাবধান করবো না।
মরবে, জানোয়ারগুলোর মতো। মনে রেখো, দুনিয়ায় এখনো
এমন কিছু জায়গা রয়েছে, যেখানে মানুষের ট্রফি সাজিয়ে রাখা হয়।

এল জে এস

'এল জে এস মানে কি?' মুসা বললো। 'লঙ জন সিলভার?'

'তাছাড়া আর কে?' চিন্তিত দেখাচ্ছে গোয়েন্দাপ্রধানকে।

'ফালতু হুমকি না তো?'

'মনে হয় না। সে সিরিয়াস লোক। যা বলেছে করবে। আর শুধু সে কেন? কোটি কোটি ডলার কামানোর জন্যে দুনিয়ার অনেক লোকই মানুষ খুন করতে দ্বিধা করবে না।'

'তাহলে? বাড়ি ফিরে যাচ্ছি?'

'মাথা খারাপ। একটা শয়তানের শাসানিতে ভয়ে পালাবো? অসম্ভব। সিলভারকে ব্রোঞ্জ বানিয়ে ছাড়বো আমি,' দাঁতে দাঁত চাপলো কিশোর।

'আমিও,' দৃঢ় কণ্ঠে বললো মুসা। 'টিসাভো থেকে পোচার উচ্ছেদ না করে যাচ্ছি না আমি।'

'কিন্তু ব্যাটাকে ধরি কিভাবে?' প্রশ্ন রাখলো রবিন।

'দেখা যাক,' কিশোর বললো। 'বুদ্ধি একটা বের করতে হবে। পাঁচ মাইল লম্বা যে ট্র্যাপ-লাইনটা দেখেছিলাম, কাল সকালে যাবো ওখানে। এবার আর পোচার নয়, সিলভারকে ধরার দিকে নজর দেবো।'

আঠারো

সেরাতে গাড়ির শব্দে ঘুম ভেঙে গেল কিশোরের। বিশেষ গুরুত্ব দিলো না। ভোর রাতে আবার ঘুম ভাঙলো, শুনলো, চলে যাচ্ছে গাড়িটা।

সকালে নাস্তার পর ট্র্যাপ-লাইনে যাবার জন্যে তৈরি হলো গোয়েন্দারা। সঙ্গে যাবে ওয়ারডেনের কয়েকজন রেঞ্জার আর তিরিশজন মাসাই। হিসটোর সঙ্গে জরুরী কাজ আছে টমসনের, তিনি যেতে পারছেন না। তবে অসুবিধে নেই, রেঞ্জারদের প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে দিলেন তিনি, কিশোরের কথা যেন মেনে চলে।

ট্র্যাপ-লাইনের মাইল খানেকের মধ্যে থামলো গাড়ির মিছিল।

'সাপ্লাই ভ্যানে টিয়ার গ্যাসের ক্যান আছে,' মাসাইদের বললো কিশোর। 'সবাই একটা করে নিয়ে এসো,' কিভাবে কি করতে হবে বুঝিয়ে দিলো সে।

আবার এগোলো গাড়ির মিছিল। ট্র্যাপ-লাইনের কয়েক শো গজ দূরে এসে থামলো, আগের বার এক মাইল লম্বা লাইনটার সামনে যেভাবে দাঁড়িয়েছিলো, সেভাবে। পোচারদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যে জোরে জোরে হর্ন বাজাতে লাগলো। লাইনের ফাঁকে উঁকিঝুঁকি মারতে শুরু করলো কালো কালো মুখ। বারোজন

মাসাইকে নিয়ে, ঘুরে, পোচারদের ক্যাম্পের পেছনের বনে গিয়ে ঢুকলো কিশোর। রবিন আর মুসাকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে এসেছে।

আগের বারের কৌশল এবারেও করতে পারে সিলভার। দলের পেছনে নিরাপদ জায়গায় থাকতে পারে। যদি দেখে পোচাররা হেরে যাচ্ছে, চুরি করে পালানোর চেষ্টা করবে আগের বারের মতোই। বনের ভেতর দিয়ে ছাড়া অলক্ষ্যে যাওয়ার জায়গা নেই, তাই এখানে চলে এসেছে কিশোর।

মাসাইদের নিরস্ত্র হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সাহস পেয়ে গেল পোচাররা। তীর ছুঁড়তে ছুঁড়তে এগিয়ে গেল। বাধা আসছে না দেখে সাহস আরও বাড়লো। মাসাইদের টিটকারি মারতে মারতে এগুলো বল্লম হাতে।

ইঙ্গিতের জন্যে বার বার মুসার দিকে তাকাচ্ছে মাসাইরা।

পোচাররা পঞ্চাশ ফুটের মধ্যে চলে এলে প্রথম ক্যানটা ছুঁড়ে মারলো মুসা। 'মারো!' বলে রবিনও তার হাতেরটা ছুঁড়লো।

উড়ে গেল এক ঝাঁক ক্যান। জন্তু-খুনীদের সামনের শক্ত মাটিতে পড়ে ফাটলো একের পর এক। চোখের পলকে ওদেরকে ছেয়ে ফেললো হলদে-সাদা ধোঁয়া। কাশতে শুরু করলো পোচাররা। দম বন্ধ হয়ে আসছে, শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। আতঙ্কে গলা ফাটিয়ে চেঁচাতে শুরু করলো কেউ কেউ, লুটিয়ে পড়লো মাটিতে। লম্বা ঘাসে নাক গুঁজে ধোঁয়া থেকে বাঁচতে চাইলো। কয়েকজন টলতে টলতে ছুট দিলো কুঁড়ের দিকে।

ঠিক এই সময় বন থেকে বেরিয়ে উল্টো দিক থেকে ছুটে এলো কিশোর। সিলভারকে খুঁজতে লাগলো। কোথাও দেখা গেল না তাকে। মাটিতে বুটের ছাপও নেই। আধ ঘন্টা ধরে খোঁজাখুঁজি করেও তার কোনো চিহ্ন পাওয়া গেল না।

ইতিমধ্যে উঠে দাঁড়িয়েছে কিছু পোচার, কিন্তু চোখে ভীষণ জ্বালা। পানি গড়াচ্ছে। দেখতে পারছে না ঠিকমতো। লড়াইয়ের উদ্যম একেবারেই তিরোহিত হয়েছে। ঘিরে ফেলা হলো ওদের।

মোমবাসায় জেলে গিয়ে ক'টা দিন সুখে কাটিয়ে আসার ইচ্ছে যাদের ছিলো, হতাশ হতে হলো তাদেরকে।

'গাঁয়ে ফিরে যেতে বলুন ওদের,' মুগামবিকে বললো কিশোর। 'হুঁশিয়ার করে দিন, আবার জানোয়ার মারতে এসে ধরা পড়লে কপালে অনেক দুঃখ আছে।'

পোচাররা চলে গেল।

ফাঁদে আটকা পড়া জানোয়ারগুলোর মাঝে যেগুলো তখনও বেঁচে রয়েছে, ছেড়ে দেয়া হলো। বেশি জখমীগুলোকে গাড়িতে তুলে নেয়া হলো চিকিৎসার জন্যে। আর যেগুলো মরে গেছে তো গেছেই। সমস্ত ফাঁস, ফাঁদ তুলে নেয়া হলো।

সব ক'টা কুঁড়ে আর পাঁচ মাইল লম্বা ঘাসের বেড়া পুড়িয়ে ছাই করে দেয়া হলো।

লজে ফিরে এলো গাড়ির মিছিল। সব কথা টমসনকে জানালো তিন গোয়েন্দা। সিলভারকে পায়নি বলে দুঃখ করলো অনেক।

'মন খারাপ করো না,' সান্ত্বনা দিলেন ওয়ারডেন। 'ব্যাটাদের অনেক ক্ষতি করে দিয়ে এসেছো। ভয় পাইয়ে দিয়েছো। কম করোনি। যাবে কোথায় সিলভার? আজ হোক কাল হোক, ধরা তাকে পড়তেই হবে। ও, ভালো কথা, জজ নির্মল পাণ্ডা তোমাদের গুড লাক জানিয়েছেন।'

'কোথায় উনি?' জিজ্ঞেস করলো কিশোর।

'তখন বলতে ভুলে গিয়েছিলাম। কাল রাতে এসেছিলো, ভোরে চলে গেছে তাড়াহুড়ো করে। জরুরী কাজ নাকি আছে।'

'আমরা যে আজ পোচার ঠেঙাতে যাবো, সেকথা বলেছিলেন ওঁকে?'

'নিশ্চয়। পোচারদের ব্যাপারে সব সময় তার আগ্রহ।'

দ্বিধা করে শেষে বলেই ফেললো কিশোর,'স্যার, জজ সাহেব আপনার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। কথাটা কিভাবে নেবেন জানি না। একটা প্রশ্ন জাগছে আমার মনে, উনি কি সত্যি আমাদের পক্ষে না বিপক্ষে?'

খুব অবাক হলেন ওয়ারডেন। ভুরু কুঁচকে দীর্ঘক্ষণ তাকিয়ে রইলেন কিশোরের দিকে। 'দেখো, এমন একজন লোককে সন্দেহ করছো, যাকে কোনো মতেই অবিশ্বাস করা উচিত না। এদেশে পোচিঙের বিরুদ্ধে যাঁরা সব চেয়ে বেশি শোরগোল তুলেছেন, জজ সাহেব তাঁদের একজন। জন্তুজানোয়ারের জন্যে নিবেদিত প্রাণ। আমাদের বিপক্ষে যাওয়ার তো প্রশ্নই ওঠে না। এই সেদিনও তোমাদের সামনেই আমার প্রাণ বাঁচালো।'

'শুধু মুখে মুখেই জানোয়ারকে ভালোবাসার কথা বলে? না করেও কিছু?'

'অবশ্যই করে।'

ডেস্কের ড্রয়ার খুলে একটা চেক বের করলেন টমসন। টেবিলের ওপর রেখে কিশোরের দিকে ঠেলে দিয়ে বললেন, 'এই দেখো, কাল রাতে দিয়েছে। ওর সময় নেই। আমাকে ওয়াইল্ডলাইফ সোসাইটিতে পাঠিয়ে দেয়ার অনুরোধ করেছে।'

দু'হাজার পাউণ্ডের চেক।

'এবার বুঝলে তো?' কিশোরকে নীরব দেখে আবার বললেন ওয়ারডেন। 'শুধু কথা নয়, কাজেও করে দেখায়। এদেশে একজন জজের বেতন আর কতো বলো? তার থেকে জমিয়ে দু'হাজার পাউণ্ড জন্তুজানোয়ারের উপকারের জন্যে দান করা···না,কিশোর, নির্মল সত্যি মহৎ।'

'কি জানি, স্যার,' সন্দেহ গেল না কিশোরের। 'হয়তো আমিই লোক চিনতে ভুল করেছি। সাধারণত এমন ভুল হয় না আমার।'

'ভুল মানুষেরই হয়,' কথাটা সামান্য রুক্ষই শোনালো।

ব্যানডায় ফিরে এলো কিশোর। মুসা আর রবিনকে জানালো যা যা কথা হয়েছে।

'কি জানি, হয়তো সত্যি ভুল করেছো,' মুসা বললো। 'লোকটাকে দেখে কিন্তু খারাপ মনে হয় না।'

'না, ভুল আমি করিনি,' জোর দিয়ে বললো কিশোর। 'অসম্ভব ধড়িবাজ লোক ওই জজ।'

'তাহলে টাকা যে দিলো?' রবিন বললো।

'সেটা তো খুব সহজ একটা ব্যাপার। ওই ব্যাটা কি আর জজের বেতন দিয়ে চলে? কোটিপতির সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। টাকার অভাব আছে নাকি? ওর কাছে দু'হাজার পাউণ্ড কিচ্ছু না। কিন্তু দান করে ওয়ারডেনের চোখে ভেলকি লাগিয়ে দিয়েছে। আমি শিওর, সিলভারের সঙ্গে সম্পর্ক আছে ওর।'

'সেটা নাহয় আমরা বিশ্বাস করলাম, ওয়ারডেনকে কিছুতেই বিশ্বাস করাতে পারবে না। করাতে হলে জোরালো প্রমাণ দরকার।'

'সেটাই জোগাড় করতে হবে আমাদের, যেভাবে হোক।'

'কিন্তু কিভাবে?' মুসা প্রশ্ন করলো।

'জানি না এখনও,' নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটলো একবার গোয়েন্দাপ্রধান। 'আজকে একটা ব্যাপার লক্ষ্য করেছো? সিলভারকে পোচারদের কুঁড়েতে পাওয়া যায়নি। কেন? কারণ, আগেই তাকে সাবধান করে দেয়া হয়েছে। আমরা আজ পোচার ধরতে যাবো, একথা কাল রাতে জজকে বলেছেন টমসন। খুব ভোরে উঠে চলে গেল সে। কোথায়? নিশ্চয় পোচারদের ক্যাম্পে, সিলভারকে বলার জন্যে,' হাতের উল্টো পিঠ কপালে ঘষলো কিশোর। 'তবে সবই আমার অনুমান। আদালতে টেকে, এমন প্রমাণ জোগাড় করতে হবে?'

'তাহলে সেই চেষ্টাই করা যাক,' মুসা বললো। 'এখানে বসে থেকে সেটা হবে না নিশ্চয়!'

উনিশ

পোচারদের আরেকটা ক্যাম্প আবিষ্কার করেছে তিন গোয়েন্দা।

পাহাড় আর উপত্যকার ওপর দিয়ে চক্কর মারছে মুসা। বিনকিউলার চোখে

লাগিয়ে তন্নতন্ন করে নিচের এলাকা খুঁজছে কিশোর, মাঝে মাঝে যন্ত্রটা তুলে দিচ্ছে রবিনের হাতে। আরেকটা ট্র্যাপ-লাইন খুঁজছে ওরা। লাইন থাকলে পোচার থাকবে, পোচার থাকলে সিলভারকে পাওয়ার সম্ভাবনা।

লাইন দেখা গেল না। শুধু কয়েকটা ঘাসের কুঁড়ে। মানুষ চোখে পড়লো না। আশেপাশে মাইলের পর মাইল জুড়ে একই অবস্থা, নির্জন।

'ভয় পেয়ে চলে গেছে হয়তো,' রবিন বললো।

'আমার মনে হয় না,' মাথা নাড়লো কিশোর। 'বনে গিয়ে লুকিয়েছে বড় জোর। মুসা, ওই ডোবাটার কাছে যাও তো।'

জানোয়ার গিজগিজ করছে ডোবার পাড়ে; হাতি, গণ্ডার, জেব্রা, হরিণ; দিবাচর আফ্রিকান যতো প্রাণী আছে, প্রায় সব। শুধু পোচার বাদে।

হঠাৎ, ফোয়ারার মতো ছিটকে উঠলো ডোবার পানি, তারপর কাদা, সব শেষে ধোঁয়া। কানে এলো বিস্ফোরণের শব্দ। বাতাস অস্থির হয়ে যাওয়ায় সাঙ্ঘাতিক দুলে উঠলো বিমান। ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল ছোট ছোট জানোয়ার, বড়গুলো সুতো-ছেঁড়া গ্যাস-বেলুনের মতো লাফিয়ে উঠলো শূন্যে। মুহূর্ত আগে যে জায়গাটা স্বর্গ ছিলো ওদের জন্যে, সেটা হয়ে গেল নরক। শত শত জীবের গোরস্থান।

'খাইছে!' চেঁচিয়ে উঠলো মুসা। 'ডিনামাইট!'

কিছুই বললো না কিশোর। নীরবে মাথা দোলালো শুধু।

বন থেকে পিলপিল করে বেরিয়ে আসতে লাগলো পোচারের দল। জখমী বড় জানোয়ারগুলোকে বল্লম দিয়ে খুঁচিয়ে মারতে শুরু করলো। ছোট ছোট জানোয়ারের মাথা, লেজ, আর দরকারী অঙ্গ কেটে নিতে লাগলো জীবন্ত অবস্থায়ই। রোমহর্ষক দৃশ্য!

উত্তেজনায় প্রথমে প্লেনটা দেখতে পায়নি পোচাররা, খেয়াল করতেই লুকিয়ে পড়ার জন্যে দৌড় দিলো বনের দিকে। তাড়াতাড়ি লজে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দিলো মুসাকে কিশোর।

ওয়ারডেনকে পাওয়া গেল না, জরুরী কাজে বেরিয়েছেন হিসটোকে নিয়ে। দেরি করলো না কিশোর। যতো দ্রুত পারলো, মাসাইদের নিয়ে ফিরে এলো সেই ডোবাটার ধারে।

কিন্তু, এতো তাড়াতাড়ি করেও কিছু করতে পারলো না। অনেক সময় গেছে। ইতিমধ্যে যা যা নেয়ার, নিয়ে কেটে পড়েছে পোচাররা। ডোবার ধারে জন্তুজানোয়ারের খণ্ডিত, ক্ষত-বিক্ষত লাশ ছাড়া আর কিছুই পাওয়া গেল না। পানিতেও অসংখ্য মৃতদেহ। তুলে না ফেললে পচে নষ্ট হবে ডোবার পানি। ওই

পানি খেয়ে মড়ক লাগবে জানোয়ারের, পালে পালে মরবে।

কাজে লেগে পড়লো রেঞ্জার আর মাসাইরা। অমানুষিক পরিশ্রম করে সমস্ত মৃতদেহ তুলে আনলো পানি থেকে। ডাঙায় ফেলে রাখলে অসুবিধে নেই। খেয়ে সাফ করে ফেলবে শবভোজী প্রাণীরা। পরদিন সকালে এলে হাড় ছাড়া আর কিছুই দেখা যাবে না।

সন্ধ্যার পর লজে ফিরলো দলটা। ভীষণ ক্লান্ত। পেটে খিদে। মেজাজ খারাপ।

পরদিন সকালে আবার বিমান নিয়ে বেরোলো গোয়েন্দারা। সরে এলো উত্তরে, চল্লিশ মাইল দূরে···পঞ্চাশ···ষাট···ডানে খানিকটা মোড় নিয়ে পেরিয়ে এলো আরো দশ মাইল। চোখে পড়লো ধোঁয়া।

কাছে গিয়ে যা দেখলো, নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারলো না। বেশ কিছুটা জায়গা ঘিরে শুকনো ঘাসে আগুন ধরিয়ে দেয়া হয়েছে। জ্বলছে দাউ দাউ করে। আগুনের বৃত্তের মাঝে পাগলের মতো ছোটাছুটি করছে অনেকগুলো হাতি। বেরোনোর পথ পাচ্ছে না।

পোচাররা রয়েছে নিরাপদ দূরত্বে।

বারো ফুট লম্বা হাতিঘাসের জঙ্গলে নিশ্চিন্তে চরছিলো হাতিগুলো। ভাবতেই পারেনি ওদের ওপর নেমে আসবে নির্মম মৃত্যুর করাল থাবা, জীবন্ত পুড়ে কাবাব হবে। বড় বড় কয়েকটা জানোয়ার মরিয়া হয়ে ছুটলো আগুনের ভেতর দিয়েই। ফলে মৃত্যু হলো আরও নির্মম, আরও যন্ত্রণাদায়ক। আগুনের বাইরে বেরিয়ে অদ্ভুত ভাবে নাচতে শুরু করলো, উন্মাদ হয়ে গেছে যেন। আসলে, পায়ের পাতা পুড়ে গেছে ওগুলোর। মাটিতে পা রাখতে পারছে না। সেই সাথে রয়েছে শরীরের অন্য জায়গা পুড়ে যাওয়ার জ্বালা। মরবে ওগুলো, জানা কথা। বৃত্তের ভেতরে থাকলেই বরং ভালো ছিলো, তাড়াতাড়ি মরতো। পোড়া পায়ের পাতা নিয়ে হাঁটতে পারবে না। খাবার, বিশেষ করে পানির অভাবে কাহিল হবে। অসহায় শিকারে পরিণত হবে হায়েনা, কিংবা হিংস্র পোচারের।

নগ্ন কালো পিশাচগুলোর মাঝে আরেকটা দাড়িওয়ালা পিশাচকে দেখা গেল, গায়ে বুশ জ্যাকেট, পরনে সাফারি ট্রাউজার।

'সিলভার!' হাত তুলে দেখালো রবিন।

শাঁ করে আরও কাছে বিমান নিয়ে গেল মুসা, নিচে নামলো। শব্দ শুনে ওপর দিকে চেয়ে হাসলো সিলভার, হাত নাড়লো।

'শয়তান!' দাঁতে দাঁত পিষলো মুসা। 'ব্যাটা জানে, এখন আমরা কিছু করতে পারবো না। লজে গিয়ে দলবল নিয়ে আসতে আসতে চলে যাবে।'

'চলো, জলদি ফিরে চলো, কুইক!' তাড়া দিলো কিশোর। 'দেখিই না এসে, কিছু করা যায় কিনা?'

কিছুই করা গেল না। চলে গেছে পোচাররা। তাড়াহুড়োয় যা যা নিতে পেরেছে; নিয়ে গেছে। লেজ, পায়ের পাতা, চোখের পাপড়ি, কান। তবে সব চেয়ে দামী জিনিসটাই ফেলে যেতে হয়েছে। দাঁত।

হাতির দাঁত খুলে নেয়া খুবই কঠিন কাজ। হাড় আর মাংসে শক্ত হয়ে লেগে থাকে, যেন সিমেন্টে গাঁথা। কুড়াল দিয়ে কুপিয়ে কেটে বের করতেও কষ্ট হয়। সহজ উপায় হলো, লাশটা ফেলে রাখা। পচে গলে মাংস খসে গেলে তখন নেড়েচেড়ে গোড়া থেকে খুলে নেয়া যায় দাঁত। কিন্তু তার জন্যে অনেক সময় দরকার।

এরপর থেকে যেন বাতাসে মিলিয়ে গেল সিলভার আর তার খুনীর দল। পাহাড়, জঙ্গল, তৃণভূমির ওপর চক্কর দিয়ে দিয়ে ফিরলো গোয়েন্দারা। কিন্তু কিছুই দেখলো না আর। ঘাসের কুঁড়ে নেই, ট্র্যাপ-লাইন নেই, ডিনামাইট ফাটলো না, আগুন লাগলো না।

'পোচিং ছেড়ে দিলো নাকি ব্যাটারা?' অবাকই হয়েছে রবিন। 'ভয় পেলো শেষমেষ!'

'ইবলিস কি আর শয়তানী ছাড়ে?' প্লেন চালাতে চালাতে মন্তব্য করলো মুসা। 'লুকিয়েছে আরকি। হয়তো কিছুদিনের জন্যে গিয়ে গর্তে ঢুকেছে।'

গভীর ভাবনায় ডুবে ছিলো কিশোর। ঝট করে মাথা ফেরালো। 'কি বললে? গর্ত?' তুড়ি বাজালো। 'ঠিক বলেছো! নিশ্চয় গর্তেই লুকিয়েছে। কোথায় যেন পড়েছি, হাতি ধরার জন্যে গর্ত খুঁড়ে রাখে পিগমিরা। ওপরটা ঢেকে রাখে ডালপাতা দিয়ে। না দেখে হাতি গিয়ে পড়ে সেই গর্তে। ওপর থেকে তখন বড় বড় পাথর ছুঁড়ে আর বল্লম দিয়ে খুঁচিয়ে সেটাকে মেরে খেয়ে ফেলে।'

'একেবারে আদিম পদ্ধতি,' বিড়বিড় করলো রবিন। 'প্রাগৈতিহাসিক মানুষও ওভাবে ম্যামথ শিকার করতো।'

'আরও একটা কাজ করে পিগমিরা,' রবিনের কথা যেন শুনতেই পায়নি গোয়েন্দাপ্রধান। 'জরুরী মুহূর্তে ওই গর্তকে বাংকার হিসেবেও ব্যবহার করে।'

'তারমানে,' মুসা বললো। 'তুমি বলতে চাইছো, পোচাররাও হাতি ধরার গর্তকে বাংকার হিসেবে ব্যবহার করছে?'

'হ্যাঁ! আজ আর বেলা নেই। কাল সকালে এসে খুঁজবো।'

লজে ফিরে দেখলো ওরা, জজ নির্মল পাণ্ডা হাজির।

'এই যে ছেলেরা,' দেখেই হাসিমুখে বলে উঠলেন তিনি। 'খুঁজে পেয়েছো?'

'এখনও পাইনি। তবে পাবো,' গম্ভীর হয়ে জবাব দিলো কিশোর।

'যাবে কোথায় শুয়োরের বাচ্চা?' ইচ্ছে করেই গালিটা দিলো মুসা। আড়চোখে তাকালো জজের দিকে।

'আমি হলে হাল ছেড়ে দিতাম,' হাসি বিন্দুমাত্র মলিন হলো না জজের। 'তোমরাও ছাড়বে। এখনও বুঝতে পারছো না তো। আমরা কি আর কম চেষ্টা করেছি, কম খুঁজেছি? পাইনি। দেখো, চেষ্টা করে দেখো। পেলে তো ভালোই।'

কিশোরের মনে হলো, জজের কথাবার্তা আর হাসির পেছনে কি যেন একটা প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত রয়েছে। রাগে মুসার মতোই গাল দিয়ে উঠতে যাচ্ছিলো, অনেক কষ্টে সামলালো নিজেকে। শান্তকণ্ঠে বললো, 'আপনার মহানুভবতার কথা বলেছেন আমাকে মিস্টার টমসন। ওয়াইল্ডলাইফ সোসাইটিকে নাকি অনেক টাকা দান করেছেন।'

বিগলিত হলো জজের হাসি, হাত নাড়লো বিনীত ভঙ্গিতে। 'ও কিছু না। নেই তো, দেবো কোত্থেকে? ইচ্ছে করে দুনিয়ার সমস্ত ধন এনে লাগাই অসহায় অবলা জানোয়ারগুলোর উপকারে। কিন্তু কয় পয়সা আর বেতন পাই বলো? তা থেকেই কষ্টেসৃষ্টে জমিয়ে যা পেরেছি দিয়েছি।'

'খুব ভালো, খুব ভালো, আপনার অনেক দয়া। তবে ইচ্ছে করলে অনেক বেশি টাকা কামাতে পারেন। এদেশের অনেক জজ সাহেবই সেটা করছেন।'

'মানে?' কালো হয়ে গেল জজের মুখ। হাসি উধাও।

'ধরুন—মানে, আমি কল্পনা করতে বলছি আরকি আপনাকে—আপনি মোটেই সৎ লোক নন। ভদ্রলোক নন, নিতান্তই ছোটলোক। পোচারদের সঙ্গে আপনার যোগসাজশ আছে। পোচারদের ধরে আপনার কোর্টে পাঠালে নানারকম অজুহাত দেখিয়ে বেশির ভাগকেই ছেড়ে দেন, অল্প কয়েকজনকে লোক দেখানো শাস্তি দেন, এই দু'চার দিনের জন্যে। শহরে যতো বড় বড় অন্যায় ঘটে, সব দেখেও না দেখার ভান করেন। কেন করেন? দু'হাত ভরে টাকা দেয়া হয় আপনাকে, বিনিময়ে। কালো টাকার পাহাড় জমিয়ে ফেলছেন। অথচ এমন ভাব করে থাকেন, যেন আপনার মতো সৎ লোক আর হয় না, সবার জন্যে দরদ উথলে পড়ে। মাঝে মাঝেই টাকা দান করেন ওয়াইল্ডলাইফ সোসাইটিতে, যাতে আপনার ওপর সন্দেহ না পড়ে কারও।'

রাগে লাল হয়ে গেছে জজের মুখ। মোলায়েম দৃষ্টি আর মোলায়েম নেই, যেন ইস্পাতের তলোয়ারের ধারালো ফলার চোখা মাথা। কিশোরের হৃৎপিণ্ডে বেঁধার চেষ্টা করছে। জোর করে শুকনো হাসি ফোটালেন মুখে। 'খুব কল্পনাপ্রবণ ছেলে

তুমি। আমার মতো নিরীহ, জানোয়ার...,' দরজার দিকে চোখ পড়তে থেমে গেলেন।

খোলা দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে সিমবা। মুসাকে খুঁজতেই এসেছিলো বোধহয়, জজ সাহেবকে দেখে রেগে গেছে। দাঁতমুখ খিঁচিয়ে চেয়ে আছে তাঁর দিকে। চাপা ঘড়ঘড় করতে করতে ঘরে ঢুকলো।

কি ভেবে জ্বলে উঠলো কিশোরের চোখ। দুই সহকারীকে বললো, 'চলো, যাই।'

অবাক হলো রবিন আর মুসা, কিন্তু কিছু বললো না। কিশোরের এই অদ্ভুত ব্যবহারের নিশ্চয় কোনো কারণ আছে। পিছু পিছু বেরিয়ে এলো ওরা।

ঠোঁটে আঙুল রেখে ওদেরকে চুপ থাকতে বলে জানালার কাছে গিয়ে ঘরের ভেতরে উঁকি দিলো কিশোর।

বাঘের দৃষ্টিতে কুকুরটার দিকে তাকিয়ে আছেন জজ। দরজার মুখে বসে আছে ওটা। জোরে জোরে হাত নেড়ে ওটাকে ভাগার নির্দেশ দিলেন। নড়লো না সিমবা। গোঁ গোঁ করে উঠলো। দাঁত খিঁচালো আরেকবার। টেবিলে জোরে কিল মারলেন জজ। তারপর ছুটে গিয়ে ধাঁ করে এক লাথি মারলেন কুকুরটার গলায়। আর যায় কোথায়। গাঁউক করে এসে তাঁর বুকে দু'পা তুলে দিলো সিমবা। টুঁটি কামড়ে ধরতে গেল। চোখের পলকে ছুরি বেরিয়ে এলো নিরীহ জজের হাতে। শিকারী কুকুরের বংশধর সিমবা, অসাধারণ ক্ষিপ্র। পেটে ছুরি বেঁধার আগেই লাফ দিয়ে সরে গেল। পরমুহূর্তে কামড়ে ধরলো জজের ছুরি ধরা হাত। ছুরিটা ফেলার পর তবে ছাড়লো।

হেরে গিয়ে ধপ করে একটা চেয়ারে বসে পড়লেন জজ। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে পুরো এক মিনিট চাপা গলায় গর্জালো বুনো-কুকুরের বাচ্চা, তারপর বেরিয়ে গেল।

জানালার কাছ থেকে সরে এলো তিন গোয়েন্দা। মুসাকে দেখে আদুরে তার কাছে চলে এলো সিমবা।

ব্যানডায় ফিরে বললো কিশোর, 'এই তাহলে নিরীহ জন্তু-প্রেমিক!'

'এতো সুন্দর একটা কুকুরের সঙ্গে এরকম ব্যবহার করে,' মুসা বললো। 'ব্যাটা মানুষ নাকি?'

'তোমার কথাই ঠিক, কিশোর,' রবিন বললো। 'জজ নির্মল পাণ্ডা লোক ভালো নয়।'

'কিন্তু কে বিশ্বাস করবে আমাদের কথা?' ভুরু নাচালো গোয়েন্দাপ্রধান। 'প্রমাণ লাগবে। প্রমাণ!'

বিশ

'আমার মনে হয় এখানেই আছে গর্তগুলো।'

নিচের দিকে তাকিয়ে রয়েছে মুসা, কন্ট্রোলে হাত। গর্ত চোখে পড়ছে না। তবে অনেক জায়গার ঝোপঝাড় কাটা, নিচে মাটি দেখা যায় না, ডালপাতা আর ঘাস বিছিয়ে আছে। কাছাকাছি রয়েছে বাওবাব গাছের ছোট জঙ্গল। অনেক ওপর থেকে মনে হয়, পেট ফেটে নাড়ীভুঁড়ি বেরিয়ে থাকা মরা জলহস্তী। মোটা, পেট ফোলা, বাকলও জলহস্তীর চামড়ার মতো দেখতে।

আশেপাশে কোথাও পোচারদের একটা কুঁড়ে চোখে পড়লো না। জনমানবের ছায়াও নেই। গর্ত থাকলে ঝোপঝাড়গুলোর মাঝেই আছে, নিচে লুকিয়ে রয়েছে পোচাররা।

'নিচে না নামলে বোঝা যাবে না,' কিশোর বললো। 'লজে ফিরে চলো। লোক নিয়ে আসবো।'

আরও মিনিট দশেক ঠিকমতোই চললো বিমান। তারপর শুরু করলো গোলমাল। নাচছে, দুলছে, কাত হয়ে যাচ্ছে থেকে থেকে। পাঁড় মাতাল হয়ে গেছে যেন।

'ব্যাপার কি?' বুঝতে পারছে না রবিন। 'পকেট?'

'নাহ্,' উঁকি দিয়ে বিমানের শরীরের বাইরের অংশ দেখার চেষ্টা করছে কিশোর। 'এয়ার পকেট নয়। তাছাড়া এখানে থাকার কোনো কারণ দেখছি না। অন্য কিছু হয়েছে।'

'সেটা কী? মুসা, কন্ট্রোলে কোনো গণ্ডগোল?'

'কি জানি। আমি কোথাও নড়চড় করিনি।'

'কিন্তু কিছু একটা তো হয়েছে!'

ভীত ঘোড়ার মতো নাচতে শুরু করেছে এখন প্লেন।

'ওই দেখো,' চেঁচিয়ে বললো কিশোর। 'ডানের ডানাটা কেমন ঝুলে যাচ্ছে!'

থরথর করে কাঁপছে ডানাটা, ঝরা পাতার মতো খসে উড়েই যাবে বুঝি যে-কোনো মুহূর্তে।

বিমানের নাক সোজা রাখার যথাসাধ্য চেষ্টা করছে মুসা, সম্ভব হচ্ছে না। কথাই শুনতে চাইছে না যেন ওটা। উঁচু একটা ক্যাপোক গাছের ওপর দিয়ে শাঁ করে বেরিয়ে এলো, আর সামান্য নিচে নামলেই বাড়ি লেগে ছাতু হয়ে যেতো। বেড়ে গেছে দুলুনি।

'কিছুতেই সামলাতে পারছি না,' মুসার গলা কাঁপছে। 'ক্র্যাশ করবেই। তৈরি

থাকো তোমরা। দরকার হলে লাফিয়ে পড়তে হবে।'

বিমানের নাক নিচের দিকে। ধাক্কা লাগানোর জন্যে দ্রুত ধেয়ে আসছে যেন মাটি। ইগনিশন অফ করে দিলো মুসা। এঞ্জিন বন্ধ, নিজের ইচ্ছেয় ছুটছে বিমান। চাকা লাগলো মাটিতে…প্রচণ্ড ঝাঁকুনি…তীক্ষ্ণ একটা শব্দ, ছিঁড়ে পড়ে গেল ডান ডানা…বড় একটা উইয়ের ঢিবিতে গুঁতো লাগিয়ে স্থির হয়ে গেল প্লেন।

'যাক, বাঁচলাম!' ফোঁস করে নিঃশ্বাস ছাড়লো মুসা।

'বাঁচার কি হলো?' চেঁচিয়ে বললো রবিন।

'আগুন লাগেনি। মরিনি আমরা। বাঁচলাম না?'

'বাঁচলাম বলা যাবে না এখনও। বেঁচে নামলাম। লজে ফিরে যেতে না পারলে…এই কিশোর, কি ভাবছো? কিছু বলছো না কেন?'

'উঁ!' ফিরে তাকালো কিশোর। 'কি বলবো? ডানা ছেঁড়ার ব্যাপারটা মোটেই স্বাভাবিক নয়। কেন ছিঁড়বে?…চলো, নেমে দেখি।'

পঞ্চাশ ফুট পেছনে পড়ে আছে ডানাটা। কাছে গিয়ে দাঁড়ালো তিন গোয়েন্দা। ভালোমতো পরীক্ষা করে দেখলো কিশোর। বিড়বিড় করলো আনমনে, 'আপনা-আপনি ছেঁড়েনি। ছেঁড়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে।'

'মানে!' অবাক হয়ে গোয়েন্দাপ্রধানের দিকে তাকালো দুই সহকারী।

'বুঝতে পারছো না? এই দাগটা দেখো। স্বাভাবিক ভাবে ছিঁড়লে এটা অন্য রকম হতো, এতো নিখুঁত, সোজা নয়। করাত দিয়ে কেটে দুর্বল করে রাখা হয়েছিলো ডানার গোড়া, যাতে কিছুক্ষণ ওড়ার পরই ভেঙে পড়ে। সম্মানিত বোধ করছি,' তিক্ত কণ্ঠ, বিরক্তিতে কুঁচকে গেছে মুখ। 'কেউ একজন আমাদের ইমপরট্যান্ট লোক ভাবতে আরম্ভ করেছে। তার পাকা ধানে যাতে মই দিতে না পারি সে-জন্যে খুন করতে চেয়েছে।'

ছড়ে যাওয়া কনুই ডলছে রবিন। বাঁ হাঁটুতে হাত বোলাছে মুসা। টিপ দিয়েই উহ্ করে উঠলো।

'কি হয়েছে?' জিজ্ঞেস করলো কিশোর।

'না, কিছু না। নামার সময় বাড়ি লেগেছে হয়তো। ফুলে গেছে। তো, এখন কি করা? প্লেনে তো রেডিও নেই। আগুন জ্বেলে সংকেত দেবো?'

'লাভ হবে না। লজ এখান থেকে পঞ্চাশ মাইল দূরে। এতো দূর থেকে কেউ দেখবে না। বরং যারা দেখবে, তারা পোচার। ছুটে আসবে। মরিনি দেখে খুশিই হবে। ওদেরকে জ্বালানোর শোধ তুলবে আমাদের ওপর।'

'তাহলে কি করবো?' রবিন বললো। 'এখানেই বসে থাকবো? আমাদেরকে ফিরতে না দেখে খুঁজতে আসবে ওয়ারডেনের লোক।'

'আসবে বলতে পারি না, তবে খুঁজতে বেরোবে। একশো মাইল বুনো

এলাকায় আমাদের খুঁজে বের করতে ওদের ক'হপ্তা লাগবে কে জানে! যখন পাবে, কঙ্কাল ছাড়া আর কিছু অবশিষ্ট থাকবে না। একটাই উপায় আছে এখন। হেঁটে লজে চলে যাওয়া।'

ব্যাগ-ট্যাগগুলো নেয়ার জন্যে প্লেনে ফিরে চললো ওরা। কিশোর লক্ষ্য করলো, সাংঘাতিক খোঁড়াচ্ছে মুসা। 'আরি, তোমার পায়ের অবস্থা তো খুব খারাপ। ভাঙেনি তো?'

'না।'

'কিন্তু পঞ্চাশ মাইল হাঁটতে তুমি পারবে না।'

'পারবো, পারবো। চলোই না।'

'কি করে পারবে? পঞ্চাশ ফুটই তো পারছো না। বেশি চাপাচাপি করলে আরও ফুলবে। বয়ে নিতে হবে শেষে। তোমাকে বয়ে নেয়া আমার আর রবিনের কম্মো নয়।'

'তাহলে?'

'তুমি আর রবিন প্লেনেই থেকে যাও। আমি একাই যেতে পারবো।'

'আরে দূর, কি যে বলো। রবিনকে তুমি নিয়ে যাও। আমি একলা থাকতে পারবো। প্লেনে বসে বসে জাস্ট ঘুমাবো,' হাসলো মুসা, তাতে যন্ত্রণার ছাপ।

'না, আমি একা যাবো। প্লেনটাকে দেখার জন্যেও এখানে কাউকে থাকা দরকার। জখমী পা নিয়ে তুমি কিছু করতে পারবে না। রবিনকে থাকতেই হচ্ছে।'

'প্লেনটাকে দেখার আর কি আছে? আফ্রিকান জানোয়ারে প্লেন খায় না।'

'খায়। পোচাররা এসে দামী যন্ত্রপাতি নষ্ট করতে পারে। হাতি আর গণ্ডারও কৌতূহলী হতে পারে। কিছুদিন আগে মারকিনস-এ একটা বিমান পড়েছিলো, মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছিলো ওটাকে গণ্ডারে। হায়েনারা আরও এক কাটি বাড়া। রবার ওদের খুব প্রিয়, টায়ার খেয়ে ফেলে। আহত না হলেও বিমানটাকে বাঁচানোর জন্যে কাউকে এখানে থাকতে হতো।'

'ঠিক আছে,' বললো অনিচ্ছুক মুসা। 'থাকবো। হারামি পা-টা ব্যথা পাওয়ার আর সময় পেলো না।'

'বেশিক্ষণ থাকতে হবে না তোমাদের,' কম্পাস, ম্যাপ আর ওয়াটার বটল গুছিয়ে নিতে নিতে হাসলো কিশোর। 'মাত্র তো পঞ্চাশ মাইল। সকাল-বিকাল তোমার সঙ্গে দৌড়ে দৌড়ে আজকাল ভালোই হাঁটতে পারি আমি, জানো। বারো-চোদ্দ ঘন্টার বেশি লাগবে না। তারপর ট্রাক নিয়ে ফিরে আসতে, ধরো, আরও দুই ঘন্টা। আমার বিশ্বাস, ওই ষোল ঘন্টা বেঁচে থাকতে পারবে তোমরা।'

'কিন্তু, বিকেল হয়ে গেল,' রবিন বললো। 'রাতে হাঁটবে? কাল সকালে গেলে হতো না?'

'রাতে হাঁটাই সুবিধে, আবহাওয়া ঠাণ্ডা। চাঁদও থাকবে। ভেবো না, আমি ঠিকই চলে যাবো। হুঁশিয়ার থেকো। সকালে ফিরে আসছি আমি।'

কাউকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে ঘুরলো কিশোর। পেছন থেকে ডেকে বললো মুসা, 'এই শোনো, ভালো দেখে কয়েকটা স্যাণ্ডউইচ নিয়ে এসো। সারারাত হায়েনা তাড়িয়ে সকালে আমি নিজেও হায়েনা হয়ে যাবো।'

হেসে উঠলো তিনজনেই।

বেলা ডুবতেই ঠাণ্ডা হয়ে এলো গরম বাতাস। বন থেকে বেরিয়ে আসতে লাগলো নিশাচর জানোয়ারেরা। প্রায় সবাই আগ্রহ দেখালো প্লেনটার প্রতি। পায়ে পায়ে এসে জমা হতে লাগলো—কেউ বসলো, কেউ দাঁড়িয়ে রইলো, চারপাশ ঘিরে। ভীতু যারা, দূরে রইলো। সাহসীরা এগিয়ে এলো। বেশি সাহসী কেউ কেউ এসে বিমানে উঠে সঙ্গী হতে চাইলো দুই গোয়েন্দার। ডানায় চড়ে বসলো বেবুনের দল। জানালায় নাক ঠেকিয়ে কৌতূহলী দৃষ্টিতে ভেতরে উঁকিঝুঁকি মারতে লাগলো ভারভেট মাংকি।

চারটে গণ্ডার এসে হাজির হলো প্লেনের কাছে। বার কয়েক নাক টানলো, ঘোঁৎ ঘোঁৎ করলো। তেড়ে এলো একটা। কিন্তু আজব 'জানোয়ারটাকে' নীরব দেখে মাঝপথে থেমে আবার ফিরে গেল সঙ্গীদের কাছে। 'ব্যাটাকে' নিয়ে কি করা যায়, সেই আলোচনা চালালো যেন।

গণ্ডারগুলো যেন বোঝাতে চাইছে, তাদের এলাকায় থাকার কোনো অধিকার নেই এই আজব জন্তুটার। মাথা নুইয়ে শিং বাগিয়ে তেড়ে এলো একসঙ্গে। স্টর্কটাকে ধ্বংস করার জন্যে একটা গণ্ডারই যথেষ্ট। সেই জায়গায় চারটে মিলে কি করতে পারবে, ভাবতেই গলা শুকিয়ে গেল দুই গোয়েন্দার। আতঙ্কিত চোখে তাকিয়ে রইলো ওরা। প্লেন থেকে লাফিয়ে নেমে দৌড় দেয়ার ইচ্ছেটা দমন করলো অনেক কষ্টে।

গণ্ডারগুলো কাছে এসে গেছে, এই সময় সংবিৎ ফিরলো যেন মুসার। উঠে দাঁড়িয়ে হাত তালি দিয়ে জোরে জোরে চেঁচাতে শুরু করলো। রবিনও যোগ দিলো তার সঙ্গে।

থমকে গেল চার-দানব। ওরা বোধহয় মনে করলো, আজব জীবটাই বিচিত্র চিৎকার করছে। দ্বিধায় পড়ে গেল। একে আক্রমণ করা উচিত হবে কিনা ঠিক করতে পারছে না। ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে ফিরে গেল আগের জায়গায়, আবার আলোচনা শুরু করলো।

গণ্ডারের মতো বদমেজাজী জানোয়ার আলোচনা করে একবার যে একমত হয়েছিলো, সে-ই বেশি। দ্বিতীয়বার আর পারলো না। তর্কাতর্কি করে নিজেরাই

লেগে গেল শেষে। প্রচণ্ড মারপিটের পর একেকটা চলে গেল একেক দিকে। হাঁপ ছাড়লো রবিন আর মুসা।

তীক্ষ্ণ নজর রেখে বিমানটার চারপাশে ঘুরছে গ্যাজেল হরিণ আর জিরাফ। ইমপালা হরিণেরা পেয়ে গেছে আরেক মজা। লাফিয়ে প্লেনের কে কতো ওপর দিয়ে যেতে পারে সেই প্রতিযোগিতায় মেতেছে যেন। আড়াল থেকে বিদ্যুতের মতো বেরিয়ে এসে একটা হরিণের ওপর পড়লো চিতাবাঘ, মট করে ঘাড় ভেঙে ফেললো বেচারা প্রাণীটার।

সাঁঝের বাতাস চিরে দিলো একটা তীক্ষ্ণ চিৎকার। মুসা ভাবলো, মদ্দা হাতি। কিন্তু রবিনের জানা আছে ওটা কিসের ডাক, চিড়িয়াখানায় শুনেছে। ওরকম চিৎকার করতে পারে কোন প্রাণী, সেটা বইয়েও পড়েছে। গেছো হাইর‍্যাক্স। মাত্র ফুটখানেক লম্বা একটা নিশাচর জীব।

টুপ করে ঝরে গেল যেন গোধূলির শেষ আলোটুকুও। চাঁদ উঠতে সময় লাগবে। ঘন ছায়া নেমেছে বন, পাহাড় আর তৃণভূমি জুড়ে। কিলিমানজারোর তুষারে ছাওয়া চূড়াটাও ঢাকা পড়েছে অন্ধকারে। নীলচে-কালো আকাশের পটভূমিকায় এখন মস্ত এক ম্লান-ধূসর ছায়ামাত্র ওটা।

একুশ

ঘুমানোর চেষ্টা করলো মুসা।

দূর! বিরক্ত হয়ে হাল ছেড়ে দিলো। এরকম একটা সীটে ঘুমানো যায় নাকি? পা বাঁকা করে রাখতে হচ্ছে, তাতে ব্যথা আরও বেশি করছে। জানোয়ারের ভয় ইতিমধ্যে অনেকখানি কেটে গেছে। প্লেনের ডানার নিচে নরম ঘাসের বিছানা যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছে। আমন্ত্রণ উপেক্ষা করতে পারলো না গোয়েন্দা-সহকারী। ঝুঁকি নিয়েও নামলো নিচে।

ডানার নিচে ছায়া ছায়া অন্ধকার, উজ্জ্বল জ্যোৎস্নার মাঝে বেশ প্রকট। ওখানেই গিয়ে শুয়ে পড়লো সে। আশা করলো, এখানে চোখ পড়বে না হাতি, গণ্ডার কিংবা মোষের।

তবে আরেকটা মহা-বিপজ্জনক প্রাণীর কথা বেমালুম ভুলে গেল সে। সর্বনেশে পিঁপড়ে।

খবর পৌছে গেল পিপিলিকার রাজত্বে। দল বেঁধে পিলপিল করে এসে হাজির হলো ওরা। আরামেই ঘুমিয়ে ছিলো মুসা, কুট করে কামড় লাগলো আহত পায়ে। পাত্তা দিলো না। ভাবলো, যন্ত্রণার পরিবর্তন ঘটছে। হাতে-পায়ে-গলায়-মুখে একসাথে আরও কয়েকটা কামড় লাগতেই চোখ মেললো। দেরি করে ফেলেছে

বেশ।

বুকের ওপর ঢলে পড়েছিলো রবিনের মাথা। চিৎকার শুনে ঝট করে সোজা হলো। দেখলো, উন্মাদ-নৃত্য জুড়েছে মুসা আমান। শরীরের যেখানে-সেখানে চাপড় মারছে, টেনে ছিঁড়ে খুলে ফেলার চেষ্টা করছে গায়ের কাপড়। গলা ফাটিয়ে চেঁচাচ্ছে।

আমাজানের জঙ্গলের কথা মনে পড়ে গেল রবিনের। কিছু কিছু মানুষ আছে, যাদের গায়ের গন্ধ আকৃষ্ট করে পোকামাকড়কে, এসে চড়াও হয়। ওখানেও মুসার ওপর চড়াও হয়েছিলো পিঁপড়েরা, এমনকি রক্তচোষা বাদুড় এসেও আগে ধরেছিলো মুসাকেই।

কিভাবে বন্ধুকে সাহায্য করবে, সিদ্ধান্ত নেয়ার আগেই মুসার সাহায্যে এগিয়ে এলো একটা বিচিত্র প্রাণী। পরোক্ষে মুসাকে সাহায্য করলেও, প্রত্যক্ষভাবে আসলে নিজেকেই সাহায্য করতে এসেছে। অনেক নাম ওটারঃ কেউ বলে অ্যান্ট-ঈটার, কেউ অ্যান্ট-বীয়ার, কেউ বা ডাকে আর্ ড্ ভার্ ক্, অর্থাৎ গর্তের শুয়োর বলে। তবে অ্যান্ট-ঈটার বা পিঁপড়েখেকো নামটাই বেশি মানানসই, কারণ, পিঁপড়ে খাওয়ার সুযোগ মিললে আর ছেড়ে কথা কয় না। সারা দিন গর্তে পড়ে ঘুমায়, রাতে বেরোয় খাবারের সন্ধানে। মুসার ভাগ্য ভালো, কাছাকাছিই ছিলো ওটা।

এগিয়ে এলো চার ফুট লম্বা জীবটা। ওজন একশো চল্লিশ পাউণ্ড মতো হবে। ভালুকের মতো থাবা, তাতে বড় বড় বাঁকা নখ—উইয়ের ঢিবি চেরার জন্যে, ক্যাঙারুর মতো লেজ, গাধার কান আর শুয়োরের মুখ নিয়ে ওকাপির চেয়ে কম বিচিত্র নয় জনাব আর্ ড্ ভার্ ক্।

কাছে এসেই কাজে লেগে গেল পিঁপড়েখেকো। আঠারো ইঞ্চি লম্বা জিভ বের করে প্রায় ছেঁকে নিতে শুরু করলো যেন পিঁপড়ের দলকে। আমাজানের জঙ্গলে এরকম জীবকে রীতিমতো লড়াই করে পরাজিত করেছে মুসা, এদের সম্পর্কে ভয় নেই তার। সোজা গিয়ে দাঁড়ালো ওটার জিভের কাছে। মাটি থেকে তোলার চেয়ে চামড়া থেকে নেয়া সহজ, কাজেই, সহজ কাজটাই আগে করলো ওটা। জামাকাপড় সব খুলে একেবারে দিগম্বর হয়ে গেছে সহকারী গোয়েন্দা, রবিনকে আরেক দিকে তাকিয়ে থাকার অনুরোধ করছে বার বার।

কিন্তু চাঁদের আলো নির্লজ্জের মতো তাকিয়ে আছে মুসার কালো নগ্ন দেহের দিকে, মুহূর্তের জন্যে মুখ ফেরানোর নাম নেই। নিজের দিকে চেয়ে নিজেরই হাসি পেলো মুসার। পিঁপড়ে নেই আর শরীরে। হেসে উঠলো জোরে। প্লেনে বসা রবিনও হেসে ফেললো। এতোক্ষণ উত্তেজনায় খেয়ালই করেনি পিঁপড়েখেকো, মানুষের শরীর চাটছে। হাসির শব্দে যেন হুঁশ হলো। বড় বড় কয়েক লাফ দিয়ে সরে গেল দূরে, সন্দিগ্ধ চোখে মুসার দিকে আরেকবার তাকিয়ে আবার পিঁপড়ে

খাওয়ায় মন দিলো।

'কাপড়চোপড় পরে ফেলো এবার,' আরেক দিকে চেয়েই বললো রবিন। 'পরে জলদি উঠে এসো। যতদূর জানি, অ্যান্ট-বীয়ার সিংহের খুব প্রিয় খাবার।'

মুহূর্ত দেরি করলো না মুসা। প্যান্টটা পায়ে গলিয়ে কোমরে বোতাম আঁটলো। বাকি কাপড়গুলো হাতে নিয়ে উঠে এলো ওপরে। আহত পা নিয়ে কষ্ট হলো, তাকে সাহায্য করলো রবিন।

ঠিকই, পিঁপড়েখেকোর গন্ধ পেয়ে কোথা থেকে এসে হাজির হয়েছে একটা সিংহ। চাঁদের আলোয় বিশাল ছায়া পড়েছে ওটার। লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লো। তারপর ছায়ার মতোই নীরবে হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে আসতে লাগলো, থেমে গেল প্লেনের ডানার নিচে, ছায়ায়। ধক ধক করে জ্বলছে চোখ, দৃষ্টি পিঁপড়েখেকোটার ওপর নিবদ্ধ।

সিংহ তার খাবার ধরবে, এটাই স্বাভাবিক। অন্য সময় হলে হয়তো কিছু বলতো না মুসা, কিন্তু এখন পিঁপড়েখেকোটা ঋণী করে ফেলেছে তাকে। ঋণ শোধ করার জন্যে নিজের বিপদ উপেক্ষা করলো সে, হাত তালি দিয়ে জোরে চেঁচিয়ে সাবধান করে দিলো জীবটাকে।

রাগে গর্জে উঠলো সিংহটা। ছুটে গেল শিকারের দিকে।

ততোক্ষণে হুঁশিয়ার হয়ে গেছে পিঁপড়েখেকো। অবিশ্বাস্য একটা কাণ্ড করলো। ছুটে পালানোর চেষ্টাও করলো না, করলেও সিংহের সঙ্গে দৌড়ে পারতো না। দুই থাবা দিয়ে নরম মাটি খুঁড়তে শুরু করলো। এতো দ্রুত, যেন আশ্চর্য ক্ষমতাশালী একটা খোঁড়ার-যন্ত্র। সিংহটা ওটার কাছে গিয়ে পৌঁছার আগেই খোঁড়া হয়ে গেল গর্ত, ভেতরে ঢুকে পড়লো জানোয়ারটা। মুসা আর রবিন দেখতে পাচ্ছে না এখন, অনুমান করলো নিশ্চয় খোঁড়ার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে ওটা। লম্বা সুড়ঙ্গ বানিয়ে চলে যাবে সিংহের নাগালের বাইরে।

ওদের অনুমান ঠিক। গর্তের মুখে নাক নামিয়ে শুঁকলো সিংহ। আরেকবার গর্জন করলো। নিরাশ হয়ে সরে এলো গর্তের কাছ থেকে। মুখ তুলে তাকালো প্লেনের দিকে।

দুরুদুরু করে উঠলো দুই গোয়েন্দার বুক। এবার? কি ভাবছে ব্যাটা?

ভালো ঘুম কি আর হয়? দু'বার হায়েনার ডাকে চমকে জেগে উঠলো দু'জনে। প্লেনের নিচে এসে হুটোপুটি লাগিয়েছে ওগুলো। টায়ার কামড়াতে শুরু করেছে। চেঁচিয়ে, বিমানের গায়ে বাড়ি দিয়ে ওগুলোকে তাড়ালো ওরা। আবার তন্দ্রায় ঢলে পড়লো।

ঘুমের ঘোরে দুঃস্বপ্ন দেখলো মুসা। ভয়ানক এক গণ্ডার আক্রমণ করেছে

তাকে। মাটিতে পেড়ে ফেলে শিং দিয়ে গুঁতোচ্ছে বুকে। চিৎকার করে জেগে উঠলো সে। দেখলো, সকাল হয়ে গেছে। বুকে হাত রেখে ঠেলছে কিশোর। ষোল ঘন্টার আগেই ফিরে এসেছে।

'আরে, এই মিয়া, ওঠো,' হেসে বললো কিশোর। 'কতো ঘুমাবে? এই নাও তোমার স্যাণ্ডউইচ।'

রবিন আগেই জেগেছে।

মুসা দেখলো, প্লেনের পেছনে গাড়ির মিছিল। ওয়ারডন টমসন এসেছেন, সঙ্গে এসেছে তাঁর তিনজন রেঞ্জার আর তিরিশজন মাসাই।

'খেয়ে নাও জলদি,' দুই বন্ধুকে তাড়া দিলো কিশোর। 'পোচার ব্যাটাদের ধরতে যেতে হবে।'

'প্লেনটা?' স্যাণ্ডউইচ চিবাতে চিবাতে জিজ্ঞেস করলো মুসা। 'কিভাবে নেয়া হবে?'

'নাইরোবিতে মেকানিকের জন্যে তার পাঠিয়ে দিয়েছেন ওয়ারডেন। প্লেনের ভাবনা এখন আর আমাদের নয়। গিয়ে গর্তগুলো খুঁজে বের করতে হবে।'

বিশ মাইল দূরে সেই বাওবাব ওরফে জলহস্তী গাছের জঙ্গল। আগের দিনের মতোই নির্জন। হঠাৎ, চাপা একটা শব্দ শোনা গেল। মানুষের কণ্ঠস্বর। মনে হলো, মাটির নিচ থেকে আসছে।

ঝোপঝাড়ের মাঝে ফাঁকা জায়গাগুলো দেখে মাসাইরা জানালো, হাতি ধরার ফাঁদই তৈরি করা হয়েছে ওসব জায়গায়। ওপরের ডালপাতা সরানো বিপজ্জনক। পোচাররা নিচে থেকে থাকলে, সরানোমাত্র তীর ছুঁড়তে পারে।

উবু হয়ে শুয়ে সাবধানে হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে গেল কয়েকজন মাসাই। একটা গর্তের কিনারে পৌঁছে আলগা ডালপাতা ধরে টেনে সরালো, ফাঁক করে উঁকি দিলো নিচে। কোনো তীর কিংবা বল্লম ছুটে এলো না ওদের দিকে। সামনে মুখ বাড়িয়ে আরও ভালোমতো দেখলো। কেউ নেই।

এক এক করে সবগুলো গর্ত দেখা হলো। কোনোটাতেই মানুষ নেই। কিন্তু মানুষের কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে।

ভয় পেয়ে গেল মুসা। 'খাইছে! ভূত নাকিরে বাবা!' নির্ভীক বৈমানিকের এহেন উক্তি শুনে না হেসে পারলেন না ওয়ারডেন।

কিশোর নীরব। কান পেতে শুনছে। কোনো সন্দেহ নেই, মানুষেরই কণ্ঠস্বর। গর্তে নেই, ঝোপের ভেতরে নেই, আসছে কোথা থেকে তাহলে? চিন্তিত ভঙ্গিতে বাওবাব গাছগুলোর দিকে তাকালো সে। ওগুলোতেও ঘন ডালপাতা নেই, যার আড়ালে লুকিয়ে থাকতে পারে মানুষ। তাহলে?

পায়ে পায়ে একটা গাছের কাছে চলে এলো গোয়েন্দাপ্রধান। থেমে গেল কথা

বলা, আর কোনো শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। মাসাইরাও নীরব। একটা মোটা গাছের চারপাশে ঘুরে এলো সে, নেই কেউ।

হতাশ হয়ে প্রায় হাল ছেড়ে দিতে যাচ্ছিলো কিশোর, হঠাৎ পেছনে ফিসফিস করে বলে উঠলো রবিন, 'কিশোর, এক মিনিট। আমার মনে হয় ব্যাটারা এখানেই আছে।'

'আছে? কোথায়?'

কোনো রহস্যের সমাধান করে ফেলতে পারলে, সেটা রবিন। আর মুসা না বুঝলে তাদের দিকে যেভাবে চেয়ে মিটিমিটি হাসে কিশোর, এখন ঠিক তা-ই করলো রবিন। নাটকীয় ভঙ্গিতে বললো, 'অনুমান করো।'

তার চেয়ে কেউ বেশি জানুক, এটা সইতে পারে না কিশোর। ভোঁতা কণ্ঠে বললো, 'জানি না…না না, দাঁড়াও!' তুড়ি বাজালো। 'বুঝেছি!'

'কোথায়?' মুসাও এসে দাঁড়িয়েছে পাশে।

'এই গাছগুলোর কাণ্ড কতো মোটা দেখেছো?' মুসাকে বললো রবিন। 'পঞ্চাশ ফুটের বেশি উঁচু হয় না বাওবাব, কিন্তু পাশে বাড়ে। বেঁটে, অসম্ভব মোটা মানুষের মতো কুৎসিত হয়ে যায়। পেটের বেড় হয়ে যায় ষাট ফুটের ওপর। এই যে, এগুলোর বেড় আরও বেশি মনে হচ্ছে। নিশ্চয় অনেক পুরনো, পাঁচশো থেকে হাজার বছরের, সে-জন্যেই এতো মোটা। মজা হলো, পাশে যতো বাড়তে থাকে, পুরনো বাওবাবের ভেতরটা ততো ফোঁপরা হয়ে যায়। একেবারে খালি কোঠা। বিশজন মানুষ অনায়াসে থাকতে পারে।'

'কিন্তু ঢুকলো কোন দিক দিয়ে?' গাছগুলোর ওপরে-নিচে আবার তাকালো মুসা। 'ফোকর-টোকর তো দেখছি না।'

'ডাল যেখান থেকে ছড়িয়েছে।'

'ঢোকার মুখ ওখানে?' হাত তুলে একটা গাছ দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলো মুসা। গাছটার ডালগুলো ছড়িয়েছে মাটির বারো ফুট ওপর থেকে। রবিন জবাব দেয়ার আগেই হাত নেড়ে মুগামবিকে ডাকলো সে।

কাছে এসে দাঁড়ালো বিশালদেহী মাসাই। তার কাঁধে চড়ে একটা ডাল ধরে ফেললো মুসা। পায়ের ব্যথা অনেক কম, নাড়াচাড়া করলেও আর তেমন লাগে না এখন। ডালে উঠে লম্বা হয়ে শুয়ে ক্রল করে নিচের দিকে এগোলো। সবগুলো ডাল যেখানে মিলিত হয়েছে, ঠিক তার মাঝখানে বড় একটা কালো ফোকর। ওটার কাছে এসে সাবধানে মুখ বাড়ালো সে, নিচে উঁকি দিলো।

আশা করেছিলো, তীর ছুটে আসবে একঝাঁক।

কিছুই এলো না। ভেতরের বিষণ্ন ছায়ায় দেখা গেল অনেকগুলো কালো মুখ। ওপর দিকে চেয়ে আছে। দুষ্টুমি করতে গিয়ে ধরা পড়লে বাচ্চা ছেলে যেরকম

করে, অনেকটা সেরকম ভাবসাব।

সরে এসে আবার মুগামবির কাঁধে নামলো মুসা। সেখান থেকে মাটিতে।

গাছের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসতে লাগলো পোচাররা। টপাটপ লাফিয়ে পড়লো মাটিতে। খালি হাতে বেরিয়েছে, অস্ত্রশস্ত্র সব রেখে এসেছে গাছের ভেতরে। আক্রমণের ইচ্ছে নেই, পালানোরও নয়। সম্পূর্ণ পরাজিত, আত্মসমর্পণ করতে বেরিয়েছে।

এগিয়ে এলেন ওয়ারডেন। বললেন, 'মুগামবি, জিজ্ঞেস কর তো, এতো ভালো হয়ে গেল কেন হঠাৎ?'

সোয়াহিলি ভাষায় জিজ্ঞেস করলো মুগামবি। জবাব দিলো নেতা গোছের একজন পোচার। ইংরেজিতে অনুবাদ করে শোনালো সেটা মাসাইদের সর্দার, 'ওরা আর লড়াই করতে চায় না। একাজ ছেড়ে দিতে চায়।'

'কেন?'

'অনেক কষ্ট করে ফাঁদ পাতে ওরা, কুঁড়ে বানায়। বার বার আমরা গিয়ে নষ্ট করে দিই। গত কিছু দিন ধরে একটা ফাঁদ থেকেও কিছু আয় করতে পারেনি ওরা। খালি সিলভারের ধমক-ধামক শুনেছে। ওদের সঙ্গে তার চুক্তি, মাল দেবে, টাকা নেবে। দিতেও পারেনি, নিতেও পারেনি। অহেতুক গাধার খাটনি খাটতে আর রাজি নয় ওরা।'

নেতা গোছের লোকটা অন্যান্য গাছের দিকে চেয়ে জোরে জোরে কি বললো।

আরও কয়েকটা গাছ থেকে বেরিয়ে এলো অনেক পোচার। একটা গাছ থেকে কয়েকজন পোচারের সঙ্গে বেরোলো স্বয়ং লঙ জন সিলভার, কিন্তু সে আত্মসমর্পণ করবে না। দুই হাতে দুই রিভলভার, দাড়িতে ময়লা, রাগে দুদিকে সরে গেছে ঠোঁটের দুই কোণ। চেঁচিয়ে লড়াই করার আদেশ দিলো পোচারদের। ওরা কথা শুনছে না দেখে লাফাতে শুরু করলো। রিভলভার তুলে গুলি ছুঁড়লো আকাশে। তারপরও শুনছে না দেখে কেউ বাধা দেয়ার আগেই গুলি করে মেরে ফেললো একটা লোককে। বদ্ধ উন্মাদ হয়ে গেছে যেন।

এবার নড়লো পোচাররা। তবে মাসাইদের বিরুদ্ধে নয়। চারপাশ থেকে ঘিরে ফেললো তাদের নিজের নেতাকেই। গুলিতে আহত হলো আরও কয়েকজন। পরোয়া করলো না। সিলভারের হাত থেকে রিভলভার কেড়ে নিয়ে কিল-ঘুসি মারতে মারতে মাটিতে শুইয়ে ফেললো তাকে। টমসন আর মাসাইরা বাধা না দিলে মেরেই ফেলতো লোকটাকে।

'ওঠো,' আদেশ দিলেন ওয়ারডেন।

কম্পিত পায়ে উঠে দাঁড়ালো সিলভার। বিড়বিড় করে গাল দিচ্ছে। চোখ লাল। তিন গোয়েন্দার দিকে চোখ পড়তে আর সামলাতে পারলো না নিজেকে।

ঘুসি পাকিয়ে ছুটে এলো ওদের দিকে।

খানিক দূরে বসে উৎসুক চোখে গণ্ডগোল দেখছিলো সিমবা। নিজে কিছু করার সুযোগ পাচ্ছিলো না। এইবার পেলো। বাপ-দাদার অনুকরণে হিংস্র গর্জন ছেড়ে ধেয়ে এলো তীব্র গতিতে। সিলভারের বুকে দু'পা তুলে দিয়ে গলায় কামড় বসাতে গেল।

কিছুই বললো না মুগামবি। কিন্তু বাধা দিতে ছুটে গেল মুসা। 'না না, সিমবা! সি-ম-বাআ!' ওটার কলার চেপে ধরে টান দিলো।

ভীষণ রেগেছে আজ বুনো কুকুরের বংশধর। ঝাড়া দিয়ে মুসার হাত থেকে বেল্ট ছাড়িয়ে নিয়ে আবার কামড় বসাতে গেল। ধস্তাধস্তি করতে করতে মাটিতে চিত হয়ে পড়লো সিলভার। লম্বা হয়ে তার গায়ের ওপর সেঁটে এলো সিমবা, শিকারকে পাকড়াও করে খুন করার আগে যেভাবে চেপে ধরে বুনো কুকুর, তেমনিভাবে।

এই বার এসে হাত লাগালো মুগামবি। অনেক কসরত করে টেনে সরালো কুকুরটাকে। এখন আদরে কাজ হবে না, জানা আছে তার, ঠাস ঠাস করে কষে দুই থাপ্পড় লাগালো সিমবার মাথার দুই পাশে। শান্ত হলো কুকুরটা।

কোনোমতে উঠে বসলো সিলভার। টলতে টলতে উঠে দাঁড়ালো। ডলছে আহত জায়গাগুলো।

'তোমার খেল খতম, সিলভার,' ওয়ারডেন বললেন। 'অনেক জ্বালান জ্বালিয়েছো···ভাগ্যিস তিন গোয়েন্দাকে পেয়েছিলাম···'

'আমার কচুটাও করতে পারবে না তুমি,' বুড়ো আঙুল দেখালো সিলভার, তেজ কমেনি। 'অনেক টাকা আছে আমার। টাকার জোরে পার পেয়ে যাবো।'

'আদালতে গিয়ে জজ নির্মল পাণ্ডাকে বলো সেকথা। তোমার ছাল ছাড়িয়ে নেবে। জানোয়ার তো মেরেছোই, সেই সঙ্গে মানুষ খুনও করেছো। তোমাকে ফাঁসিতে ঝোলাবে নির্মল। দুনিয়ার সব টাকা দিলেও তার হাত থেকে নিস্তার পাবে না।'

জোরে হেসে উঠলো সিলভার।

তার হাসি শুনে আবার রেগে গেল সিমবা। ঝাঁড়া দিয়ে বেল্ট ছাড়িয়ে নিয়ে ছুটে যেতে চাইলো। কিন্তু মুগামবির সঙ্গে পারলো না।

'এখনও পাণ্ডা পাণ্ডা করছেন, স্যার?' গম্ভীর হয়ে ওয়ারডেনকে বললো কিশোর। 'কথা শুনেও কিছু বুঝতে পারছেন না? অনেকখানি বদলে ফেলেছে বটে চেহারা, কণ্ঠস্বর কিন্তু পুরোপুরি ঢাকতে পারেনি। এতোদিনের বন্ধু আপনার, এতো ঘনিষ্ঠতা, তা-ও চিনতে পারছেন না?'

অবাক হয়ে কিশোরের দিকে তাকালেন টমসন। 'কি বলছো?'

'ঠিকই বলছি,' সিলভার কিছু বুঝে ওঠার আগেই হাত বাড়িয়ে তার দাড়ি ধরে হ্যাঁচকা টান মারলো কিশোর। খুলে এলো নকল দাড়ি বেরিয়ে পড়লো জজ নির্মল পাণ্ডার মুখ।

স্তব্ধ হয়ে গেলেন ওয়ারডেন। কথা সরছে না মুখে।

হা হা করে হাসলো জজ। 'কেন ঘাবড়াইনি বুঝতে পারছো তো? আমি জজ, আদালতে আমার বিচার আমিই করবো। তুমি একটা আস্ত গাধা, ওয়ারডেন। হাহ্ হাহ্ হা!'

হাত-পা বাঁধা অবস্থায় নাইরোবি পুলিশের হাতে পড়ার পরই শুধু নরম হলো জজ নির্মল পাণ্ডা, যখন দেখলো ঘুষ খায় না, এমন লোকও আছে। কোটি কোটি টাকার লোভ দেখিয়েও যাকে দিয়ে অন্যায় করানো যায় না। ওখানকার জজকে কিনতে পারলো না সে। যাবজ্জীবন জেল হয়ে গেল। অন্যায়ভাবে অর্জিত তার সমস্ত টাকা, সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে দান করে দেয়া হলো আফ্রিকান ওয়াইল্ডলাইফ সোসাইটিকে।

নিজের মুখে সব কুকর্মের কথা স্বীকার করেছে নির্মল পাণ্ডা, তবু যেন বিশ্বাস করতে পারছেন না ওয়ারডেন টমসন। ওরকম নিরীহ চেহারার হাসিখুশি একজন 'ভদ্রলোক' এতো খারাপ হতে পারে, কল্পনাই করেননি তিনি কোনোদিন। সব চেয়ে বেশি দুঃখ পেয়েছেন, একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধুকে হারিয়েছেন বলে, অন্তত তিনি নিজে জজ নির্মল পাণ্ডাকে বন্ধু হিসেবেই নিয়েছিলেন।

ফেরার দিন এলো তিন গোয়েন্দার। স্টর্ক বিমানটা ঠিক হয়ে গেছে। তাতে চড়েই নাইরোবি যাবে ওরা। সেখান থেকে জেট লাইনারে চড়ে আমেরিকায়।

ওয়ারডেন টমসন যেতে পারবেন না ওদের সঙ্গে। জরুরী কাজ আছে। তাছাড়া জায়গাও নাকি হবে না বিমানটায়। কেন হবে না, বুঝতে পারলো না তিন গোয়েন্দা। প্রশ্ন করেও কোনো জবাব মিললো না, শুধু রহস্যময় ভঙ্গিতে হাসলেন তিনি।

নির্দিষ্ট দিনে বিমানটায় উঠলো তিন গোয়েন্দা, পাইলটের সীটে অবশ্যই মুসা আমান। উঠেই অবাক হয়ে গেল। তার পেছনের সীটের পায়ের কাছে আরাম করে শুয়ে ছিলো বুনো কুকুরের বংশধর, সাড়া পেয়ে লাফিয়ে উঠে বসলো সীটে। মৃদু 'গাঁউ' করে উঠলো।

'আরি, তুই!' চেঁচিয়ে উঠলো মুসা। 'তুই এখানে কি করছিস? যা যা, নাম। আমরা চলে যাচ্ছি।'

'না, ও-ও যাচ্ছে তোমাদের সঙ্গে,' নিচে থেকে হাসিমুখে বললেন ওয়ারডেন। পাশে দাঁড়ানো মুগামবির দিকে একবার চেয়ে আবার ফিরলেন কিশোর বৈমানিকের

দিকে। 'আমার তরফ থেকে, মুগামবির তরফ থেকে, আফ্রিকান ওয়াইল্ডলাইফ সোসাইটির তরফ থেকে তিন গোয়েন্দাকে উপহার। অনেক করেছো তোমরা। উপহার দিয়ে সেই ঋণ শোধ করা যাবে না। এই সামান্য উপহারটুকু নিলে আমরা সবাই খুশি হবো।'

'কিন্তু মুগামবির প্রিয়...,' বলতে গিয়ে বাধা পেলো মুসা।

'ও-ই তো প্রস্তাবটা দিয়েছিলো আমাকে,' বললেন টমসন। 'তুমি যে সিমবাকে ভালোবেসে ফেলেছো, তোমাকেও কুকুরটা ভালোবেসেছে, এটা ওর নজর এড়ায়নি...'

'কিন্তু, তবু...'

'তুমি ওটা নাও, মুসা,' এবার বাধা দিলো মুগামবি। 'না নিলেই বরং আমি দুঃখ পাবো। বুনো কুকুর অনেক আছে এখানে, দরকার হলে সহজেই আরেকটা বাচ্চা আমি জোগাড় করে নিতে পারবো। জন্তুজানোয়ারের প্রতি তোমার ভালোবাসায় আমি মুগ্ধ। তোমার মতো ছেলেরা যখন জন্মাচ্ছে, বুঝতে পারছি, সুদিন আসছে আফ্রিকার,' চোখ মুছলো মাসাই-সর্দার। 'কিশোর, রবিন, তোমরাও জন্মভূমির গর্ব। শুধু যার যার দেশেরই নও, সারা দুনিয়ার গর্ব তোমরা। দোয়া করি, বখে যাওয়া কিশোররা তোমাদের দেখে শিখুক, ভালো হোক, মানুষ হোক...'

তাজ্জব হয়ে গেল তিন গোয়েন্দা, অশিক্ষিত এক মাসাইয়ের দেশপ্রেম দেখে, নীতিবাক্য শুনে, অনেক বড় বড় শিক্ষিত মানুষও এভাবে গুছিয়ে বলতে পারবে না।

নরম কথা শুনলে মুসার চোখে পানি এসে যায়। এখনও তার ব্যতিক্রম হলো না। 'আপনার জন্যেও গর্ববোধ করছি আমি, মিস্টার মুগামবি। থ্যাঙ্ক ইউ।'

হাসি ফুটলো মাসাইয়ের কালো চোখের তারায়। সিমবার দিকে তাকালো, 'যা বাবা, ভালো থাকিস। বন্ধুর কথা শুনবি সব সময়, গোলমাল করবি না।'

রবিন, কিশোরও মুগামবি আর টমসনকে ধন্যবাদ দিলো।

'এই চিঠিটা নিয়ে যাও,' কিশোরের হাতে একটা খাম দিলেন ওয়ারডেন। 'এয়ারপোর্ট ম্যানেজারকে দিও। স্টর্কটাকে ফেরত পাঠানোর ব্যবস্থা তিনি করবেন।...আর হ্যাঁ, আমার ব্যানডা সব সময় তোমাদের জন্যে খোলা রইলো। সুযোগ পেলেই বেড়াতে চলে এসো। যাও, উইশ ইউ গুড লাক।'

সিমবাও যেন ভাবলো, 'গুড লাক' জানানো দরকার নতুন মনিবকে। পেছন থেকে মুসার গাল, কান চেটে দিলো। হেসে উঠলো সবাই। তরল হয়ে গেল পরিবেশ। হাসিমুখে স্টর্কের এঞ্জিন স্টার্ট দিলো মুসা আমান।
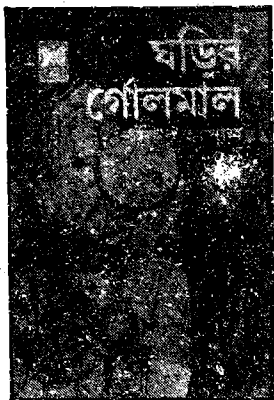
-ঃ শেষ ঃ-

ঘড়ির গোলমাল

প্রথম প্রকাশঃ মার্চ, ১৯৯০

ঘড়ির ভেতর থেকে শোনা গেল চিৎকার!

আতঙ্কিত কণ্ঠ। শুরু হলো মৃদু ভাবে, জোড়ালো হতে লাগলো, তীক্ষ্ণ থেকে তীক্ষ্ণতর। কিশোর পাশার মনে হলো, কানের পর্দা ছিঁড়ে যাবে। শিরশির করে উঠলো শিড়দাঁড়া। জীবনে যতো ভয়ঙ্কর চিৎকার শুনেছে সে, তার মধ্যে এটা অন্যতম।

পুরনো চেহারার একটা ঘড়ি, বিদ্যুতে চলে। চলে কিনা সেটা দেখার জন্যেই প্লাগটা সকেটে ঢুকিয়েছিলো, সঙ্গে সঙ্গে ওই চিৎকার। কর্ড ধরে একটানে প্লাগটা বের করে আনলো সকেট থেকে। থেমে গেল চিৎকার। হাঁপ ছাড়লো সে।

পেছনে শোনা গেল পদশব্দ। পাশা স্যালভিজ ইয়ার্ডে কাজ করছিলো তার দুই সহকারী, মুসা আমান আর রবিন মিলফোর্ড, পাশে এসে যেন ব্রেক কষে দাঁড়ালো।

'কি হয়েছে?' জিজ্ঞেস করলো রবিন। 'কে চিৎকার করলো?'

'খাইছে!' মুসা বললো, উদ্বিগ্ন। 'কিশোর, ব্যথাট্যাথা পেয়েছো?'

মাথা নাড়লো গোয়েন্দাপ্রধান। 'শোনো, অস্বাভাবিক শব্দ।' বলেই আবার প্লাগ ঢোকালো সকেটে। বাতাসে ছড়িয়ে পড়লো রক্ত-পানি-করা চিৎকার। টেনে প্লাগ খুলে চিৎকার থামালো।

'মারছে!' অস্বস্তিতে হাত নাড়লো মুসা। 'একে শুধু অস্বাভাবিক বলছো কেন? নিশ্চয় ঘড়ির ভূত!'

'হ্যাঁ, সত্যি অস্বাভাবিক,' গোয়েন্দাপ্রধানের সঙ্গে একমত হলো রবিন। 'ঘড়ি এরকম চিৎকার করে বলে শুনিনি। দেখো, সুইচ টিপলে পাখা গজিয়ে না উড়ে চলে যায়।'

হাতে নিয়ে উল্টেপাল্টে ঘড়িটা দেখছে কিশোর। সন্তুষ্ট হয়ে বললো, 'হুঁম্‌ম্‌!'

'হুঁম্‌ কি? এই, হুঁম্‌ কী?' ভুরু নাচালো মুসা।

'অ্যালার্মের লিভারটা অন করা,' জানালো কিশোর। 'দেখি অফ করে আবার প্লাগ ঢুকিয়ে...,' বলতে বলতেই প্লাগটা সকেটে ঢোকালো। আর চিৎকার করলো না। মৃদু গুঞ্জন তুলে চলতে শুরু করলো ঘড়ি।

'দেখি এবার অন করে,' আবার বললো সে। লিভার অন করতেই চিৎকার করে উঠলো ঘড়ি, তাড়াতাড়ি অফ করে দিলো কিশোর। 'যাক, একটা রহস্যের সমাধান হলো। ঘন্টা বাজানোর বদলে চিৎকার করে এই ঘড়িটা।'

'রহস্য দেখলে কোথায় এতে?' জিজ্ঞেস করলো মুসা।

'ঘড়ি চিৎকার করে, এটা রহস্য নয়?' কিশোরের হয়ে জবাব দিলো রবিন। 'আর কেন চিৎকার করে সেটাও বোঝা গেল।'

'কেন নয়,' সুধরে দিলো কিশোর। 'বলো, কখন। অ্যালার্ম লিবার সেট করলে চিৎকার করে। কেন করে, সেই রহস্যের সমাধান এখনও হয়নি।'

'তারমানে, তদন্ত?' মুসা বললো। 'একটা ঘড়ির ব্যাপারে কি তদন্ত করবে? প্রশ্ন করবে ওটাকে? জবাব না দিলে চাপাচাপি করবে?'

মুসার কথায় কান দিলো না কিশোর। বললো, 'কেন চিৎকার করে বোঝার চেষ্টা করবো। নিশ্চয় কোনো কারণ আছে।'

আগ্রহী মনে হলো রবিনকে। 'কিন্তু শুরুটা করবে কিভাবে?'

জবাব না দিয়ে টুলকিটের জন্যে হাত বাড়ালো কিশোর। তিন গোয়েন্দার ব্যক্তিগত ওয়ার্কশপে রয়েছে ওরা। কিট থেকে একটা স্ক্রু-ড্রাইভার বের করে ঘড়ির পেছনের কভার খুলতে শুরু করলো। খুলে, এক নজর দেখেই আবার বললো, 'হুঁম্‌ম্‌!'

'আবার হুঁম্‌ম্‌ কেন?' মুসার প্রশ্ন।

স্ক্রু-ড্রাইভারের মাথা নেড়ে ঘড়ির ভেতরে দেখালো কিশোর। যন্ত্রপাতির মাঝে বসানো আধুলির সমান গোল একটা ডিস্ক। 'চিৎকারের এটাই কারণ। অ্যালার্ম বেলের বদলে এটা বসিয়ে দিয়েছে কেউ।'

'কেন?' রবিনের প্রশ্ন।

'সেটাই তো রহস্য। জানতে হবে কে করেছে কাজটা।'

'কিভাবে?' মুসা জিজ্ঞেস করলো।

'দূর,' নিরাশ ভঙ্গিতে হাত নাড়লো কিশোর। 'গোয়েন্দা কোনোদিনই হতে পারবে না তুমি। ভাবতেই জানো না ঠিকমতো...'

'দাঁড়াও দাঁড়াও, বলি। প্রথমে জানতে হবে ঘড়িটা কোত্থেকে এসেছে।'

'হ্যাঁ, এই তো মাথা খুলছে।'

'পুরনো জঞ্জালের মাঝে পেয়েছো। তারমানে রাশেদ আংকেল ওটা কিনে এনেছেন। হয়তো বলতে পারবেন কোন্ জায়গা থেকে কিনেছেন।'

'রোজই তো কতো মাল কেনেন,' রবিনের কণ্ঠে সন্দেহ। 'তাঁর মনে আছে?'

'থাকতে পারে। জঞ্জালের মাঝে পেয়েছি, কথাটা ঠিক নয়। আধ ঘন্টা আগে,

একটা বাক্স আমার হাতে দিয়েছে চাচা। পেয়েছি ওটার ভেতরেই। আরও কি কি যেন আছে। দেখি।'

বেঞ্চের ওপর রাখা একটা শক্ত মলাটের বাক্স। ভেতর থেকে বেরোলো একটা স্টাফ করা পেঁচা—পালক বেশির ভাগই খসে গেছে। পুরনো একটা কাপড় ঝাড়ার ব্রাশ পাওয়া গেল। আরও আছে একটা ভাঙা টেবিল-ল্যাম্পের অর্ধেকটা, চলটা ওঠা একটা ফুলদানী, দুটো বইয়ের দুমড়ানো প্লাস্টিক-কভার, আর আরও কিছু টুকিটাকি। প্রায় সবগুলো জিনিসই বাতিল, ব্যবহারের অযোগ্য।

'দেখে তো মনে হয় ঘর পরিষ্কার করেছিলো কেউ,' কিশোর বলল। 'বাক্সে ভরে ডাস্টবিনে ফেলে দিয়েছিলো। বেকার বা ভিখিরি কেউ সেটা কুড়িয়ে নিয়ে বিক্রি করেছে পুরনো মালের দোকানে, সেখান থেকে কিনে এনেছে চাচা।'

'কেন যে কিনলেন?' অবাক লাগছে মুসার। 'ঘড়িটা ছাড়া তো আর সবই বেকার। কোনো কাজে লাগবে না। তবে ঘড়ি বটে একখান। ভাবো একবার, সকালে অ্যালার্মের বদলে ওই ভূতুরে চিৎকার শুনে জেগে ওঠার কথা...'

'হুম্‌ম্‌!' তৃতীয়বার বললো কিশোর। 'ভালো না। খুব খারাপ। কাউকে ভয় পাওয়ানোর জন্যে যথেষ্ট। হার্টের অবস্থা খারাপ হলে মারাও যেতে পারে। মেরে ফেলতে চাইলে শুধু তার বেডরুমে ঘড়িটা রেখে দিয়ে এলেই হলো। সহজেই খুন, অথচ কেউ কিছু সন্দেহ করতে পারবে না।'

'বলো কি!' ভুরু কোঁচকালো রবিন। 'ওরকম কিছুই হলো নাকি?'

'জানি না। শুধু সম্ভাবনার কথা বলছি। চলো, চাচাকে জিজ্ঞেস করি ঘড়ি কোথায় পেলো?'

ওয়ার্কশপ থেকে বেরিয়ে অফিসের দিকে চললো ওরা। কাজে ব্যস্ত ইয়ার্ডের দুই কর্মচারী বোরিস আর রোভার। কয়েকটা পুরনো আসবাবপত্র দেখছিলেন রাশেদ পাশা, ডাক শুনে ফিরে তাকালেন। ছেলেদের মুখ দেখেই বুঝলেন, প্রশ্ন আছে। মিটিমিটি হেসে, মস্ত গোঁফে তা দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'তারপর, ত্রিরত্ন, ব্যাপার কি? খুব উত্তেজিত মনে হচ্ছে।'

'চাচা,' ঘড়িটা দেখালো কিশোর। 'এটা কোত্থেকে আনলে? একটু আগে যে বাক্সটা দিলে, তার মধ্যে পেয়েছি।'

'পেয়েছি মাগনা। ফাও বলতে পারো। এটার মধ্যে ছিলো,' পুরনো একটা আলমারি দেখালেন তিনি। 'হলিউডের এক পুরনো মালের দোকান থেকে কিনেছি।'

'কোন দোকান? মালিকের নাম?'

'নাম, ডেরিক। অনেক মাল কিনেছি আজ। এক ট্রাক দিয়ে গেছে। আরও এক ট্রাক নিয়ে আসবে। তখন জিজ্ঞেস করো...'

এই সময় গেটে শোনা গেল এঞ্জিনের শব্দ। ফিরে তাকাল চারজনে। একটা পিকআপ ঢুকছে। বলে উঠলেন রাশেদ পাশা, 'ওই যে, এসে গেছে।'

আসবাবপত্রের স্তূপের কাছে এসে থামলো গাড়ি। ওভারঅল পরা একজন লোক নেমে এলো, খোঁচা খোঁচা দাড়ি।

'এসেছো,' বললেন রাশেদ পাশা।

'হ্যাঁ,' কাছে এসে দাঁড়ালো ডেরিক। 'নিয়ে এলাম তোমার সব মাল। কপাল ভালো তোমার, রাশেদু, ভালো মাল পেয়েছো, ধরতে গেলে বিনে পয়সায়। কিছু কিছু তো একেবারে নতুন...'

'আরে দূর!' বাতাসে থাবা মারলেন রাশেদ পাশা। 'বাড়িয়ে বলার স্বভাব তোমার গেল না। এগুলো নতুন? আমি বলে কিনছি...যাক, যা আছে, আছে। কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। দশ ডলার দেবো সবগুলোর জন্যে। ও, কে?'

'দাও। কি আর করা? টাকার খুব ঠেকা, নইলে একশোর কমে দিতাম না...'

'মেরি আছে অফিসে। ওর কাছ থেকে টাকা নিয়ে যাও। ও, এক মিনিট, এ-আমার ভাতিজা, কিশোর। তোমাকে কি জানি জিজ্ঞেস করবে।'

'জলদি বলে ফেলো, খোকা। তাড়া আছে আমার,' বললো ডেরিক।

'একটা বাক্সের কথা জানতে চাই,' কিশোর বললো। 'আপনার দেয়া এই আলমারিতে পাওয়া গেছে। বাক্সের ভেতরে এই ঘড়িটা ছিলো। কার কাছ থেকে কিনেছেন, মনে আছে?'

'ঘড়ি?' বিষণ্ণ হাসি হাসলো ডেরিক। 'হপ্তায় ওরকম কয়েক ডজন ঘড়ি বেচতে আনে আমার কাছে। বেশির ভাগই অচল। কিনি, কোনোটা বিক্রি হয়, কোনোটা ফেলে দিই।'

'একটা বাক্সের মধ্যে ছিলো এটা,' রবিন বললো। 'ভেতরে একটা স্টাফ করা পেঁচাও...'

'ও, হ্যাঁ, মনে পড়েছে। স্টাফ করা পেঁচা খুব কমই পাই, সেজন্যেই মনে আছে। কিন্তু কার কাছ থেকে যেন কিনলাম...কার কাছ...নাহ্, সরি, মনে করতে পারছি না,' মাথা নাড়লো ডেরিক। 'প্রায় হপ্তা দুই আগের কথা। মনে নেই। হাজার লোকে বেচতে আনে, ক'জনের কথা মনে রাখবো?'

দুই

'ব্যস, গেল এই কেস,' মুসা বললো। 'ঘড়িটা কোথেকে এসেছে তা-ই জানি না, রহস্যের কিনারা করবো কি? কিশোর?'

ওয়ার্কশপে ফিরে এসেছে তিনজনে। অন্যমনস্ক হয়ে বাক্সটা নাড়াচাড়া করছিলো কিশোর, মুখ ফিরিয়ে তাকালো, 'উঁ?...মাঝে মাঝে বাক্সের গায়ে ঠিকানা লেখা থাকে। কোথায় পাঠানো হবে, সেই ঠিকানা।'

'আমার কাছে মুদী দোকানের বাক্সের মতো লাগছে,' রবিন বললো।

'আমার কাছেও। কিন্তু ঠিকানা লেখা নেই।'

'সেই কথাই তো বলছি,' আগের কথার খেই ধরলো মুসা। 'এই কেসের সমাধান আমাদের সাধ্যের বাইরে। ...রবিন, কি ওটা?'

ছাপার মেশিনটার নিচ থেকে চার কোনা এক টুকরো কাগজ তুলে নিয়েছে রবিন। কিশোরকে দেখিয়ে বললো, 'বাক্স থেকে পড়লো।'

'মুদী দোকানের মালের লিস্টি হবে হয়তো,' মুসা বললো।

কিন্তু তার কথা ঠিক নয়। কাগজটায় লেখা রয়েছেঃ

ডীয়ার মিলার

আস্ক রোবিড

আস্ক বারকেন

আস্ক জেলড়া

দেন অ্যাক্ট! দ্য রেজাল্ট উইল সারপ্রাইজ ঈভন্ ইউ।

জোরে জোরে পড়লো রবিন। চেঁচিয়ে উঠলো, 'আশ্চর্য! কি মানে এর?'

'প্রিয় মিলার,' বিড়বিড় করে বললো কিশোর। 'রোবিডকে জিজ্ঞেস করো। বারকেনকে জিজ্ঞেস করো। জেলডাকে জিজ্ঞেস করো। তারপর কাজে নামো। ফলাফল দেখে তুমি পর্যন্ত চমকে যাবে।'

'আরে সে তো বুঝলাম। কিন্তু এসব কথার মানে কি?'

'আরেকটা রহস্য। নিশ্চয় চেঁচানো ঘড়ির সঙ্গে যোগাযোগ আছে।'

'ঘড়ির সঙ্গে যোগাযোগ, কিভাবে বুঝলে?'

'তাই তো হওয়ার কথা। দুই ইঞ্চি বাই চার ইঞ্চি মাপে কাটা হয়েছে। পেছনে দেখো। এই যে এখানটায়। কি দেখছো?'

'শুকনো আঠা।'

'রাইট। তারমানে এই কাগজটা কোনো কিছুতে সাঁটানো ছিলো।' ঘড়িটা উল্টে তলা দেখালো সে। 'এই যে দেখো, এখানেও শুকনো আঠা। আগেই লক্ষ্য করেছি। মাপ দেখে আন্দাজ করতে কষ্ট হয় না, এই কাগজ এখানেই লাগানো ছিলো। বেশি নাড়াচাড়ায় খুলে পড়ে গেছে।'

'কিন্তু ওরকম একটা কাগজ কেন ওখানে সাঁটতে যাবে?' মুসার জিজ্ঞাসা। কে? ওই লেখার মানেই বা কি? মাথামুণ্ডু তো কিছুই বোঝা যায় না।'

'এতো সহজেই বোঝা গেলে কোনো রহস্যই আর রহস্য থাকতো না।'

'তা ঠিক। লাভের মধ্যে শুধু আরও একটা রহস্য যোগ হলো, ঘড়ির চেঁচানোর সঙ্গে। আমরা যে অন্ধকারে ছিলাম, সেখানেই রয়েছি। বরং বলা যায় অন্ধকার আরও ঘন হয়েছে। এখন কি করবে?'

'চেঁছে ঘড়ির নিচ থেকে আঠা তুলবো। কি যেন খোদাই করা রয়েছে। বেশি ছোট, বুঝতে পারছি না। ম্যাগনিফাইং গ্লাস দরকার। চলো, হেডকোয়ার্টারে চলো।'

দুই সুড়ঙ্গ দিয়ে হেডকোয়ার্টারে ঢুকলো ওরা। ডেস্কের ওপাশে বসে মাথার ওপরের উজ্জ্বল আলো জ্বেলে দিলো কিশোর। ড্রয়ার থেকে ম্যাগনিফাইং গ্লাস আর ছুরি বের করে কাজে লাগলো। ছুরি দিয়ে চেঁছে আঠা তুলে, খোদাই করা লেখা পড়ে মাথা ঝোঁকালো নীরবে। রবিনের দিকে ঠেলে দিলো ঘড়ি আর গ্লাস।

রবিনও পড়লো। খুব খুদে অক্ষরে লেখা রয়েছেঃ ডি. টেমপার। মুখ তুলে জিজ্ঞেস করলো, 'মানে কি? কারও নাম?'

'বলছি এখুনি,' বলে, মুসার দিকে তাকালো কিশোর। 'মুসা, টেলিফোন গাইডটা দেখি তো, প্লীজ।'

পাতা উল্টে চললো গোয়েন্দাপ্রধান। কিছুক্ষণ পর চেঁচিয়ে উঠলো খুশি হয়ে, 'এই দেখো!'

দুই সহকারীও দেখলো, ছোট একটা বিজ্ঞাপন, ঘড়ির দোকানের। ইংরেজিতে লেখা রয়েছেঃ ডি. টেমপার—ঘড়ি মেরামতকারী—অস্বাভাবিক কাজ আমাদের বিশেষত্ব। নিচে হলিউডের ঠিকানা আর টেলিফোন নম্বর লেখা।

'মেকাররা অনেক সময়,' বললো কিশোর। 'ঘড়িতে সাঙ্কেতিক চিহ্ন বা নম্বর বসিয়ে দেয়। যাতে পরে আবার চিনতে পারে ওটা কার কাজ। ধোপার দোকানে কাপড়ে যেমন চিহ্ন দেয়। এক ধাপ এগোলাম আমরা। অ্যালার্ম সিসটেম খুলে ডিস্ক কে ঢুকিয়েছে ঘড়িতে, এটা জানলাম। পরের ধাপ, গিয়ে মিস্টার টেমপারকে জিজ্ঞেস করা, কে ঘড়িটা মেরামত করতে দিয়েছিল।'

তিন

হলিউড বুলভারের একটা গলির ভেতর পাওয়া গেল টেমপারের দোকানটা। গলিতে ঢোকে না বিশাল রোলস রয়েস, যেটাতে চড়ে এসেছে তিন গোয়েন্দা। গাড়িটা গলির মুখে রেখে হেঁটে রওনা হলো ওরা। ড্রাইভিং সিটে বসে রইলো ইংরেজ শোফার হ্যানসন।

ধুলোয় ধূসর জানালার কাচের ওপাশে নামটা কোনোমতে পড়া যায়ঃ ডি, টেমপার—ঘড়ি মেরামতকারী। সোনালি রঙের অক্ষরগুলো মলিন হয়ে এসেছে। ভেতরের তাকে অসংখ্য ঘড়ি, ছোট-বড় নতুন-পুরনো, নানা ধরনের নানা আকারের। দরজায় এসে দাঁড়ালো তিন গোয়েন্দা। ওরা ভেতরে পা রাখতেই লম্বা একটা ঘড়ির নিচের কাঠের দরজা খুলে গেল, মার্চ করে বেরোলো এক খেলনা সৈনিক, বিউগল বাজিয়ে সময় ঘোষণা করে আবার ঢুকে গেল তার কুঠুরিতে। বন্ধ হয়ে গেল দরজা।

'খাইছে!' তাজ্জব হয়ে গেছে মুসা। 'কী কাণ্ড! তবে, চিৎকারের চেয়ে অনেক ভালো।'

'চলো, মিস্টার টেমপারের সঙ্গে কথা বলা যায় কিনা দেখি।' বললো কিশোর।

ঘরে অনেক ঘড়ি, অনেক রকম আওয়াজ। মনে হচ্ছে হাজার হাজার মৌমাছি গুঞ্জন তুলেছে একসঙ্গে।

চামড়ার অ্যাপ্রন পরা ছোটখাটো একজন মানুষ এগিয়ে এলো। চকচকে কালো চোখের ওপরে সাদা ভুরু, যেন দুটো ছোট ছোট ঝোপ। খুশি খুশি কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো, 'কি চাই? ঘড়ি মেরামত করাবে? নাকি অদ্ভুত কিছু লাগাবে?'

'না, স্যার,' বিনীত কণ্ঠে জবাব দিলো কিশোর, 'ওসব নয়। একটা ঘড়ির ব্যাপারে জানতে এসেছি।' ব্যাগ খুলে ওটা বের করে কাউন্টারের ওপর দিয়ে ঠেলে দিলো সে।

ঘড়িটা দেখলো টেমপার। 'হুঁ, বেশ পুরনো। দাম কম। এটা মেরামত করে পোষাবে না।'

'মেরামত করতে আনিনি, স্যার। কিছু মনে না করলে প্লাগটা লাগান।'

শ্রাগ করলো ছোট মানুষটা। সকেটে প্লাগ ঢোকালো। সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে উঠলো ঘড়ি। তাড়াহুড়ো করে লিভারটা অফ করে দিলো মেকানিক। ঘড়িটা হাতে নিয়ে পেছনে দেখলো সে। হাসলো। 'হুঁ, চিনতে পারছি। আমিই লাগিয়েছিলাম। খুব জটিল কাজ।'

'আপনিই তাহলে চিৎকার শিখিয়েছেন এটাকে?' মুসা বললো।

'হ্যাঁ। আমি বলেই পেরেছি···যাকগে, কি জন্যে এসেছো? খারাপ হয়ে গেছে?'

'না, স্যার,' কিশোর বললো। 'রাস্তায় কুড়িয়ে পেয়েছি এটা। কার জিনিস জানি না। নিচে আপনার নাম দেখলাম। ভাবলাম, মালিকের নাম বলতে পারবেন। তাঁর জিনিস তাঁকে ফিরিয়ে দেবো।'

'তাই?' দ্বিধা করছে টেমপার। 'কাস্টোমারের নাম গোপন রাখি আমরা। অনেক সময়...'

'মুফতে দেয়ার ইচ্ছে আমাদের নেই, স্যার,' বাধা দিয়ে বললো রবিন। 'এরকম একটা জিনিস, নিশ্চয় খুব শখের। ফিরিয়ে দিলে হয়তো পুরস্কার দেবেন তিনি...'

হাত তুললো টেমপার। 'বুঝতে পেরেছি। ঠিকই বলেছো, জিনিসটা তার শখের। ঘড়ি জোগাড়ের হবি আছে লোকটার। নাম ক্লক।'

'ক্লক!' একই সঙ্গে বলে উঠলো রবিন আর মুসা।

'নাম তো তা-ই বলেছে লোকটা। আমার বিশ্বাস, ওটা তার বানানো নাম। আসল নাম অন্য কিছু। নানা রকম ঘড়ি এনেছে আমার কাছে, বিচিত্র সব ফরমায়েশ। কোনোটাকে দিয়ে চিৎকার করাতে হবে, কোনোটাকে হাসাতে হবে, কোনোটাকে...'

'আমার কাছেও আসল নাম মনে হচ্ছে না,' টেমপারকে থামিয়ে দিলো কিশোর। 'নিশ্চয় ঠিকানা দিয়েছে? বলবেন, প্লীজ? আমরা নিজেই নিয়ে যাবো তাঁর কাছে।'

'ঠিকানা তো দেয়নি, শুধু ফোন নম্বর।' বলে, কাউন্টারের নিচের একটা তাক থেকে মোটা এক রেকর্ড বুক বের করলো টেমপার। পাতা উল্টে এক জায়গায় এসে থামলো। 'হ্যাঁ, লিখে নাও। এইচ. ক্লক। নম্বর...'

নোটবুক বের করে দ্রুত নম্বরটা লিখে নিলো রবিন।

'চলবে তো এতে?' টেমপার জিজ্ঞেস করলো। 'অবশ্য আর কিছু জানতেও পারবো না। জানি না। আর হ্যাঁ, ঘড়ির কাজ করাতে হলে নিশ্চিন্তে চলে এসো। যে-কোনো রকম কাজ।...তোমাদের আর কিছু বলার না থাকলে...কিছু মনে কোরো না, আমার কাজ পড়ে আছে...'

'নিশ্চয়, নিশ্চয়,' বললো কিশোর। 'অনেক ধন্যবাদ, স্যার, আপনাকে।'

দোকান থেকে বেরিয়ে সঙ্গীদের বললো, 'আরেক ধাপ এগোনো গেল। এবার ফোন করতে হবে জনাব ঘড়িকে। মোড়ের বুদ থেকেই করি, চলো।'

'কি বলবে?' কিশোর বুদে ঢোকার আগে জিজ্ঞেস করলো মুসা।

'ঠিকানা জোগাড়ের চেষ্টা করবো,' বলে ঢুকে গেল কিশোর।

মুসা আর রবিনও ঢুকলো। জায়গা কম, গাদাগাদি করে দাঁড়ালো ওরা। মুদ্রা ফেলে ডায়াল করলো কিশোর। ওপাশে রিসিভার তুললো এক মহিলা।

'গুড আফটারনুন,' গলাটাকে ভারি করে তুললো কিশোর, বড়দের মতো। দক্ষ অভিনেতা সে, ভালো পারে এসব কাজ। 'টেলিফোন কোম্পানি থেকে বলছি।

ক্রসড সার্কিটের গোলমাল হচ্ছে।'

'ক্রসড সার্কিট? বুঝলাম না,' জবাব এলো।

'আমরা কমপ্লেন পেয়েছি, আপনার সেকশনে নাকি বেশি বেশি রঙ নাম্বার হচ্ছে। দয়া করে যদি ঠিকানাটা বলেন? সার্কিট চেক করবো।'

'ঠিকানা? নিশ্চয়। একশো বারো ফ্র্যাঙ্কলিন স্ট্রীট। কিন্তু বুঝতে পারছি না...' কথা শেষ করতে পারলো না মহিলা, তার আগেই শোনা গেল চিৎকার। বয়স্ক কোনো মানুষ আতঙ্কে চেঁচিয়ে উঠেছে। যেন জবাই করার জন্যে চেপে ধরা হয়েছে তাকে।

হাত থেকে রিসিভার ছেড়ে দিলো কিশোর।

চার

'হ্যানসন, এই ব্লকটাই মনে হচ্ছে,' বললো কিশোর। 'আস্তে চালান। নম্বরগুলো দেখি।'

ফ্র্যাঙ্কলিন স্ট্রীট ধরে ধীরে চালালো হ্যানসন। পুরনো এলাকা। এককালের বিশাল বাড়িগুলো এখন মলিন, বিবর্ণ।

'ওই যে!' চেঁচিয়ে বললো মুসা।

বাঁকের কাছে গাড়ি রাখলো হ্যানসন। নেমে হেঁটে চললো তিন গোয়েন্দা। আশপাশে চোখ রাখছে। নির্জন লাগছে বাড়িটা, জানালার সমস্ত পর্দা টানা। সামনের দরজায় ছোট্ট সিঁড়ি, মাত্র দুটো ধাপ। তাতে উঠে ঘন্টা বাজালো কিশোর।

অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো। আবার বেল বাজাতে যাবে, এই সময় নড়ে উঠলো দরজা। সামান্য ফাঁক হলো। উঁকি দিলো এক মহিলার মুখ। বয়েস তেমন বেশি না। তবে খুব ক্লান্ত আর বিষণ্ণ দেখাচ্ছে।

'মাপ করবেন,' কিশোর বললো। 'মিস্টার ক্লকের সঙ্গে দেখা হবে?'

'মিস্টার ক্লক?' অবাক হলো যেন মহিলা। 'ওই নামে তো এখানে কেউ থাকে না।'

'নামটা বোধহয় আসল নয়, সেজন্যে চিনতে পারছেন না। তিনি ঘড়ি পছন্দ করেন। এখানেই তো থাকার কথা। কিংবা হয়তো থাকতেন।'

'ঘড়ি? তুমি মনে হয় মিস্টার রোজারের কথা বলছো। কিন্তু মিস্টার রোজার...'

'বলো না! বলো না!' পেছন থেকে চেঁচিয়ে উঠলো একটা ছেলে। বয়েস ওদেরই মতো হবে। কালো চুল। মহিলাকে ঠেলে সরিয়ে পাশে এসে দাঁড়ালো। ভ্রূকুটি করলো গোয়েন্দাদের দিকে চেয়ে। 'কথাই বলো না ওদের সাথে, মা। দরজা

লাগিয়ে দাও। কেন এসেছে ওরা এখানে?'

'শোন, টিম,' মহিলা বললো। 'এভাবে কথা বলতে নেই। ছেলেগুলোকে তো ভালোই মনে হচ্ছে আমার। মিস্টার রোজারের খোঁজ করতে এসেছে, দোষটা কোথায়?'

'একটু আগে কি মিস্টার রোজারই চিৎকার করেছিলেন?' ফস করে জিজ্ঞেস করে বসলো কিশোর।

কড়া চোখে তাকালো টিম। 'হ্যাঁ, সে-ই!' গলা চড়ালো সে। 'ওটা তার মরণ চিৎকার, মরে যাচ্ছিলো! যাও, ভাগো এখন। আমাদের অনেক কাজ। ওকে মাটি দিতে হবে।'

দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দিলো ছেলেটা।

'শুনলে তো?' চাপা গলায় বললো মুসা। 'লোকটাকে খুন করে এখন কবর দেয়ার কথা ভাবছে।'

'পুলিশ ডাকা দরকার,' বললো রবিন।

'আরও পরে,' কিশোর বললো। 'আগে সব কথা জেনে নিই। বাড়িতে ঢোকার চেষ্টা করি।'

'দরজা ভেঙে ঢুকবে নাকি?'

'না,' মাথা নাড়লো গোয়েন্দাপ্রধান। 'ওরাই ঢুকতে দেবে। জানালা দিয়ে উঁকি মারছে টিম...' বেলপুশ টিপে ধরলো সে। ধরেই রাখলো, যতোক্ষণ না ঝটকা দিয়ে আবার খুললো দরজা।

'ভাগতে বললাম না!' গর্জে উঠলো টিম। 'কেন বিরক্ত করছো?'

'বিরক্ত করলাম কোথায়?' নিরীহ কণ্ঠে বললো কিশোর। 'আমরা একটা রহেস্যের তদন্ত করছি, তোমাদের সাহায্য দরকার। এই যে আমাদের কার্ড।'

কার্ডটা পড়ে ভুরু কোঁচকালো টিম।

ব্যাগ থেকে চেঁচানো ঘড়িটা বের করে টিমের হাতে দিলো কিশোর।

কৌতূহল ফুটলো টিমের চোখে। 'এটাতে রহস্যের কি আছে?'

'ইলেকট্রিক সকেট কোথায়? কি রহস্য, দেখাচ্ছি,' বলতে বলতেই ঘরের ভেতর পা ঢুকিয়ে দিলো কিশোর। বাধা দিতে গিয়েও কি ভেবে সরে দাঁড়ালো টিম। একটা হলঘর, আবছা অন্ধকার। একপাশ থেকে দোতলায় সিঁড়ি উঠে গেছে। আরেক পাশে বিরাট এক গ্র্যাণ্ডফাদার ক্লক, টিক-টিক কানে না এলে চোখে পড়তো না গোয়েন্দাদের। ঘড়ির পাশে টেবিলে টেলিফোন।

রহস্যময় মিস্টার রোজারের লাশ খুঁজছে মুসা আর রবিনের চোখ, দেখতে পেলো না। ঘড়িটার পাশে দেয়ালে সুইচবোর্ডে সকেট দেখে, সেদিকে এগোলো

কিশোর। হাতের ঘড়িটা টেবিলে রেখে, সকেটে প্লাগ ঢুকিয়ে লিভার অন করতেই চেঁচিয়ে উঠলো ঘড়ি। প্রতিধ্বনিত হলো বদ্ধ ঘরে। রোম খাড়া হয়ে গেল দুই সহকারী গোয়েন্দার।

'শুনলে তো,' প্লাগটা খুলে নিয়ে বললো কিশোর। 'রহস্যময় না ঘড়িটা?'

'না,' মোটেই অবাক হয়নি টিম। 'যে কেউ ওরকম চেঁচানি ঢোকাতে পারে ঘড়িতে। দাঁড়াও, দেখাচ্ছি।' গ্র্যাণ্ডফাদার ক্লকের পেছন থেকে একটা কর্ড বের করে প্লাগটা সকেটে ঢোকালো সে। শোনা গেল মোটা গলায় আতঙ্কিত চিৎকার, জবাই করার জন্যে চেপে ধরা হয়েছে যেন।

কিশোরের সন্দেহ নেই, ফোনে এই চিৎকারই শুনেছে।

দ্রুত ঘরে এসে ঢুকলো মহিলা। 'টিম, দোহাই লাগে তোর…' ছেলেদের ওপর চোখ পড়তে থেমে গেল। 'ও, ঢুকতে দিয়েছে তোমাদেরকে? টিম, হঠাৎ মত বদলালি যে?'

'ওরাও একটা চেঁচানো ঘড়ি নিয়ে এসেছে,' সকেট থেকে প্লাগ খুলে ফেলেছে টিম। 'ছোট। আগে আর দেখিনি। আমার বিশ্বাস ওটা মিস্টার রোজারেরই।' টেবিলে রাখা ঘড়িটা মা-কে দেখালো সে।

মাথা নাড়লো টিমের মা। 'আমিও দেখিনি। কি করে বুঝলি, ওটা মিস্টার রোজারের?'

'বুঝেছি। ঘড়িতে চিৎকার ঢোকানোর বুদ্ধি আর কারও মাথায় আসবে না।'

'না, তা আসবে না,' আবার মাথা নাড়লো মহিলা। 'ছেলেগুলো পেলো কোথায় এটা, বলেছে?'

'জিজ্ঞেস করিনি এখনও। পরিচয় দিয়েছে, ওরা গোয়েন্দা। ভাবছি, কথা বলবো ওদের সঙ্গে। মিস্টার রোজারের ঘড়িটা নিয়ে এসেছে যখন।' একটা দরজা খুলে ইশারায় ভেতরে যেতে বললো তিন গোয়েন্দাকে।

বড় একটা লাইব্রেরি। এক পাশের দেয়ালে ঝোলানো ফ্রেমে বাঁধা কয়েকটা তৈলচিত্র। আরেক পাশে বিরাট এক আয়না। বাকি দু'দিকের দেয়ালে অসংখ্য তাক, বইয়ে ঠাসা। র‍্যাক আছে অনেকগুলো।

লাইব্রেরিতে বই থাকবে, সেটা স্বাভাবিক, কিন্তু ওদেরকে অবাক করলো ঘড়ি। ছোট বড় নানারকম ঘড়ি রয়েছে ঘরটায়। মেঝেতে, টেবিলে, তাকে, দেয়ালে। নতুন-পুরনো, ছোট-বড়, দামী-কমদামী। তবে সব ক'টারই একটা বিশেষত্ব আছে, সবগুলোই বিদ্যুতে চলে। ফলে টিকটিক আওয়াজ না করে তুলেছে গুঞ্জন, যেন শত শত মৌমাছিকে কয়েদ করে রাখা হয়েছে ঘরটায়।

'কি দেখছো?' গোয়েন্দাদের তাজ্জব করে দিয়ে আনন্দ পাচ্ছে টিম। 'শুনলে

আরও অবাক হবে, এর প্রত্যেকটা ঘড়িই চেঁচাতে পারে।'

পাঁচ

চিৎকারে ভরে গেল যেন ঘরটা।

শুরু হলো শিশুর তীক্ষ্ণ চিৎকার দিয়ে। তারপর গর্জাতে লাগলো একজন রেগে যাওয়া মানুষ। তৃতীয়টা বন্য, হিংস্র চিতাবাঘ। তারপর চারদিক থেকে শুরু হলো চিৎকার, কান্না, ফোঁপানি, গর্জানি, ফোঁসফোঁসানি—মানুষেরও, জানোয়ারেরও।

লম্বা একটা কাউচে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে বসেছে তিন গোয়েন্দা। শিউরে উঠছে ক্ষণে ক্ষণে।

একটা ডেস্কের ওপাশে বসে একের পর এক সুইচ টিপছে টিম। দাঁত বের করে হাসছে মেহমানদের দিকে চেয়ে। অবশেষে সব কটা সুইচ অফ করে দিলো সে। নীরব হয়ে গেল ঘর।

'জীবনে কখনও শুনেছো এরকম?' বললো টিম।

'ঘরটা কি সাউণ্ডপ্রুফ?' প্রশ্ন এড়িয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলো কিশোর 'এতোক্ষণে নিশ্চয় পুলিশকে ফোন করে দিয়েছে প্রতিবেশীরা।'

'অবশ্যই সাউণ্ডপ্রুফ। এটা মিস্টার রোজারের চেঁচানো ঘর। রাতে এখানে বসে চেঁচানো শুনতেন···মানে···' থেমে গেল টিম।

'মিস্টার রোজারের কিছু হয়েছে?'

'কেন? হবে কেন?'

ওই যে, শুনতেন বললে। তারপর থেমে গেলে। ভাবলাম, কিছু হয়েছে।'

'চলে গেছে, ব্যস। তাতে তোমাদের কি?'

'আমাদের? না, কিছু না। চেঁচানো ঘড়ি দিয়ে শুরু করেছিলাম। ঢুকলাম চেঁচানো ঘরে। এখন শুনছি এর মালিকই গায়েব। রহস্য জটিল হচ্ছে আরকি। আচ্ছা, বলতে পারো, কেন এতোগুলো ঘড়িতে চিৎকার ঢোকালেন তিনি? কিছু তো বুঝতে পারছি না।'

'এতে আর বোঝাবুঝির কি আছে?' বলে উঠলো মুসা। 'মাথায় ছিট ছিলো আরকি। নইলে রাতে একলা বসে চেঁচামেচি শোনে কেউ?'

'এটা তাঁর হবি ছিলো,' মিস্টার রোজারের পক্ষ নিলো টিম। 'অনেক হবিরই কোনো অর্থ থাকে না। তোমাদেরটার আছে?'

'আছে,' মাথা কাত করলো কিশোর। 'রহস্যের সমাধান করা। এই যেমন, ঘড়ি-রহস্যের সমাধান করতে এসেছি।'

'আমি তো বলছি, এতে কোনো রহস্য নেই।'

'তাহলে ওরকম আচরণ করছো কেন? এমন ভাব করছো, যেন দুনিয়ার সবাইকে ঘৃণা করো। খুলে বলছো না কেন? সব শুনলে হয়তো সাহায্য করতে পারবো।'

'তোমরা কি সাহায্য করবে?' জ্বলে উঠলো টিম। 'আর আমিও অদ্ভুত আচরণ করছি না। তোমরাই বরং করছো। এখন যাও, ওঠো। একা থাকতে দাও আমাকে।' প্রায় ছুটে গিয়ে দরজা খুলে দিলো সে। 'পথ দেখো! আর কখনও আসবে না…আরি!'

দরজায় দেখা দিলো একজন লোক। তেমন লম্বা নয়, কিন্তু কাঁধ খুব চওড়া। তিন গোয়েন্দার দিকে চেয়ে ভুরু কোঁচকালো। 'কারা ওরা, টিম? বন্ধু নিয়ে এসেছো খেলতে, গোলমাল করতে, আমাকে বিরক্ত করতে? বলে দিয়েছি না, হৈ-চৈ আমি একদম পছন্দ করি না?'

'হৈ-চৈ করছি না আমরা, মিস্টার লারমার,' গম্ভীর হয়ে বললো টিম। 'আর শব্দ তো বাইরে যায় না। এই ঘর সাউণ্ডপ্রুফ। আপনার অসুবিধে…'

হাত নেড়ে তাকে থামিয়ে দিলো লারমার। দীর্ঘ এক মুহূর্ত স্থির তাকিয়ে রইলো তিন গোয়েন্দার দিকে, যেন তাদের চেহারা মনে গেঁথে নিলো। বললো, 'যাচ্ছি। তোমার মায়ের সঙ্গে কথা বলা দরকার।'

দুপদাপ করে পায়ের শব্দ হলো দোতলার সিঁড়িতে।

'কাউকে তোমাদের বাড়িতে আনলে তার কি?' লারমারের ব্যবহারে কিছুটা অবাকই হয়েছে রবিন। 'বাড়িটা তোমাদের, তাই না?'

'না, মিস্টার রোজারের। আমার মা তাঁর হাউসকীপার। তিনি চলে যাওয়ার পর ওপর তলার ঘরগুলো লারমারকে ভাড়া দিয়ে কোনোমতে সংসার চালাচ্ছে মা। যাও, এখন যাও তোমরা। ঝামেলাতেই ফেলেছো…'

'যাচ্ছি।' সহকারীদের দিকে ফিরে বললো কিশোর, 'চলো যাই।' টিমকে বললো, 'অনেক ধন্যবাদ, টিম, ঘড়িগুলো দেখানোর জন্যে।'

হলে ফিরে টেবিল থেকে ঘড়িটা তুলে নিয়ে ব্যাগে ভরলো কিশোর। বেরিয়ে চলে এলো রোলস রয়েসটা যেখানে পার্ক করা আছে।

'দূর, কোনো লাভ হলো না,' গাড়িতে উঠে বললো মুসা। 'ঘড়ি জোগাড়ের নেশা আছে লোকটার। ব্যস, রহস্য ওই পর্যন্তই।'

'হুঁ,' বলে কি বোঝাতে চাইলো কিশোর, বোঝা গেল না। হ্যানসনকে বললো, 'হলিউডে এলামই যখন, মিস্টার ক্রিস্টোফারের অফিসে একবার ঢুঁ মেরে যাই। কি বলেন?'

'নিশ্চয়ই,' বলে এঞ্জিন স্টার্ট দিলো হ্যানসন।

'দাঁড়ান, দাঁড়ান!' বলে উঠলো রবিন।

সবাই দেখলো, টিম দৌড়ে আসছে। পাশের জানালা নামিয়ে দিলো মুসা। কাছে এসে হাঁপাতে লাগলো ছেলেটা। 'যাক, ধরতে পেরেছি···দেখো, সত্যি আমার সাহায্য দরকার।' থেমে দম নিলো সে। 'আমার বাবা জেলে, কোনো অপরাধ না করেই। তাকে যদি নিরপরাধ প্রমাণ করতে পারতে, বড্ড উপকার হতো।'

ছয়

'গাড়িতে ওঠো,' দরজা খুলে দিয়ে ডাকলো কিশোর। 'খুলে বলো সব। বুঝে দেখি সাহায্য করতে পারবো কিনা।'

পেছনের সিটে চাপাচাপি করে বসলো চার কিশোর। অল্প কথায় সব জানালো টিম। বছর তিনেক আগে স্ত্রী আর ছেলেকে নিয়ে এসে থাকার জন্যে মিস্টার রোজারের বাড়িতে উঠেছিলো তার বাবা বেকার ডেলটন। বীমা কোম্পানির সেলসম্যানের কাজ করতো। সামান্য আয়ে সংসার চলতো না। তাই বাধ্য হয়ে মিস্টার রোজারের হাউসকীপারের চাকরি নিয়েছিলো টিমের মা। বাড়ির পেছনে ছোট একটা অ্যাপার্টমেন্ট হাউসও বিনা ভাড়ায় পেয়েছিল থাকার জন্যে।

ভালোই কাটছিলো। তারপর, মাস ছয়েক আগে বেভারলি হিল-এ এক ব্যবসায়ীর বাড়িতে চুরি হলো। তিনটে দামী ছবি। কিভাবে ঢুকেছিলো চোর, জানতে পারেনি পুলিশ। অনুমান করছে, হয় সরু জানালা দিয়ে জোরজার করে ঢুকেছে, কিংবা নকল চাবি বানিয়ে নিয়েছে। খোঁজ নিয়ে জানলো ওরা, চুরির হপ্তা দুই আগে ওই বাড়িতে গিয়েছিলো ডেলটন। মালিকের একটা পলিসি করানোর জন্যে। ছবিগুলো দেখেছে।

শুধু ওই বাড়িতে যাওয়ার 'অপরাধেই' ডেলটনের অ্যাপার্টমেন্টে এসে ছবি খুঁজেছে পুলিশ। রান্নাঘরে পেয়েছে চোরাই মাল। ধরে নিয়ে গিয়ে পাঁচ বছরের জন্যে জেলে ঢুকিয়ে দিয়েছে। মাস তিনেক আগে বিচার শেষ হয়েছে তার। অনেক মিনতি করেছে ডেলটন, কসম খেয়েছে। বলেছে, সে চুরি করেনি। ছবি চেনে না। দামী কিনা বলতেই পারবে না। তাছাড়া দু'জনের আয়ে সংসার চলে যাচ্ছিলো ভালোমতোই, চুরি কেন করতে যাবে? কিন্তু জুরিরা শুনলো না সে কথা।

'বিশ্বাস করো, শেষে বললো টিম, 'বাবা চুরি করেনি। আমার বাবা চোর নয়! হলে আমি আর মা জানতাম। পুলিশের ধারণা, এই এলাকায় গত দশ বছর ধরে

যতো ছবি চুরি হয়েছে, সবগুলোর সঙ্গে জড়িত রয়েছে বাবা। বীমার দালাল, লোকের বাড়িতে ঢোকা তার জন্যে সহজ।' থেমে দম নিলো সে। তারপর হঠাৎ কিশোরের হাত চেপে ধরে বললো, 'তোমাদের ভাড়া করতে চাই। আমাকে সাহায্য করো। ব্যাংকে পনেরো ডলার জমিয়েছি আমি, তোমাদের দেবো। এর বেশি দিতে পারবো না, নেই আমার কাছে। আমার বাবাকে নির্দোষ প্রমাণ করে দাও, প্লীজ!'

চোখ মিটমিট করলো কিশোর, চিন্তিত। রবিন আর মুসার চোখে শূন্য দৃষ্টি। না জেনেশুনে ভালোমতো সাক্ষী-প্রমাণ না নিয়ে কি আর একটা লোককে জেলে ঢুকিয়েছে পুলিশ?

'কাজটা খুব কঠিন, টিম,' বোঝানোর চেষ্টা করলো কিশোর। 'তবু, সাধ্যমতো চেষ্টা করবো।'

'কঠিন, সে-তো, জানিই। সহজ হলে কি আর গোয়েন্দার সাহায্য লাগতো?'

নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটছে কিশোর। 'আচ্ছা, একটা কথা বলো তো, ছবিগুলো তোমাদের রান্নাঘরে গেল কি করে?'

'বলতে পারবো না। মিস্টার রোজারের কাছে অনেকে আসতো। তাদের কেউ রেখে যেতে পারে। কিংবা বাবার কোনো শত্রু।'

'দরজায় তালা লাগানো থাকতো না?' রবিন জিজ্ঞেস করলো।

'থাকলেই বা কি? পুরনো দরজা, পুরনো তালা। সহজেই খোলা যায়। তাছাড়া এমন দামী কিছু থাকে না রান্নাঘরে, যে সাবধান থাকবো।'

'হুঁম্‌ম্‌।' নিচের ঠোঁটে চিমটি কেটেই চলেছে গোয়েন্দাপ্রধান।

'মিস্টার রোজারই চুরি করেননি তো?' মুসা বললো। 'চুরি করে এনে হয়তো তোমাদের রান্নাঘরে লুকিয়েছিলেন। ওটাই সহজ জায়গা।'

টিম জবাব দেয়ার আগেই কিশোর বললো, 'মিস্টার রোজারকে সন্দেহ করেছিলো পুলিশ?'

মাথা নাড়লো টিম। 'মিস্টার রোজার ওরকম কাজ করতেই পারেন না। আমাদের পছন্দ করতেন। তাছাড়া, ছবিগুলো যেরাতে চুরি হয়েছে, সেরাতে ঘরে ছিলেন তিনি।'

'কিছু মনে কোরো না,' বললো কিশোর। 'গোয়েন্দাগিরিতে কাউকেই সন্দেহের তালিকা থেকে বাদ দিতে নেই। তাই জিজ্ঞেস করলাম। একটা ব্যাপার অদ্ভুত লাগছে আমার।'

'অদ্ভুত?' রবিন ফিরে তাকালো।

'তদন্ত শুরু করলাম চেঁচানো ঘড়ির। এখন দেখছি ছবি চুরির কেস। কি যেন

একটা যোগাযোগ রয়েছে।'

'তা কি করে হয়?' প্রশ্ন তুললো মুসা।

'বুঝতে পারছি না। টিম, মিস্টার রোজারের কথা সব খুলে বলবে? রবিন, নোট নাও।'

বেশি কিছু জানাতে পারলো না টিম। বেঁটে, মোটা, হাসিখুশি মানুষ মিস্টার রোজার। অনেক টাকার মালিক। ডেলটনদের ধারণা বছর কয়েক আগে হঠাৎ ওগুলো কারও কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছেন রোজার। অনেক লোক যাতায়াত করতো তাঁর কাছে। ওদেরকে দেখে অনুমান করতে কষ্ট হয়নি, একসময় অভিনেতা ছিলেন রোজার, কিংবা থিয়েটারের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। তবে তিনি সেকথা কখনও ডেলটনদের বলেননি।

টিমের বাবা চোর, একথা রোজারও মানতে পারেননি। নিজের খরচে উকিল রেখে দিয়েছিলেন। কিন্তু বাঁচাতে পারলেন না ডেলটনকে। এতেই বোধহয় মন খারাপ হয়ে যায় তাঁর। বেকার ডেলটন জেলে যাওয়ার পর পরই বিদেশে চলে গেলেন তিনি। বলে গেলেন, হাওয়া বদলাতে যাচ্ছেন। বাড়িটা দেখাশোনার দায়িত্ব দিয়ে গেলেন টিমের মায়ের ওপর।

সঙ্গে শুধু দুটো সুটকেস নিয়ে সেই যে গেছেন রোজার, গেছেনই, আর কোনো খোঁজ নেই তাঁর। একটা চিঠিও লেখেননি। যাওয়ার পর কিছুদিন বন্ধুরা এসেছে দেখা করতে, না পেয়ে ফিরে গেছে। ওদের আসাও বন্ধ হয়ে গেছে এখন।

টিমের মা'কে কিছু টাকা দিয়ে গিয়েছিলেন রোজার। এক সময় শেষ হয়ে গেল সেই টাকা। ঠিক এই সময় ভাড়া বাড়ির খোঁজে এসে হাজির হলো লারমার। টাকা নেই, খাবে কি? অগত্যা লারমারকে বাড়ি ভাড়া দিয়ে দিলো মিসেস ডেলটন। লারমারের শর্ত, তাকে নিরিবিলিতে থাকতে দিতে হবে, আর কোনোরকম হৈ-চৈ করা চলবে না বাড়িতে।

'ব্যস, এইই জানি,' টিম বললো। কিছুক্ষণ উসখুস করলো সে। তারপর বললো, 'দেখো, শুরুতে তোমাদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছি, কিছু মনে রেখো না। ফোনে মা যখন তোমাদের সঙ্গে কথা বলছিলো, তখন আমিই ঘড়িটার চিৎকার চালু করে দিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম, খবরের কাগজের লোক···ওদের দেখতে পারি না আমি। কাজের কাজ কিছু করতে পারে না, খালি···যাক ওসব কথা। তোমরা কিছু মনে রেখো না। আমার মনের অবস্থা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো।'

'পারছি,' মাথা ঝোঁকালো কিশোর। 'তোমার সমস্যাটা নিয়ে ভাববো। কিছু বুঝতে পারলে, জানাবো।'

টিমকে গুড-বাই জানালো তিন গোয়েন্দা। গাড়ি থেকে নেমে চলে গেল টিম।

আবার এঞ্জিন স্টার্ট দিলো হ্যানসন। কিশোরকে জিজ্ঞেস করলো, 'মিস্টার ক্রিস্টোফারের ওখানেই যাবো?'

চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা কাত করলো কিশোর। 'যান। ওখানেই তো যেতে চাইছিলাম আমরা। এখন তো যাওয়াই দরকার। রোজার অভিনেতা হলে হয়তো তাঁকে চিনতে পারবেন মিস্টার ক্রিস্টোফার।'

কয়েক মিনিটেই প্যাসিফিক স্টুডিওর গেটে পৌঁছে গেল গাড়ি। আরও কয়েক মিনিট পর বিখ্যাত চিত্রপরিচালক ডেভিস ক্রিস্টোফারের অফিসে ঢুকলো তিন গোয়েন্দা।

'এই যে, ছেলেরা,' বিশাল ডেস্কের ওপর থেকে বললেন পরিচালক। 'হঠাৎ? নতুন কোনো কেস?'

'হ্যাঁ, স্যার,' কিশোর বললো। 'গোলমেলে ঘড়ির তদন্ত শুরু করেছিলাম...'

প্রথম দুটো শব্দ বাংলা বলেছে কিশোর, বুঝতে পারলেন না পরিচালক। ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করলেন, কিসের তদন্ত বললে?'

'গোলমেলে ঘড়ি, স্যার। স্ক্রীমিং ক্লক।'

'কীই! স্ক্রীমিং ক্লক!' ভুরু আরও কুঁচকে গেছে তাঁর, রীতিমতো অবাক হয়েছেন। 'অনেক বছর কোনো খোঁজ নেই। কি হয়েছিলো তার?'

সাত

'তার?' বিস্ময়ে প্রায় চেঁচিয়ে উঠলো কিশোর। 'স্ক্রীমিং ক্লক নামে কোনো মানুষ আছে?'

'ওটা তার ডাকনাম,' জানালেন পরিচালক। 'ওর আসল নাম হ্যারিসন ক্লক। চেঁচাতো তো, সে-জন্যেই লোকে নাম রেখেছিলো স্ক্রীমিং ক্লক। স্ক্রীমার ছিলো সে।'

'স্ক্রীমার?' বুঝতে পারছে না কিশোর।

'কিশোর পাশাও তাহলে অনেক কিছু জানে না,' মুচকি হাসলেন পরিচালক। 'চেঁচানোকে পেশা হিসেবে নিয়েছিলো হ্যারি।' রহস্যময় কণ্ঠে বললেন তিনি।

'বুঝিয়ে বলবেন, স্যার, প্লীজ!'

'অনেক বছর আগে, টেলিভিশন তখনও এতো উন্নত হয়নি। রেডিওর চলই ছিলো বেশি। রেডিওতে তখন নাটক শুনতো লোকে। রহস্য গল্প নিয়েও নাটক হতো। লোকে পছন্দও করতো খুব। একবার তো মনে আছে আমার, শুধু রহস্য গল্প নিয়েই এক হপ্তায় হয়েছিলো পঁয়তিরিশটা নাটক। আজকাল টেলিভিশনে

যেমন উপভোগ করো তোমরা, আমরা করতাম রেডিওতে শুনে। রোমাঞ্চিত হতাম।

'সে-সব নাটকে কণ্ঠ দিতে হতো অনেককে। বিশেষ সাউণ্ড ইফেক্টের জন্যে চেঁচানোর দরকার পড়তো। শুনে যতো সহজ মনে হচ্ছে, কাজটা মোটেও ততো সহজ নয়। এটাও একটা আর্ট। এর জন্যে অভিজ্ঞতা, দক্ষতা সব কিছুরই প্রয়োজন আছে। খুব ভালো শিল্পী ছিলো হ্যারি। পরিচালকদের কাছে তাই তার কদরও ছিলো খুব।

'আমার দুটো ছবিতে তাকে দিয়ে কাজ করিয়েছি আমি। চিৎকারে তার জুড়ি নেই। শিশু, মহিলা, পুরুষের কণ্ঠ তো বটেই, নানারকম জন্তুজানোয়ারের ডাকও সে নিখুঁত নকল করতে পারে।

'সময় বদলালো। টেলিভিশন জনপ্রিয় হলো। রেডিওর কদর আর রইলো না। ফলে হ্যারিসন ক্লকের মতো লোকদের দামও কমতে লাগলো। বছর কয়েক আগে আমার দুটো ছবিতে কাজ করার পর গায়েব হয়ে গেল হ্যারি। আর কোনো খোঁজ পাইনি। তার ব্যাপারেই তদন্ত করছো?'

'কি জানি, হতেও পারে,' বললো কিশোর। 'তবে আপাতত একটা স্ক্রীমিং ক্লকের তদন্ত করছি আমরা। ব্যাগ থেকে ঘড়িটা বের করে টেবিলে রাখলো সে। ওটা হাতে আসার পর থেকে যা যা ঘটেছে, খুলে বললো।

'আশ্চর্য!' গম্ভীর হয়ে মাথা দোলালেন পরিচালক। 'শুনে তো হ্যারিসন ক্লকের মতোই লাগছে, রোজারকে। ক্লক বেঁটে ছিলো। হালকা-পাতলা। রোজার বেঁটে, মোটা। তবে পাতলা মানুষ মোটা হতে সময় লাগে না। আরেকটা ব্যাপার, রেডিওতে আয় কমে গিয়েছিলো, কিন্তু শেষ দিকে কি করে যেন হঠাৎ বড়লোক হয়ে গিয়েছিলো হ্যারি।' আনমনে প্রশ্ন করলেন নিজেকেই, 'কিন্তু নাম বদলাবে কেন?'

'পেইন্টিঙের ব্যাপারে কি তাঁর আগ্রহ ছিলো, স্যার?' রবিন জিজ্ঞেস করলো।

'জানি না। অনেক অভিনেতারই অবশ্য থাকে। ক্লকের ছিলো বলে শুনিনি।'

'থ্যাংক ইউ, স্যার,' উঠে দাঁড়ালো কিশোর। অন্য দু'জনও উঠলো। 'অনেক মূল্যবান তথ্য জানালেন। এসব নিয়ে ভাবতে হবে।'

পরিচালকের অফিস থেকে বেরিয়ে এলো ওরা।

রকি বীচে, পাশা স্যালভিজ ইয়ার্ডে ওদের নামিয়ে দিয়ে গাড়ি নিয়ে চলে গেল হ্যানসন।

গেটের ভেতরে ঢুকেই থমকে গেল কিশোর। পেছনে প্রায় তার গায়ের ওপর এসে পড়লো অন্য দু'জন। কতগুলো আসবাবপত্রের ওপাশ থেকে বেরিয়ে এসেছে

একজন মানুষ।

'হাই, ছেলেরা,' এগিয়ে এলো সে। 'চিনতে পারছো?'

পারছে। মাত্র ঘন্টাখানেক আগে ওকে দেখেছে রোজারের বাড়িতে।

'একটা ঘড়ি আছে তোমার কাছে,' কিশোরের দিকে চেয়ে বললো লারমার। 'ওটা আমার জিনিস।'

হাতের ব্যাগটা পেছনে নিয়ে গেল কিশোর।

লাফিয়ে এগিয়ে এলো লারমার। 'আমার জিনিস আমাকে দিচ্ছো না কেন? জলদি দাও। নইলে...'

কিশোর আর লারমারের মাঝে এসে দেয়ালের মতো দাঁড়িয়ে গেল মুসা। 'কিছুই করতে পারবেন না আপনি, মিস্টার। ওটা আপনার জিনিস হলে নিশ্চয়ই দেবো। কিন্তু প্রমাণ করতে হবে...'

এক ধাক্কায় মুসাকে সামনে থেকে সরিয়ে দিলো লোকটা। গায়ে মোষের জোর, এতোটা আশা করেনি গোয়েন্দা-সহকারী। ইদানীং কারাত শিখছে সে, সেই ভরসায়ই সামনে এসেছিলো। হাল ছাড়লো না। কিশোরের হাত থেকে ব্যাগটা কেড়ে নেয়ার চেষ্টা চালালো লারমার। জাপানী জুজিৎসুর কায়দায় তার কব্জি চেপে ধরলো মুসা।

সেই একই কায়দায় চোখের পলকে হাত ছাড়িয়ে নিলো লারমার। বুঝতেই পারলো না মুসা, কখন ঘুরে গেছে সে, তার পিঠ এখন লোকটার দিকে। শার্টের কলার ধরে তুলে তাকে প্রায় ছুঁড়ে ফেলে দিলো লারমার। আবার কিশোরের হাত থেকে ব্যাগ কেড়ে নিতে গেল।

'এই মিস্টার!' মস্ত থাবা পড়লো লারমারের কাঁধে, যেন ভালুকের থাবা। তিন গোয়েন্দাকে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছে বিশালদেহী ব্যাভারিয়ান, বোরিস। 'হচ্ছে কী?'

ফিরে তাকালো লারমার। 'আমার জিনিস চুরি করেছে। ওটা ফেরত চাই।'

'ব্যাগ ছাড়ুন,' শান্ত কণ্ঠে বললো বোরিস।

'তোমার কথায়, না? ভালুক কোথাকার!' বলেই ধাঁ করে হাত চালালো বোরিসের গলা সই করে, কারাতের কায়দায়।

গলাটা সরিয়ে নিলো শুধু বোরিস। কারাত-ফারাতের ধার দিয়েও গেল না। লারমারের হাতটা ধরে হ্যাঁচকা টানে আরও কাছে নিয়ে এলো। তারপর দু'হাতে ধরে তাকে তুলে নিলো মাথার ওপর, টারজানের মতো। জনি ওয়াইসমুলারকে বোরিসের খুব পছন্দ, সুযোগ পেলেই তাঁকে অনুকরণের চেষ্টা করে। 'কিশোর, কি করবো ব্যাটাকে? আছাড় মেরে কোমর ভাঙবো, না পুলিশ ডাকবে?'

'না, ওসব কিছু না,' দ্রুত ভাবনা চলেছে গোয়েন্দাপ্রধানের মাথায়। পুলিশকে ডেকে এনে উল্টোও হতে পারে, হয়তো লারমার প্রমাণ করে দেবে ঘড়িটা তারই। তাহলে জটিল একটা রহস্য হাতছাড়া হয়ে যাবে। 'মাপ করে দিন ওকে।'

লারমারকে বুকের কাছে নামিয়ে এনে হাত থেকে ছেড়ে দিলো বোরিস। গমের বস্তার মতো দড়াম করে মাটিতে পড়লো লোকটা। কোমরে হাত দিয়ে কোনোমতে উঠে দাঁড়ালো। মুসার গা-জ্বালানো হি-হি হাসি উপেক্ষা করে চিবিয়ে চিবিয়ে বললো, 'বেশ, দেখে নেবো আমি!...'

হাত বাড়ালো বোরিস। 'তাহলে হয়ে যাক না এখুনি আরেকবার...'

ঝট করে পিছিয়ে গেল লারমার। কিশোরের দিকে ফিরলো। 'পস্তাবে, মনে রেখো! আমি...আমি...' কথা শেষ না করেই গটমট করে হেঁটে চলে গেল সে।

আট

পরদিন হেডকোয়ার্টারে আলোচনায় বসলো তিন গোয়েন্দা। টিমও রয়েছে।

সকালে লারমার চলে যাওয়ার পর টিমকে ফোন করেছিলো কিশোর। কথায় কথায় জেনেছে, ড্রাইভিং লাইসেন্স আছে তার, পুরনো একটা গাড়িও আছে। গাড়িটা তার বাবার। চাইলে ওটা কাজে লাগাতে পারে তিন গোয়েন্দা। গাড়ি নিয়ে ওকে আসতে বলেছিলো সে।

'তারপর, রবিন, তোমার খবর বলো,' সামনে ঝুঁকলো কিশোর।

লস অ্যাঞ্জেলেসের একটা বড় খবরের কাগজে কাজ করেন রবিনের বাবা। তাঁর সঙ্গে গিয়েছিলো সে, রেকর্ড রুমে পুরনো কাগজ ঘেঁটে দেখার জন্যে, অবশ্যই কিশোরের পরামর্শে। পকেট থেকে কয়েক পাতা কাগজ বের করে ভাঁজ খুলে টেবিলে বিছালো রবিন।

টিমের বাবা বেকার ডেলটনের সম্পর্কে নতুন তেমন কিছুই জানতে পারেনি। পুলিশ অনেক চেষ্টা করেছে। দশ বছর ধরে হলিউড আর লস অ্যাঞ্জেলেসে যতো ছবি চুরি হয়েছে, সবগুলোর সঙ্গে ডেলটন জড়িত ছিলো, একথা তার মুখ দিয়ে বের করাতে চেয়েছে। কিন্তু বেকার ডেলটনের এক কথাঃ সে চোর নয়। ছবির ব্যাপারে কিছুই বোঝে না। এসব কথা সঙ্গীদের জানিয়ে টিমের দিকে ফিরলো রবিন। জিজ্ঞেস করলো, 'তোমরা স্যান ফ্রান্সিসকোয় থাকতেই অনেকগুলো চুরি হয়েছে, তাই না?'

'হ্যাঁ। ছয় বছর আগে হলিউডে এসেছি আমরা। চুরি হচ্ছে আরও বছর চারেক আগে থেকেই। এতেই বোঝা যায়, আমার বাবা নির্দোষ।'

'চুরিগুলো একটা দলই করছে কিনা সেটা বুঝতে হবে আগে,' কিশোর বললো। 'রবিন, দশ বছরে ক'টা ছবি চুরি হয়েছে?'

'বেশি দামী ছবি মোট বারোটা। প্রতিটি ক্ষেত্রেই জানালা কিংবা দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকেছে চোর, ফ্রেম থেকে কেটে ছবি বের করে নিয়ে চলে গেছে। পুলিশের ধারণা, ওগুলো ধনী দক্ষিণ আমেরিকানদের কাছে বিক্রি করে দেয়া হয়েছে। লুকিয়ে রাখবে ওরা, কাউকে দেখাবে না। জেনেশুনেই চোর ও-ধরনের লোকের কাছে বিক্রি করেছে।'

'যাতে কেউ কখনও খুঁজে না পায় ওগুলো?'

'হ্যাঁ। টিমদের রান্নাঘরেরগুলোও নিখোঁজ হতো, সময় মতো পুলিশ ওখানে না গেলে।'

'দাম কেমন হবে বারোটা ছবির?'

'সঠিক বলা যাবে না। ছবি বিশেষজ্ঞদের আন্দাজ, নীলামে এক কোটি ডলারে উঠতে পারে।'

'খাইছে!' চোখ বড় বড় হয়ে গেল মুসার। 'এতো দাম!'

মাথা ঝাঁকালো রবিন।

'এখন প্রশ্ন হলো, টিমদের রান্নাঘরে এলো কিভাবে তিনটে ছবি?' বললো কিশোর। 'প্রশ্ন অবশ্য আরও আছে। কে চুরি করেছে? মিস্টার রোজার ওরফে ক্রুক হাওয়া বদল করতে গিয়ে কেন গায়েব হয়ে গেলেন? আর এটাই বা কোত্থেকে এলো?' টেবিলে রাখা ঘড়িটা ছুঁলো সে। 'কোনো না কোনোভাবে এটার মূল্য আছে। নইলে ছিনিয়ে নেয়ার জন্যে খেপে যেতো না লারমার।'

'ওকে বলাটাই আমার অন্যায় হয়েছে,' কোলের ওপর রাখা দুই হাতের দিকে তাকিয়ে বললো টিম। মুখ তুললো। 'কি করবো, বলো? এমনভাবে শাসাতে লাগলো মা'কে···তোমাদের কথা জিজ্ঞেস করলো। শেষে বলতে বাধ্য হলাম, একটা ঘড়ি এনেছো তোমরা। কার্ডটা দেখাতেই আর দেরি করলো না। ছোঁ মেরে আমার হাত থেকে কেড়ে নিয়ে ছুটলো।'

'ভাগ্যিস তখন ইয়ার্ডে ছিলো বোরিস। আচ্ছা, টিম, লারমার যে তোমাদের বাড়িতে থাকে, সন্দেহজনক আচরণ কিছু করে-টরে?'

'মাঝে মাঝে রাতে উঠে বাড়ির চারপাশে ঘুরে বেড়ায়! মা কারণ জিজ্ঞেস করেছিলো। জবাব দিয়েছে, সে লেখক। রাতে প্লটের কথা ভাবতে ভাবতে মাথা গরম হয়ে যায়, বাইরে বেরিয়ে ঠাণ্ডা করে। এক রাতে শুনলাম, দেয়ালে হাতুড়ি দিয়ে আস্তে আস্তে বাড়ি দিচ্ছে। গিয়ে দেখলাম। মনে হলো, কিছু খুঁজছে।'

'হুঁম্‌ম্‌!' নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটলো কিশোর। 'একটা সন্দেহ জাগছে, তবে

ভুলও হতে পারে। যাকগে, ওসব পরে। আগের কাজ আগে। বুঝতে পারছি না, পুলিশ যে চুরির সমাধান করতে পারেনি, সেটা আমরা কি করে করবো? ঘড়ি ধরেই এগিয়ে দেখা যাক।'

'তাতে আমার কি লাভ হবে?' হাত নাড়লো টিম। 'বাবা রয়েছে জেলে, আর তোমরা করতে চাইছো ঘড়ির তদন্ত…

'কোনোখান থেকে শুরু করতে হবে তো? অনেকগুলো রহস্য জমা হয়েছে। আমার বিশ্বাস, ঘড়িটার সঙ্গে ওগুলোর কোনো যোগাযোগ আছে।'

'বেশ,' খুশি হতে পারছে না টিম, 'করো। কিন্তু কি করে বুঝবে ওটা কোত্থেকে এসেছে?'

তলায় একটা কাগজ লাগানো ছিলো, মেসেজ।' ড্রয়ার খুলে একটা গোপন কুঠুরি থেকে ছোট কাগজটা বের করলো কিশোর। জোরে জোরে পড়ে শোনালো টিমকে।

'কাদের নাম?' মুসার প্রশ্ন। 'কারা ওরা? কি করে খুঁজে বের করবো? আর যদি পাই-ই, কি কথা জিজ্ঞেস করবো ওদের?'

'দাঁড়াও!' এক আঙুল তুললো কিশোর, 'একবারে একটা প্রশ্ন। মিলারের কাছে লেখা হয়েছে মেসেজটা। আগে তার ঠিকানা বের করা যাক।'

'কিভাবে?'

'ঠাণ্ডা মাথায় ভাবো। ভাবলেই বুঝতে পারবে। মিলার নিশ্চয় রোজারের বন্ধু, নইলে তার কাছে লিখতো না।' হাত বাড়ালো কিশোর, 'টিম, অ্যাড্রেসবুক পেয়েছো?'

'না। অনেক খুঁজেছি। একটা লিস্ট পেয়েছি শুধু, ড্রয়ারে অনেক কাগজের মধ্যে গোঁজা। ওদেরকে ক্রিস্টমাস কার্ড পাঠিয়েছিলেন মিস্টার রোজার। এই যে।'

ভাঁজ করা কাগজটা খুলে টেবিলে বিছিয়ে হাত দিয়ে ডলে সমান করলো কিশোর। 'গুড। মনে হচ্ছে এতেই চলবে। অনেক নাম-ঠিকানা আছে।'

নাম আর ঠিকানাগুলো পরিষ্কার ভাবে টাইপ করা রয়েছে কাগজটায়। হেনরি মিলার একজনই পাওয়া গেল। জেনি রোবিডও একজন, উত্তর হলিউডের ঠিকানা। তবে বারকেন দু'জন, একজন জেসিয়াস বারকেন, আরেকজন হিরাম বারকেন। দু'জনেই প্যাসাডোনার কাছে থাকেন। জেলডাও দু'জন—জেলডা ডেনমোর আর জেলডা ট্রিক্সটার। দু'জন থাকেন দুই জায়গায়।

নামগুলোর পাশে টিক চিহ্ন দিলো কিশোর। বললো, 'ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে সবাই। দু'দলে ভাগ হয়ে দেখা করতে যাবো আমরা। রবিন, তুমি টিমের সঙ্গে যাবে। মিলার আর মিস রোবিডকে খুঁজে বের করবে। একই দিকে থাকে দু'জনে.

সুবিধে হবে তোমাদের। রোলস রয়েসটা নিয়ে আমি আর মুসা যাবো অন্য দু'জনকে খুঁজতে। ঠিক আছে?'

'কিন্তু দেখা হলে কি জিজ্ঞেস করবো?'

'মিলারকে জিজ্ঞেস করবে, মিস্টার ক্লক ঘড়িটা তার কাছে পাঠিয়েছিলেন কিনা? আর নিচে লাগানো মেসেজটা দেখেছেন কিনা। ঘড়িটা বরং নিয়ে যাও সাথে করে। দেখালে হয়তো সহজে চিনতে পারবেন উনি।'

'বেশ, নিলাম। আর মিস রোবিডকে?'

'তাঁর কাছে রোজার কোনো মেসেজ পাঠিয়েছে কিনা জিজ্ঞেস করবে। বলবে, মেসেজটা তোমাকে জেনে নেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন ক্লক। প্রয়োজন হলে ঘড়িটা মিস রোবিডকেও দেখাবে।'

'তা নাহয় দেখালাম। কিন্তু তুমি? তোমার ঘড়ি দরকার হবে না?'

'অবিকল এক রকম দেখতে আরেকটা ঘড়ি নিয়ে যাবো আমি। এমনও হতে পারে দেখানোর দরকারই হবে না। তবু, বলা যায় না। ওরকম ঘড়ি আরেকটা জোগাড় করে রেখেছি আমি।'

'এখুনি রওনা হবো?'

'তোমাদের গাড়ি আছে। চলে যেতে পারো। আমাদের বসতে হবে। হ্যানসন গাড়ি নিয়ে এলে, তারপর...'

'কিশোর,' হাত তুললো মুসা। 'একটা খুব জরুরী কথা ভুলে বসে আছো। এখুনি রওনা হতে পারি না আমরা।'

'কেন?' অবাক হলো কিশোর।

'কারণ,' গম্ভীর হয়ে জবাব দিলো মুসা, 'এখন লাঞ্চের সময়।'

নয়

'এখানেই কোথাও হবে,' মোড়ে মোড়ে লাগানো রোড-নম্বরগুলো দেখছে রবিন। 'হ্যাঁ, ওই যে, মিস্টার মিলার ওই গলিতেই থাকেন।'

পথের মোড়ে পুরনো সেডান গাড়িটা পার্ক করলো টিম। দু'জনেই নামলো গাড়ি থেকে।

'বাপরে, বিরাট বড়লোক,' পাথর বসানো ড্রাইভওয়ে ধরে হাঁটতে হাঁটতে বললো টিম। 'বাড়ি দেখেছো কত বড়!'

মাথা ঝাঁকালো রবিন। হাতে ব্যাগ। বেল বাজাতে গিয়ে অবাক হয়ে ভাবলো রবিন. এই বাড়ি থেকেই ঘড়িটা বেরিয়েছে?

দরজা খুলে দিলো এক মহিলা। ভুরু কুঁচকে তাকালো ওদের দিকে। মাঝবয়েসী, মনে হচ্ছে, কোনো কারণে উত্তেজিত হয়ে আছে। 'কি চাই?' কড়া গলায় বললেন। 'চাঁদা? ক'বার দেবো?'

'না, ম্যাডাম,' ভদ্র কণ্ঠে বললো রবিন, চাঁদা চাইতে আসিনি। মিস্টার মিলারের সঙ্গে দেখা করতে চাই, প্লীজ।'

'হবে না। উনি অসুস্থ। কয়েক মাস হলো হাসপাতালে রয়েছেন।'

'ওহ্, সরি। তাই নাকি?' দ্রুত ভাবছে রবিন। মিস্টার মিলার যদি কয়েক মাস ধরে হাসপাতালেই থেকে থাকেন, তিনি নিশ্চয় ঘড়িটা ফেলেননি। জিজ্ঞেস করলো, 'তাঁর পুরো নাম কি হেনরি মিলার?'

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে রবিনকে দেখছেন মহিলা। বোধহয় আন্দাজ করতে চাইছেন, ছেলেটা ভালো না মন্দ—মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দেবেন কিনা। ভালোই মনে হলো হয়তো, তাই জবাব দিলেন, 'হ্যাঁ। কেন? কোনো রকম...'

'না না, কোনো রকম অসৎ উদ্দেশ্য নেই আমাদের,' তাড়াতাড়ি বললো রবিন। 'মিসেস মিলার। আপনিই নিশ্চয় মিসেস মিলার। হ্যাঁ, যা বলছিলাম, একটা ব্যাপারে তদন্ত করতে এসেছি আমরা।' ব্যাগ থেকে ঘড়ি খুলে দেখালো। 'এই যে, এটা।'

'আবার ওটা!' চেঁচিয়ে উঠলেন মহিলা। 'ওরকম বিচ্ছিরি একটা জিনিস আমার স্বামীর কাছে পাঠিয়েছে। ভাবো একবার, তার অসুখের সময়। ভাগ্যিস চিৎকার শোনেনি। তাহলে নির্ঘাত হার্টফেল করতো। আমি সুস্থ মানুষ, আমিই মাথা ঘুরে পড়ে গিয়েছিলাম আরেকটু হলে!'

চকিতে দৃষ্টি বিনিময় করলো রবিন আর টিম। ঠিক জায়গাতেই এসেছে।

'নিশ্চয় মিস্টার ক্লক পাঠিয়েছেন?' জিজ্ঞেস করলো রবিন।

'হ্যারিসন ক্লক! ও আবার ভদ্রলোক নাকি? ভেবে দেখো, অসুস্থ একজন মানুষকে ওরকম উপহার পাঠায়? কিসের সুবাদে? না, ওরা একসঙ্গে কাজ করতো একসময়। আমার স্বামী রেডিওর জন্যে রহস্য নাটক লিখতো। ঘড়িটা পেয়ে প্রথমে কিছু মনে করিনি! কিন্তু প্লাগ লাগিয়ে চিৎকার শুনে...ও মাগো!' শিউরে উঠলেন মিসেস মিলার। 'সোজা নিয়ে গিয়ে ময়লার বাক্সে ফেলে দিয়ে এলাম। তোমরা ওখান থেকে কুড়িয়ে এনেছো নাকি?'

'না। এক বাতিল মালের দোকান থেকে কেনা হয়েছে। নিচে একটা মেসেজ ছিলো, দেখেছেন?'

'মেসেজ?' ভ্রূকুটি করলেন মহিলা। 'না, দেখিনি। পাওয়ার পরদিনই ফেলে দিয়েছি। ঘড়িটার সঙ্গে ছোট একটা চিঠিও পাঠিয়েছিলো। ওটাও ফেলে দিয়েছি।'

'কি লেখা ছিলো মনে আছে? ব্যাপারটা জরুরী।'

'ছিলো?…ছিলো, ঘড়িটা কাজে লাগালে নাকি অনেক টাকার মাল পাবে। মাথামুণ্ডু কিছু বুঝিনি। রসিকতার আর সময় পেলো না লোকটা। এদিকে আমার স্বামী হাসপাতালে মরে, টাকার অভাব, এই সময় কোনো ভালো মানুষ ওসব কথা লেখে? বুঝলাম না, এভাবে আমাদের ভয় পাইয়ে দিয়ে কি আনন্দ সে পেতে চেয়েছে।' থেমে আবার ভ্রূকুটি করলেন মিসেস মিলার। 'কিন্তু তোমার এসব জানার কি দরকার? ঘড়ি নিয়ে তোমার এতো আগ্রহ কেন?'

'দরকার আছে, ম্যাডাম। মিস্টার ক্লক নিখোঁজ হয়েছেন। তাঁকে খোঁজা হচ্ছে। হয়তো এই ঘড়িতেই রয়েছে সূত্র। কোত্থেকে ওটা পাঠানো হয়েছে, কিছু বুঝতে পেরেছেন?'

'না। অবাকই লেগেছে। হ্যারিসন ক্লক যে নিখোঁজ হয়েছে, খবরটা আমিও শুনেছি। ভাবছি…এহ্হে ফোন বাজছে। যাই। যা যা জানি, সব বলেছি তোমাদেরকে। গুড-বাই, বয়েজ।'

দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

টিমের দিকে ঘুরলো রবিন। 'হও আরও গোয়েন্দা! ভিখিরির মতো বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখে…যত্তোসব!' তিক্ত কণ্ঠে বললো সে। 'তেমন কিছু জানাও গেল না। শুধু জানলাম, মিস্টার ক্লক ঘড়িটা পাঠিয়েছিলো। ওটা অসুস্থ মিলারের হাতে পড়েনি। মিসেস মিলার পেয়ে ফেলে দিয়েছেন। মেসেজের মানে বুঝলাম না।'

'এই,' গোয়েন্দাগিরিতে মজা পাচ্ছে টিম, অপমান গায়েই মাখেনি, 'এখানে দাঁড়িয়ে না থেকে, চলো না মিস জেনি রোবিডের ওখানে যাই। তিনি হয়তো কিছু বলতে পারবেন।'

কিন্তু মিস রোবিডও বিশেষ কিছু জানাতে পারলেন না। উত্তর হলিউডের উডল্যাণ্ড হিল-এ ছোট্ট একটা বাড়িতে থাকেন তিনি। নানা রকম গাছের ঝোপ আর ঘন কলা ঝাড়ের ওপাশে কটেজটা খুঁজে বের করতে বেগ পেতে হলো ওদের। হালকা-পাতলা মানুষ। রবিনের মনে হলো, কথা বলার সময় পাখির মতো কিচিরমিচির করেন। ধূসর চুল, চোখে সোনালি ফ্রেমের চশমা, পোশাক-আশাকে মনে হয় এইমাত্র বেরিয়ে এলেন রূপকথার জগত থেকে।

দু'জনকে আদর করে ডেকে নিয়ে গিয়ে বসালেন লিভিং-রুমে। সংবাদপত্র, ম্যাগাজিন আর সুদৃশ্য কুশনে বোঝাই ঘরটা দেখে রবিনের মনে হলো, এখানে কিছু রাখলে জীবনেও আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। রবিনের প্রশ্ন শুনেই চশমা কপালের ওপর ঠেলে তুলে দিয়ে ডেস্কের ভেতর খুঁজতে শুরু করলেন তিনি, আর পাখি-কণ্ঠে একনাগারে কিচির-মিচির করে চললেন, 'ভাবতেই পারিনি ওটার জন্যে

কেউ আসবে। মেসেজটা নিতে। আমি ভেবেছি রসিকতা, মিস্টার ক্লকের রসিকতা। খুব রসিক লোক, স্টুডিওতে সবাইকে মাতিয়ে রাখতো। আমিও তখন রেডিওতে কাজ করতাম। একদিন গায়েব হয়ে গেল ক্লক। আর কোনো হদিস পেলাম না। তারপর হঠাৎ ওই চিঠি। সঙ্গে আরেকটা ছোট কাগজ, মেসেজ। চিঠিতে বলেছে, কেউ মেসেজ নিতে এলে যেন দিয়ে দেয়া হয়। অবশ্যই, যদি ঘড়ির কথা বলে। আরে, রাখলাম কোথায়? চশমাটাও তো পাচ্ছি না। দেখবে কিভাবে?'

চশমা কোথায় আছে, বললো রবিন। তাড়াতাড়ি আবার ওটা নাকের ওপর টেনে নামালেন মিস রোবিড। ড্রয়ারের ছোট একটা খোপে ঢুকে গেল হাত, বেরিয়ে আসতে দেখা গেল দু'আঙুলে ধরে রেখেছেন একটা খাম। 'এই যে। আমি জানি ওখানে রেখেছি। যাবে কোথায়? এই তো, পেলাম। হ্যাঁ, যা বলছিলাম, হ্যারিসন ক্লকের কথা। রসিক লোক ছিলো। ভালো লোক। আমার বন্ধু। কিন্তু ওর কণ্ঠ নিশ্চয় রেডিওতে শোনোনি তোমরা?'

'না, ম্যাডাম, শুনিনি। তবে রসিকতা নিয়েই তদন্ত করছি আমরা। জানতে চাই, তিনি কি বলতে চেয়েছেন। মেসেজটার জন্যে অনেক, অনেক ধন্যবাদ।'

'আরে না না, এর জন্যে আবার ধন্যবাদ কেন? যখন খুশি চলে আসবে তোমরা, আমার সাধ্যমতো সাহায্য করবো। হাজার হোক, ক্লকের রসিকতা নিয়ে গবেষণা করছো। ওর সঙ্গে দেখা হলে আমার কথা বোলো। যা দারুণ চিৎকার করতে পারতো না ও! ওর চিৎকার শোনার জন্যে লোকে সব কাজ বাদ দিয়ে রেডিওর সামনে বসে থাকতো। একটা নাটকের কথা তো বিশেষভাবে মনে আছে। হেনরি মিলারের "আ স্ক্রীম অ্যাট মিডনাইট" গল্পের ওপর ভিত্তি করে। কি চমৎকার ভয় যে পাওয়াতো না, কি বলবো! আর মিলারও লেখক বটে! ধাঁধা, সূত্র, রহস্যে তার জুড়ি নেই। খুউব বুদ্ধি। ওহহো, ভুলেই গিয়েছি। তোমাদেরকে চা খেতেই তো বললাম না? খাবে না? আচ্ছা, ঠিক আছে, আরেক সময় এলে খেও। যাবে? তাড়াহুড়ো বেশি? বেশ, যাও। বাচ্চাদের স্বভাবই ওরকম। সব কিছুতেই তাড়া।'

বাইরে বেরিয়ে হাঁপ ছাড়লো দুই কিশোর।

'মেরে ফেলেছিলো আরেকটু হলে!' গাড়িতে উঠে হাসলো টিম। 'এতো বকতে পারে! থামে না। তবে কাজ হয়েছে। কি লেখা আছে মেসেজে, দেখি?'

খাম খুলে একটা কাগজের টুকরো বের করলো রবিন। আগ্রহে ঝুঁকে এলো টিম। হাঁ করে তাকিয়ে আছে দু'জনে।

লেখা রয়েছেঃ

ইট'স কোয়ায়েট দেয়ার ঈভ্‌ন্‌ ইন আ হারিকেন।
জাস্ট আ ওয়ার্ড অভ অ্যাডভাইস, পোলাইটলি গিভেন।
ওল্ড ইংলিশ রোম্যান লাভড ইট।
বিগার দ্যান আ রেইনড্রপ; স্মলার দ্যান অ্যান ওশন।
আয়্যাম ফোর। হাউ ওল্ড আর ইউ?
ইট সিটস অন আ শেলফ লাইক আ ওয়েল-ফেড-এলফ্‌।
'সর্বনাশ! মগজ ঘোলা করে দেবে!' গুঙিয়ে উঠলো টিম। 'মানে কি এগুলোর?'

দশ

প্যাসাডেনায় গিয়ে সঠিক জেলডাকে খুঁজে বের করলো কিশোর আর মুসা। তিনি জেলডা ডেনমোর। ভীষণ মোটা। মুসার মনে হলো, পাকা একটা মিষ্টি কুমড়ো। রেডিওতে কাজ করতেন, এখন অবসর নিয়েছেন।

বেড়াল পোষেন মিসেস ডেনমোর, অনেক বেড়াল। সব সিয়ামিজ। ছেলেদের যেখানে বসালেন, সারা ঘরেই বেড়াল গিজগিজ করছে। তাঁর চেয়ারের দুই হাতায় বসেছে দুটো, দুটোর গায়েই হাত বুলিয়ে আদর করছেন তিনি।

কিশোরের প্রশ্নের জবাবে বললেন, 'হ্যাঁ, চিনি তাকে। তাহলে তোমাদেরকেই মেসেজটা দিতে অনুরোধ করেছে?'

'মিস্টার ক্রক মেসেজ পাঠিয়েছেন?' এড়িয়ে গিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করলো কিশোর। 'কখন?'

'হপ্তা দুই আগে। সঙ্গে একটা চিঠি। লিখেছে, কেউ নিতে এলে যেন তাকে দিয়ে দিই।' সামনে থেকে একটা বেড়াল সরিয়ে ড্রয়ার খুললেন মিসেস ডেনমোর, খাম বের করে দিলেন কিশোরের হাতে। 'কি করছে এখন ক্রক? ওর সঙ্গে দেখা নেই অনেকদিন। রেডিও থেকে কাজ চলে যাওয়ার আগে বেশ টাকার টানাটানিতে পড়েছিলো বেচারা। নতুন কোনো কাজও পাচ্ছিলো না। রেডিও জনপ্রিয়তা হারানোতে অনেক স্ক্রীমারই পথে বসলো।'

'তাঁর সম্পর্কে আমরাও খুব একটা জানি না। কয়েক মাস আগে কোথায় যেন চলে গেছেন।'

'অন্য কেউ হলে অবাক হতাম। তবে ক্রকের পক্ষে সবই সম্ভব। আজব লোক। কখন যে কি ভাবে, কি করে বসে, ঠিকঠিকানা নেই। নানা পেশার লোকের সঙ্গে পরিচয় ছিলো তার, ঘনিষ্ঠতা ছিলো। চোর, ডাকাত, জুয়াড়ীরাও ছিলো তার

বন্ধু।'

'তাই নাকি? থ্যাংক ইউ, মিসেস ডেনমোর। আজ তাহলে উঠি। মুসা, চলো যাই। আরও কাজ আছে।'

মহিলাকে তাঁর বেড়ালের পালের মধ্যে রেখে বেরিয়ে এলো দুই গোয়েন্দা। গাড়িতে অপেক্ষা করছে হ্যানসন।

'মেসেজটা দেখি?' হাত বাড়ালো মুসা।

'গাড়িতে চলো আগে।'

গাড়িতে উঠে খাম খুললো কিশোর। ছোট এক টুকরো কাগজ বের করলো। কতগুলো নম্বর লেখা রয়েছে শুধু তাতে। এরকমঃ

৩-২৭৪-৩৬৫-১৯৪৮-১২৭-১১১৫-৯১০১-২৫-১৬

৪৫-৩৭৯৮-৯৮২০-১৩৫৮৪-৯

আরও আছে নম্বর। সবই প্রথমগুলোর মতো অর্থহীন, প্রথম দৃষ্টিতে তা-ই মনে হলো।

'খাইছে!' চেঁচিয়ে উঠলো মুসা। 'কি অঙ্ক?'

'অঙ্ক না.' মাথা নাড়লো কিশোর। 'কোনো ধরনের সঙ্কেত। পরে চেষ্টা করবো।' কাগজটা ভাঁজ করে পকেটে রেখে দিলো সে। 'এখন বারকেনকে খুঁজে বের করা দরকার।'

কোথায় যেতে হবে, বলা হলো হ্যানসনকে। ছুটে চললো রোলস রয়েস।

গম্ভীর হয়ে বসে নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটছে কিশোর। নীরব।

মুসাও ভাবছে। ভাবছে, অগ্রগতি কি কিছু হয়েছে? এক মেসেজে তো রয়েছে দুর্বোধ্য সংখ্যা, আরেক মেসেজে কি আছে?

পুরনো একটা এলাকায় একটা বাড়ির সামনে এনে গাড়ি থামালো হ্যানসন। মুসা আর কিশোর নেমে হেঁটে এগোলো।

বেল বাজালো কিশোর।

দরজা খুলে দিলো একজন লোক। বড়জোর কিশোরের সমান লম্বা, তার মতোই পাতলা। দুই পায়ের মাঝে ফাঁক অনেক বেশি, দু'দিকে ধনুকের মতো বেঁকে রয়েছে। 'কি চাই?'

'আচ্ছা,' লোকটার কড়া দৃষ্টি উপেক্ষা করে বললো কিশোর। 'এটা কি মিস্টার জেসিয়াস বারকেনের বাড়ি?'

'কি দরকার তাকে?'

'জিজ্ঞেস করতাম, মিস্টার হ্যারিসন ক্লককে চেনেন কিনা।'

'ক্লক? কে বললো আমি তাকে চিনি? জীবনে ওই নামও শুনিনি। যাও,

ভাগো।'

'এক মিনিট, বারকেন,' পেছন থেকে বললো একটা ভদ্র কণ্ঠ। দেখা দিলো লম্বা, সম্ভ্রান্ত চেহারার এক লোক। চকচকে কালো চুল ব্যাকব্রাশ করা। কথায় স্প্যানিশ টান। 'ক্লককে খুঁজছো কেন?' মুসা আর কিশোরকে জিজ্ঞেস করলো। 'গোয়েন্দা নও তো?' হাসলো।

'সত্যি বলতে কি...' আরম্ভ করেও কিশোরের কনুইয়ের গুঁতো খেয়ে থেমে গেল মুসা।

'মিস্টার ক্লকের পাঠানো কয়েকটা মেসেজ খুঁজছি আমরা,' বললো কিশোর। 'তাঁর রেখে যাওয়া কয়েকটা ঠিকানা পেয়েছি। মিস্টার বারকেনের নামও আছে...'

'ইনটারেসটিং,' বললো লম্বা লোকটা। 'এসো, ভেতরে এসো। মনে হচ্ছে তোমাদের সাহায্য করতে পারবো। আমার বন্ধুর হয়ে মাপ চেয়ে নিচ্ছি,' বারকেনের কাঁধে হাত রেখে বললো।

দু'জনকে অনুসরণ করে একটা অগোছালো লিভিং-রুমে ঢুকলো কিশোর আর মুসা।

'দেখো, মারকো,' গোঁ গোঁ করে বললো বারকেন। 'আমার এসব ভাল্লাগছে না। কি করছো, কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'চুপ থাকো,' ধমক দিলো মারকো। কিশোরের দিকে চেয়ে বললো, 'শোনো, ক্লক নিখোঁজ হওয়ায় আমরা খুব চিন্তায় আছি। বারকেনের কাছে আজব একটা মেসেজ নাকি পাঠিয়েছে। মনে হচ্ছে তোমরা ব্যাপারটা জানো। জানো, ক্লক কোথায়?'

'না, স্যার,' জবাব দিলো কিশোর। 'তবে আমরা মেসেজগুলো খুঁজে বের করার চেষ্টা চালাচ্ছি, এটা ঠিক। প্রথমে অদ্ভুত একটা ঘড়ি হাতে এলো...'

'ঘড়ি? সঙ্গে আছে?'

ব্যাগ খুলে নকল ঘড়িটা বের করলো কিশোর। 'এই যে, স্যার।'

হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ঘড়িটা দেখলো মারকো। 'অতি সাধারণ। হ্যাঁ, এবার মেসেজের কথা বলো। কি কি জেনেছো?'

'মেসেজে জেলডা আর বারকেনকে জিজ্ঞেস করতে বলা হয়েছে। কিন্তু কি জিজ্ঞেস করতে হবে, বলেনি। জেলডা ডেনমোরকে খুঁজে বের করেছি আমরা, তাঁর কাছে একটা মেসেজ পাঠিয়েছেন মিস্টার ক্লক। সেখান থেকেই এলাম। ক্লকের ক্রিস্টমাস কার্ডে মিস্টার জেসিয়াস বারকেনের নাম-ঠিকানা দেখলাম তো। মিস্টার বারকেন, আমাদের জন্যে কোনো মেসেজ পাঠানো হয়েছে?'

'মেসেজ একটা পেয়েছে বটে,' জবাবটা দিলো মারকো। 'সাথের চিঠিতে

লিখেছে, ওটা ডেলিভারি দেয়ার আগে অন্য মেসেজগুলো যেন দেখে নেয়া হয়। দেখি তো, জেলডার মেসেজটা?' হাত বাড়ালো সে।

'কিন্তু…' দ্বিধা করছে কিশোর। পকেট থেকে বের করলো সংখ্যা লেখা কাগজটা।

দেখলো মারকো। 'শুধুই তো নম্বর!' হতাশ মনে হলো তাকে। 'কোড-টোড হতে পারে। মানে কি?'

'জানি না। আরেকটা মেসেজ দেখলে হয়তো বোঝা যাবে। মিস্টার বারকেনের মেসেজ।'

'হয়তো। বেশ, সব দায়িত্ব এখন আমার। এই ঘড়ি আর মেসেজগুলো তোমাদের জন্যে নয়, তোমাদের কাছে পাঠানো হয়নি। আর কোনো মেসেজ থাকলে দিয়ে দাও। আমিই সব সামলাবো।'

'আর নেই,' সামান্য ফ্যাকাসে হয়ে গেছে কিশোরের চেহারা। লম্বা লোকটার হাব-ভাব ভালো ঠেকছে না তার। 'দেখুন, ঘড়ি আর মেসেজ দিয়ে দিন, প্লীজ। ওগুলো আমাদের। আমরা তদন্ত…'

'চুপ!' খেঁকিয়ে উঠলো মারকো। 'ডিংগো, ধরো ব্যাটাদের। দেখি, কোথায় কি লুকিয়ে রেখেছে!'

চোখের পলকে পেছন থেকে মুসার গলা জড়িয়ে ধরলো জেসিয়াস বারকেন ওরফে ডিংগো। বেঁটে, হাড্ডি সর্বস্ব, রগ বের হওয়া প্যাকাটির মতো হাতে যে এতো জোর, ভাবতেও পারেনি গোয়েন্দা-সহকারী।

ঠিক ওই সময়, অনেক দূরে রবিন আর টিমও পড়েছে গোলমালে।

বাড়ি ফিরে চলেছে ওরা। রকি বীচের মাইলখানেক দূরে সান্তা মনিকা পর্বতের ভেতর দিয়ে চলে গেছে পথ। ওখানটায় এসে পেছনের গাড়িটা লক্ষ্য করলো রবিন। ঘন নীল শরীর, সাদা ছাত। দেখেছে আরও আগেই, গুরুত্ব দেয়নি। হঠাৎ গতি বাড়িয়ে দ্রুত ছুটে আসছে।

'টিম!' উত্তেজিত কণ্ঠে বললো রবিন। 'মনে হয় পিছু নিয়েছে। ধরতে আসছে এখন।'

'পারলে ধরুক,' বলতে বলতেই গ্যাস প্যাডালে পায়ের চাপ বাড়িয়ে দিলো টিম।

লাফ দিয়ে আগে বাড়লো পুরনো গাড়িটা। শাঁ করে একটা মোড় পেরিয়ে তীব্র গতিতে নেমে চললো ঢালু পথ বেয়ে।

আবার পেছনে তাকালো রবিন। নীল গাড়িটাও গতি বাড়িয়েছে। দ্রুত কমছে

দূরত্ব। ইতিমধ্যেই একশো গজের ভেতরে এসে গেছে।

প্যাডালে পায়ের চাপ আরও বাড়ালো টিম। মারাত্মক গতিবেগ। কিন্তু তার পরেও ছাড়াতে পারছে না নীল গাড়িটাকে, এগিয়েই আসছে, কমছে মাঝখানের ফাঁক।

আরেকটা তীক্ষ্ণ মোড় নিলো টিম। আরেকটু হলেই পথের ধার দিয়ে খাদে পড়ে গিয়েছিলো সেডান। কোনোমতে সোজা করে আবার পথের ওপর নিয়ে এলো ওটাকে। মুখ থেকে রক্ত সরে গেছে। 'ভালোমতো চালাতে শিখিনি এখনও। আর যা রাস্তা...খালি মোড়...নাহ্, পারলাম না। ধরে ফেলবে।'

'হাল ছেড়ো না,' সাহস দিলো রবিন। 'রকি বীচে ঢুকলে তখন আর আসতে সাহস করবে না।'

'চেষ্টা করছি। সাইড দেবো না। আগে যেতে না পারলে থামাতে পারবে না আমাদের।'

গতি কমিয়ে পথের মাঝ দিয়ে গাড়ি চালালো টিম।

ফিরে চেয়ে আছে রবিন। এদিক ওদিক সরে পাশ কাটানোর চেষ্টা করছে নীল গাড়িটা। স্টীয়ারিঙে ঝুঁকে থাকা মানুষটাকে পরিচিত লাগছে, কিন্তু চিনতে পারছে না।

নির্জন পথ ধরে ছুটে চলেছে দুটো গাড়ি। সামনে পথের ওপর একটা ছোট গর্ত দেখে এড়াতে গেল টিম, এই সুযোগে পাশে চলে এলো পেছনের গাড়িটা। সরতে সরতে সেডানটাকে নিয়ে এলো একেবারে পথের ধারে। আর সরার জায়গা নেই। ধাক্কা লাগলেই এখন পড়ে যাবে খাদে।

'থামতেই হবে!' চেঁচিয়ে বললো টিম। 'কায়দা করে ফেলেছে হারামজাদা!'

গ্যাস প্যাডাল থেকে পা সরিয়ে ব্রেক চাপলো সে। সেডানটা থামতে শুরু করতেই পাশের গাড়িটাও গতি কমালো।

কালো চশমা পরা লোকটার দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে রয়েছে রবিন। চেনার চেষ্টা করছে। কোথায় দেখেছে কিছুতেই মনে করতে পারলো না।

থেমে গেল সেডান। পাশে থামলো নীল গাড়ি। হঠাৎ আবার খেপা ঘোড়ার মতো লাফিয়ে আগে বাড়লো, শাঁ শাঁ করে ছুটে হারিয়ে গেল পথের বাঁকে।

'তাজ্জব কাণ্ড!' অবাক হয়েছে টিম। 'পিছু নিলো, থামলো, এখন পালালো...'

বুঝতে পারলো কারণটা। পেছনে শোনা যাচ্ছে সাইরেনের শব্দ। এগিয়ে আসছে দ্রুত। কিছুক্ষণ পরে ঘ্যাঁচ করে এসে পাশে থামলো একটা পুলিশের গাড়ি। নেমে ওদের দিকে এগিয়ে এলো একজন অফিসার, বর্ষার মেঘলা আকাশের মতো থমথমে চেহারা। হাত বাড়ালো, 'দেখি লাইসেন্স!'

এগারো

'ধরে রাখো, ছেড়ো না,' আদেশ দিলো মারকো।

মুসার হাত মুচড়ে পিঠের ওপর নিয়ে এসেছে ডিংগো।

টেবিল থেকে একটা কাগজ কাটার ছুরি তুলে নিয়ে কিশোরের বুকে ঠেকিয়েছে মারকো। ভয়ানক কণ্ঠে বললো, 'দাও, যতোগুলো মেসেজ আছে।'

চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে কিশোর। মুসা দেখতে পাচ্ছে না তাকে। সে চুপ থাকলো না। ছাড়া পাওয়ার চেষ্টা চালিয়েই যাচ্ছে। কারাতের স্কুলে শিখেছে, কি করে কব্জি ছাড়াতে হয়। হঠাৎ মাছের মতো মোচড় দিয়ে উঠলো তার শরীরটা। সোজা হয়ে গেল হাত। সামনের দিকে ঝটকা দিয়ে ঝুঁকে গেল মাথা। কিছু বুঝে ওঠার আগেই মুসার পিঠের ওপর দিয়ে উড়ে চলে গেল ডিংগো। বাড়ি খেলো মারকোর গায়ে। তাকে নিয়ে দড়াম করে পড়লো মাটিতে।

'জলদি ভাগো!' চেঁচিয়ে উঠলো কিশোর। মেঝেতে মাথা ঠুকে গেছে মারকোর, চিত হয়ে আছে। তার বুকের ওপর চেপে রয়েছে ডিংগো। [illegible]নেরই হতবিহ্বল অবস্থা। মারকোর হাত থেকে মেসেজটা টেনে নিয়ে দরজ[illegible] দৌড় দিলো কিশোর। একই সময়ে দরজায় পৌঁছলো মুসা। ধাক্কা লেগে [illegible]জনের।

'ঘড়ি!' চিৎকার করে বললো মুসা। 'ফেলে এসেছো!'

'থাকুক,' থামলো না কিশোর। 'ওটা লাগবে না।'

হাঁপাতে হাঁপাতে এসে গাড়িতে উঠলো ওরা। কিশোর বললো, 'হ্যানসন, গাড়ি ছাড়ুন, কুইক!'

তিন গোয়েন্দার সঙ্গে অনেক দিনের পরিচয় হ্যানসনের, জানে এই সব জরুরী মুহূর্তে কি করতে হয়। বিন্দুমাত্র দেরি করলো না সে, প্রশ্ন করলো না, ছেড়ে দিলো গাড়ি।

'আরি, কিশোর,' বলে উঠলো মুসা। 'মেসেজটা তো ছিঁড়ে ফেলেছো!'

হাতের দিকে তাকালো কিশোর। তাই তো! অর্ধেকটা ছিঁড়ে নিয়ে এসেছে। বাকি অর্ধেক নিশ্চয় রয়ে গেছে মারকোর হাতে।

'গেল!' নিরাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়লো মুসা।

'ফিরে গিয়ে নিয়ে আসবো নাকি?' নিজেকেই যেন প্রশ্ন করলো কিশোর।

'আবার! আর পারবো না। একবারই ছাড়া পেয়েছি অনেক কষ্টে।'

'নাহ্, গিয়েও আর লাভ নেই। এতোক্ষণ নিশ্চয় বাকি অর্ধেক লুকিয়ে ফেলেছে মারকো। জিজ্ঞেস করলে স্রেফ অস্বীকার করবে।'

'আর কোথাও যাবো?' জিজ্ঞেস করলো হ্যানসন। 'নাকি সোজা ইয়ার্ডে?'

'না, যাবো,' বললো কিশোর। 'ভুল বারকেনের ওখানে গিয়েছিলাম আমরা। জেসিয়াস নয়, আমাদের দরকার হিরাম বারকেনকে, এখন বুঝতে পারছি।' ঠিকানা বলে সিটে হেলান দিলো সে।

'আচ্ছা, কিশোর,' মুসা বললো। 'মেসেজের জন্যে এতো আগ্রহ কেন ব্যাটাদের?'

'বুঝতে পারছি না। মিস্টার ক্লকের ব্যাপারে এমন কিছু জানে হয়তো, যা আমরা জানি না। মেসেজগুলোকে মূল্যবান ভাবছে। কেন ভাবছে, সেটা আমাদের জানতে হবে।'

'কিভাবে?'

'মেসেজের মর্ম উদ্ধার করে।'

'যদি পারা যায়!' নিষ্প্রাণ হাসি হাসলো মুসা। 'ততোদিনে চুল-দাড়ি পেকে সব সাদা হয়ে যাবে আমাদের, মরার সময় হয়ে যাবে। তাছাড়া পুরো মেসেজটা থাকলেও এক কথা ছিলো, ছিঁড়ে তো এনেছো মাত্র অর্ধেকটা।'

'চেষ্টা তো করতে হবে,' বলে চুপ হয়ে গেল কিশোর।

গাড়ি থামলো। 'বোধহয় এই জায়গাই,' হ্যানসন বললো। 'এবার কোনো বিপদ আশা করছেন? আমি আসবো?'

'না। বিপদে পড়লে জোরে জোরে চিল্লাবো। মুসা, এসো যাই।'

স্প্যানিশ ধাঁচের ছোট্ট সুন্দর একটা বাড়ি, বাগানে ঘেরা। গোলাপের যত্ন করছেন এক বৃদ্ধ। পায়ের শব্দে মুখ ফিরিয়ে তাকালেন।

'মিস্টার হিরাম বারকেন?' জিজ্ঞেস করলো কিশোর।

মাথা ঝাঁকালেন বৃদ্ধ। 'হ্যাঁ, আমি।' হাতের দস্তানা খুলতে খুলতে জিজ্ঞেস করলেন, 'কি চাও? অটোগ্রাফ?' মৃদু হাসলেন তিনি। 'বহু বছর পরে আবার অটোগ্রাফ...আ স্ক্রীম অ্যাট মিডনাইট-এ গোয়েন্দার অভিনয় করার পর কতো লোক যে এসেছিলো...নাটকটা নিশ্চয় শোনোনি? নাকি?'

'না, স্যার। খুব জমজমাট নাটক হয়েছিলো, তাই না?'

'খালি জমজমাট! রোম খাড়া করে দিয়েছিলো কতো লোকের। আর চেঁচাতেও পারতো বটে হ্যারি ক্লক। হ্যারি আর হেনরি, দু'জনে মিলেই লিখেছিলো। হ্যারির প্লট, আর হেনরির কলম। ঘুরিয়ে, পেঁচিয়ে এমন এক কাহিনী দাঁড় করিয়েছিলো...যাকগে, ওসব পুরনো ইতিহাস। তা, তোমাদের অটোগ্রাফ...' খাতার জন্যে হাত বাড়ালেন মিস্টার বারকেন।

'অটোগ্রাফ নয়, স্যার...'

'তাহলে কি?' কিছুটা নিরাশই মনে হলো ভদ্রলোককে, তবে হাসি মলিন হলো না। 'চাঁদা? নাকি নতুন ম্যাগাজিনে বিজ্ঞাপন?'

'না, ওসব না, স্যার। মেসেজ। মিস্টার ক্লকের মেসেজ।'

'ও, মেসেজ!' উজ্জ্বল হয়ে উঠলেন আবার বারকেন। 'নিশ্চয়। বহুদিন ক্লকের কোনো খবর নেই, বছর বছর ক্রিস্টমাস কার্ড ছাড়া। এই প্রথম এলো চিঠি। এসো, ঘরে এসো, দেখি খুঁজে পাই কিনা।'

চমৎকার সাজানো গোছানো একটা ঘরে ওদেরকে নিয়ে এলেন বারকেন। সবার আগে চোখে পড়ে পুরনো স্টাইলের বিশাল এক টেপ রেকর্ডার। শেলফে সাজানো সারি সারি টেপের বাক্স।

ডেস্কের ড্রয়ার থেকে একটা খাম বের করলেন তিনি। 'এই যে। খুলে পড়েছি। সেই পুরনো হ্যারিসন ক্লক, দুর্বোধ্য সব কথাবার্তা। একটা শব্দও বুঝিনি।'

মেসেজটা হাতে নিলো কিশোর। ঝুঁকে এলো মুসা। লেখা রয়েছেঃ

'টেক ওয়ান লিলি; কিল মাই ফ্রেণ্ড এলি।
পজিটিভলি নাম্বার ওয়ান।
টেক আ ব্রুম অ্যাণ্ড সোয়্যাট আ বী।
হোয়াট ইউ ডু উইদ ক্লথস, অলমোস্ট।
নট মাদার, নট সিসটার, নট ব্রাদার; বাট পারহ্যাপস ফাদার।'

হাইমস? হামস? হোমস? অলমোস্ট, নট কোয়াইট।

'খাইছে! এটা কবিতা না, দাঁত ভাঙার মেশিন?'

'কিংবা মাথা ভাঙার হাতুড়ি,' হেসে বললেন বারকেন। 'মানে বোঝার অনেক চেষ্টা করেছি, বিরক্ত হয়ে হাল ছেড়ে দিয়েছি শেষে। যতদূর জানি, এলি নামে হ্যারির কোনো বন্ধু ছিলো না। অথচ পড়ে মনে হয়, বন্ধু এলিকে খুন করে তার বুকে একটা পদ্ম রেখে দেয়ার কথা ভাবছে, তাই না?' শব্দ করে হাসলেন। 'সাথে একটা নোটও লিখে দিয়েছে। কেউ নিতে এলে যেন মেসেজটা তাকে দিয়ে দিই। ও, ভালো কথা, তোমাদের পরিচয়ই জানা হলো না এখনও।'

'নিশ্চয়ই,' পকেট থেকে কার্ড বের করে দিলো কিশোর।

কার্ডটা পড়লেন মিস্টার বারকেন। হাত মেলালেন দুই গোয়েন্দার সঙ্গে। 'তোমরা গোয়েন্দা জেনে খুশি হলাম। একটা কথা, হ্যারির ব্যাপারে যখন আগ্রহ, নিশ্চয় তার দু'একটা নাটক শুনতে চাইবে? মানে, নাটকে তার চিৎকার। আজকালকার ছেলে তোমরা, টেলিভিশন দেখে অভ্যাস। রেডিওতে নাটকের মজা যে কী, জানো না। শুনবে? ওই যে টেপগুলো দেখছো, অনেক নাটক রেকর্ড করা

আছে ওগুলোতে। আমার অভিনয় করা সমস্ত নাটক। প্রত্যেকটাতে আছে হ্যারিসন ক্লকের কণ্ঠ।'

লোভ হলো দুই গোয়েন্দার। রেডিওর নাটকের কথা অনেক শুনেছে ওরা। রাশেদ পাশাও মাঝে মাঝেই বলেন। সময় থাকলে এই সুযোগ ছাড়তো না, কিন্তু এখন মোটেই সময় নেই ওদের। মিস্টার বারকেনকে অনেক ধন্যবাদ দিয়ে, গুড-বাই জানিয়ে মেসেজটা নিয়ে বেরিয়ে এলো ওরা। গাড়িতে এসে উঠলো।

হ্যানসনকে ইয়ার্ডে ফিরে যেতে বলে মুসার দিকে তাকালো কিশোর। 'টিম আর রবিন কি করেছে কে জানে। সবগুলো মেসেজ একসাথে পেলে সমাধান করতে সুবিধে হতো। গিয়ে এখন ওদেরকে হেডকোয়ার্টারে পেলেই হয়।'

হেডকোয়ার্টারেই রয়েছে তখন রবিন আর টিম, তবে তিন গোয়েন্দার নয়, পুলিশ হেডকোয়ার্টারে। নতুন ডিউটি অফিসার রবিনকে চেনে না। দু'জনকে নিয়ে ঢুকলো চীফের অফিসে।

'আরে, রবিন তুমি?' বলে উঠলেন ইয়ান ফ্লেচার।

চীফকে দেখে হাঁপ ছাড়লো রবিন। 'হ্যাঁ, স্যার, ধরে আনা হয়েছে।'

'কি করেছিলে?'

কি করেছিলো, জানালো ডিউটি অফিসার।

'সরি, রবিন, তোমাদের কাছ থেকে এটা আশা করিনি,' আন্তরিক দুঃখিত মনে হলো ফ্লেচারকে। 'খুব অন্যায় করেছো। এতো জোরে গাড়ি চালানো। অন্যের তো বটেই, নিজেরও ক্ষতি হতে পারতো।'

'ইচ্ছে করে করিনি, স্যার। আমাদের তাড়া করা হয়েছিলো। আরেকটা গাড়ি। ধরে ফেলেছিলো আমাদের। সময়মতো ইনি না গেলে,' ডিউটি অফিসারকে দেখালো রবিন। 'কিছু একটা করতো আমাদের।'

'তাড়া করেছিলো?' হাসি ফুটলো চীফের মুখে। 'নতুন কোনো কেস-টেস?'

'হ্যাঁ, স্যার, একটা চেঁচানো ঘড়ি।'

'চেঁচানো ঘড়ি! আশ্চর্য তো! ঘড়ি আবার চেঁচায় কিভাবে?'

'আমাদের গাড়িতেই আছে, স্যার। বললে এনে দেখাতে পারি।'

অফিসারের দিকে চেয়ে ইঙ্গিত করলেন ফ্লেচার। 'যাও ওদের সঙ্গে। নিয়ে এসো।'

ফিরে এলো খানিক পরে। খালি হাতে। মাথা নাড়লো অফিসার, 'নেই। ঘড়ি নেই। ওরা বলছে একটা ব্যাগ ছিলো সেটাও দেখলাম না।'

'আমার বিশ্বাস, স্যার,' মুখ কালো হয়ে আছে রবিনের, 'চুরি করে নিয়ে গেছে!'

বারো

'এতো দেরি করছে কেন ওরা?' মুসা বললো।

মিস্টার বারকেনের কাছে পাওয়া মেসেজটা টেবিলে রেখে ঝুঁকে দেখছিলো কিশোর, সোজা হয়ে তাকালো। 'যাই, দেখি, আসছে কিনা।'

সর্ব-দর্শনে গিয়ে চোখ রাখলো সে। জানালো, টিমের গাড়ি সবে ঢুকেছে ইয়ার্ডে।

কিছুক্ষণ পর সাঙ্কেতিক টোকা পড়লো দুই সুড়ঙ্গের দরজায়। ট্র্যাপডোর খুলে দিলো মুসা। উঠে এলো রবিন আর টিম। ক্লান্ত, বিধ্বস্ত দেখাচ্ছে ওদের।

'মেসেজ পেয়েছো?' জিজ্ঞেস করলো।

'হ্যাঁ, তা পেয়েছি,' বসতে বসতে বললো রবিন। কিচ্ছু বোঝা যায় না।'

'দেখি?' হাত বাড়ালো কিশোর। 'ঘড়িটা কই?'

'নেই।'

'নেই মানে?' তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে গোয়েন্দাপ্রধানের দৃষ্টি। 'হারিয়ে ফেলেছো?'

'চুরি হয়ে গেছে,' টিম জানালো। 'পুলিশ স্টেশনের বাইরে গাড়ি পার্ক করেছিলাম…'

'পুলিশ স্টেশন?' মুসার প্রশ্ন। 'সেখানে কি করছিলে? ডাকাতে ধরেছিলো …?'

'বেশি জোরে চালাচ্ছিলাম বলে পুলিশে ধরেছিলো। আগেই পিছু নিয়েছিলো একটা গাড়ি, পাহাড়ের মাঝামাঝি আসতেই তাড়া করলো। ছুটলাম…'

কি হয়েছিলো, জানানো হলো মুসা আর কিশোরকে।

'ছেড়ে দিলেন আমাদেরকে চীফ,' বলা শেষ করলো রবিন। 'বলে দিয়েছেন, জরুরী কিছু জানলে, কিংবা বিপদের সম্ভাবনা দেখলেই যেন তাঁকে জানাই।'

'হুঁ,' আনমনে মাথা ঝোঁকালো কিশোর। 'জানানোর সময় এখনও হয়নি। কিছুই জানি না এখনও। পুলিশ বিশ্বাস করবে না, হাসবে। ভাববে, হ্যারিসন ক্রুকের রসিকতা। সাহায্য তো পাবোই না, বরং বেকায়দায় পড়ে যেতে পারি।'

মারকো আর ডিংগোর কথা বললো কিশোর, মাঝে মাঝে কথা যোগ করলো মুসা।

'তাহলে বুঝতেই পারছো,' কিশোর বললো! 'মেসেজ আর ঘড়ির ব্যাপারে ইনটারেস্ট আছে আরও অনেকের। হতে পারে, তোমাদেরকে যে তাড়া করেছে, সে-ই ঘড়িটা চুরি করেছে। পুলিশের সাইরেন শুনে পালিয়ে গিয়ে লুকিয়ে ছিলো

কোথাও, তারপর সুযোগ বুঝে গিয়ে হাজির হয়েছে থানার কাছে। কেউ নেই দেখে টুক করে তোমাদের গাড়ি থেকে ব্যাগটা তুলে নিয়ে গেছে।'

'কিন্তু সেই লোকটা কে?' রবিন বললো। 'ঘড়ি আর মেসেজের ব্যাপারে এতো আগ্রহ কেন?'

'লারমারের কথা ভুলে গেছো? সে জানে ঘড়ির কথা। আরও কাউকে বলে থাকতে পারে। এক কান দু'কান হতে হতে দশ কান হতে বাধা কোথায়? না জেনে ভুল করে মারকো আর ডিংগোকেও অনেক কথাই বলে এসেছি আমরা। ঘড়ি আর মেসেজ তো বটেই, আমরা কি করছি, সেটাও জেনে গেছে ওরা।'

'দূর, আমার এসব ভাল্লাগছে না!' বাতাসে থাবা মারলো মুসা। 'তা রবিনের মেসেজে কি লেখা? প্রলাপ-ই?'

রবিনের আনা মেসেজটা টেবিলে রাখলো কিশোর। 'প্রলাপ নয়। তবে একই রকম কঠিন।'

'কেন ভণিতা করছো?' গুঙিয়ে উঠলো মুসা। 'এটাকে শুধু কঠিন বলে? হাতুড়ি, বলো, হাতুড়ি, মাথায় লাগলেই খুলি খতম, মগজ ঘোলা।'

'হয়নি,' হাসলো কিশোর। 'হাতুড়ি নয়। ডাবল ব্যারেল শটগান। মাথায় লাগলে খুলি, মগজ সব উড়ে যাবে। এবার খুশি তো?'

'হ্যাঁ, এইবার ঠিক বলেছো,' খুশি হয়ে মাথা দোলালো মুসা।

'কাজের কথায় আসি এবার। দেখা যাক, শটগানের ভেতর থেকে কিছু বেরোয় কিনা। রবিন, মিস্টার মিলার আর মিস রোবিডের সাথে যা যা কথা হয়েছে, সব খুলে বলো। কিচ্ছু বাদ দেবে না।'

বলতে থাকলো রবিন। কিশোর শুনছে, চুপচাপ, কোনো প্রশ্ন নেই। নোট করে নিচ্ছে মনের খাতায়। রবিনের কথা শেষ হলে বিড়বিড় করলো আনমনে, 'তাহলে, মিস্টার মিলার হাসপাতালে, অসুস্থ। মিস্টার ক্লক তাঁর কাছেই ঘড়িটা পাঠিয়েছিলেন, মেসেজগুলো জোগাড় করে রহস্যের সমাধানের জন্যে। এখন প্রশ্ন হলো, সমাধান করলে কি বেরোবে?'

'নিশ্চয় এমন কিছু, যাতে চমকে যাবেন মিস্টার মিলার,' রবিন বললো। 'ঘড়ির নিচে লাগানো মেসেজে তো তাই বলা হয়েছে।'

'হয়েছে। কিন্তু কি দেখে চমকাবে? কি ঘটবে? সেটাই বুঝতে হবে এখন আমাদের। দেখি চেষ্টা করে, মেসেজগুলোর মানে বুঝতে পারি কিনা।'

টেবিলে রাখা মেসেজটার দিক থেকে চোখ ফেরালো টিম। 'মেসেজ?' নিঃসন্দেহ হতে পারছে না সে। 'একে মেসেজ বলছো? কোনো ধরনের কোড?'

'তাছাড়া আর কি?' জবাব দিলো কিশোর। 'মিস্টার ক্লক আর মিস্টার মিলার,

দু'জনেই রহস্য ভালোবাসেন। ধাঁধা পছন্দ করেন। এমনও হতে পারে, কথাগুলোর মানে জানা আছে মিস্টার মিলারের, আর সে-জন্যেই ওভাবে লিখেছেন মিস্টার ক্লক। নিজেরা ঠিকই বুঝতে পারবেন, অথচ অন্য কেউ পারবে না।'

'তোমার কি মনে হয়?' হাত নাড়লো মুসা। 'তুমি পারবে?'

'আমার তো মনে হচ্ছে ক্রসওয়ার্ড পাজ্‌লস জাতীয় কিছু। প্রতিটি লাইনে একটি করে বিশেষ শব্দ পাওয়া যাবে, ছয় লাইনে ছয়টা। আর ছয়টা শব্দ দিয়ে হবে একটা বাক্য, যেটার মানে বোঝা যাবে সহজেই।'

'তাহলে তৈরি করে ফেলো বাক্যটা। প্রথম লাইন থেকেই শুরু করো। বলা হচ্ছে, হারিকেনের সময়ও শান্ত থাকে। হারিকেনের সময় কোন জায়গাটা সব চেয়ে শান্ত থাকে?'

'আমি জানি,' বলে উঠলো টিম। 'স্টর্ম সেলার। ঝড়ের সময় যেখানে গিয়ে আশ্রয় নেয় মানুষ।'

'তার চেয়েও নিরাপদ ব্যাংকের ভল্ট,' তিক্ত কণ্ঠে বললো রবিন।

'কি জানি,' নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটলো কিশোর, 'ভল্ট হতেও পারে। আসলেই তো নিরাপদ। এখানে দামী জিনিসের আভাস যখন পাওয়া যাচ্ছে।'

'দূর, হেঁয়ালি করে কথা বলো না তো!' রেগে গেল মুসা।

হেঁয়ালি কোথায়? দামী জিনিস না হলে মেসেজগুলোর জন্যে পাগল হয়ে উঠেছে কেন কিছু লোক? আর দামী জিনিস ব্যাংকের ভল্টেই সব চেয়ে নিরাপদ। এবার দু'নম্বর লাইনঃ জাস্ট আ ওয়ার্ড অভ অ্যাডভাইস, পোলাইটলি গিভেন। এখানে একটা শব্দই বিশেষভাবে চোখে লাগে, 'অ্যাডভাইস'। মানে, উপদেশ। অ্যাডভাইসের আর কি কি মানে হয়? প্রতিশব্দ? মুসা, প্লীজ, ডিকশনারীটা দেবে?'

বইয়ের তাক থেকে ডিকশনারী এনে দিলো মুসা।

নীরবে পাতা ওল্টালো কিশোর। 'এই যে, অ্যাডভাইসের প্রতিশব্দ, ওপিনিয়ন! দেখা যাক, মেলে কিনা? ব্যাংক ভল্ট…ওপিনিয়ন…। নাহ্‌, ঠিক হচ্ছে না।'

'তা তো হচ্ছেই না,' জোর দিয়ে বললো মুসা। 'ভদ্র ভাষায় আমার পরামর্শ হলো…'

'মুসাআ!' হাত তুললো কিশোর।

কড়া চোখে তার দিকে তাকালো মুসা। 'থামবো? কেন? আমার পরামর্শ...'

তাকে অবাক করে দিয়ে তুড়ি বাজালো হঠাৎ কিশোর। 'ঠিক বলেছো! পরামর্শ! বলছে পোলাইটলি গিভেন অ্যাডভাইস। পরামর্শও এক ধরনের উপদেশ, ভদ্রভাবে দেয়া উপদেশ। মুসা, দিয়েছো সমাধান করে লাইনটার।'

চোখ মিটমিট করছে গোয়েন্দা-সহকারী। 'যতোটা ভেবেছি, ততোটা কঠিন নয় তাহলে! আশ্চর্য!...কিন্তু আমি এখনও ব্যাংক ভল্টের সঙ্গে পরামর্শ মেলাতে পারছি না।'

'আমিও না। দেখি, বাকি শব্দগুলো বের করলে মেলে কিনা।'

'তিন নম্বর লাইন হলো,' রবিন বললো, 'ওল্ড ইংলিশ বোম্যান লাভড ইট। কি ভালোবাসতো? বোম্যানরা একটা জিনিসই ভালোবাসে, সেটা তীর-ধনুক। সে ইংরেজই হোক, আর অন্য দেশীই হোক, আগের দিনেরই হোক, বা এখনকারই হোক।'

'বোম্যানের আরেকটা মানে যদি করা হয়?' ভুরু কুঁচকে, মাথা নেড়ে বললো কিশোর। 'যদি ধরা হয়, "তীরন্দাজ"? তাহলে তো যুদ্ধও ভালোবাসবে।'

'ব্যাংক ভল্ট...পরামর্শ...তীরন্দাজ!' চেঁচিয়ে উঠলো টিম, 'আরো ঘোলা হয়ে যাচ্ছে মগজ! মাথাটা এবার সত্যি খারাপ হবে!'

'কি জানি,' ভ্রূকুটি করলো কিশোর। 'কিন্তু...'

বাধা পড়লো কথায়। বাইরে থেকে শোনা গেল মেরিচাচীর কণ্ঠ, ডাকছেন। 'কিশোওর! কোথায় তোরা? খাবার ঠাণ্ডা হয়ে গেল।'

'চমৎকার!' টেবিলে চাপড় মারলো মুসা। 'এই হলো গিয়ে একটা কথার মতো কথা। চুলোয় যাক মেসেজ। চলো খেয়ে নিই আগে।'

টিমকে খেয়ে যাবার অনুরোধ করলো কিশোর। রাজি হলো না সে। বললো তাকে তাড়াতাড়ি যেতে বলে দিয়েছে মা। আরেকদিন খাবে।

'ঠিক আছে, যাও তাহলে,' কিশোর বললো। 'যোগাযোগ রাখবো। আর হ্যাঁ, লারমারের ওপর চোখ রেখো। বলা যায় না, সে-ই হয়তো তোমাদের পিছু নিয়েছিলো। ঘড়ি চুরি করেছে।'

'রাখবো,' ঘাড় নাড়লো টিম। 'লোকটাকে আমিও পছন্দ করি না। দেখলেই মনে হয়, কিছু একটা শয়তানীর তালে আছে।'

মুখ খুলতে যাচ্ছিলো কিশোর, বাধা পড়লো আবার। টেলিফোন বাজছে। রিসিভার তুলে নিলো। 'তিন গোয়েন্দা। কিশোর পাশা বলছি।'

'হাল্লো।' কণ্ঠটা প্রথমে চিনতে পরলো না কিশোর। 'হিরাম বারকেন। হ্যারিসন ক্লকের মেসেজ নিতে আজ বিকেলে এসেছিলে আমার বাড়িতে।'

'হ্যাঁ, স্যার!'

'তখন থেকেই ভাবছি তোমাদের জানাবো কিনা। তোমরা যাওয়ার পর একটা ঘটনা ঘটেছে।'

'ঘটনা?'

'আরেকজন এসেছিলো মেসেজ চাইতে। লম্বা, কালো চুল, দক্ষিণ আমেরিকার লোক বলে মনে হলো। সঙ্গে তার এক বন্ধু, বেঁটে। বললো, ক্লক নাকি ওদের পাঠিয়েছে।'

'নিশ্চয় মেসেজ দিতে পারেননি। আমাদেরকেই তো দিয়ে দিয়েছেন।'

'না, পারিনি। ওরা চাপাচাপি করতে লাগলো কাকে দিয়েছি বলার জন্যে। তোমাদের কার্ড দেখিয়ে দিয়েছি ওদের। নাম ঠিকানা লিখে নিলো। তারপর থেকেই ভাবছি, কাজটা কি উচিত হলো? ওদের ভালো লোক মনে হয়নি আমার, বিশেষ করে লম্বাটাকে। মারকো। এতো বেশি ভদ্র, বিনয়...'

'দিয়ে দিয়েছেন ঠিকানা, কি আর করা। যাকগে, যা হবার হবে। কষ্ট করে আবার আমাদের ফোন করবেন, অনেক ধন্যবাদ।'

লাইন কেটে গেল। রিসিভার রেখে বন্ধুদের দিকে তাকালো কিশোর। 'মারকো আর ডিংগো এখন আমাদের নাম-ঠিকানা জানে। লারমার জানে। তিনজনেই ঘড়িটা চায়, মেসেজগুলো চায়। লারমার ঘড়িচোর না হলে, অন্য আরেকটা দল আছে। সবাই ইনটারেসটেড। লোক কেউই সুবিধের নয় ওরা। আমাদের বিপদটা বুঝতে পারছো আশা করি?'

তেরো

পরদিন সকালে স্যালভিজ ইয়ার্ডে যাওয়ার জন্যে তাড়াহুড়ো করে নাস্তা সারছে রবিন, এই সময় এলো ফোন। লাইব্রেরিয়ান ফোন করেছেন, যেখানে সে পার্টটাইম চাকরি করে। কয়েক ঘন্টা কাজ করে দেয়ার অনুরোধ জানালেন।

সেদিন রবিনের অফ ডে, ইচ্ছে করলে মানা করে দিতে পারে। ইয়ার্ডে রহস্যময় মেসেজ নিয়ে গবেষণা করবে কিশোর আর মুসা, একথা ভেবে একবার ভাবলো না-ই করে দেয়। শেষে ভাবলো, হয়তো জরুরী দরকার, নয়তো কোনো কারণে আটকে গেছেন লাইব্রেরিয়ান। বললো, বিশ মিনিটের মধ্যে হাজির হবে।

নাস্তা সেরে সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়লো রবিন। লাইব্রেরিতে এসে জানলো, অ্যাসিসট্যান্ট লাইব্রেরিয়ানের শরীর খারাপ, আসতে পারবেন না।

দুপুর পর্যন্ত কাজে ব্যস্ত রইলো রবিন। বিকেলটাও তাকে থেকে যেতে বললেন লাইব্রেরিয়ান। কি আর করা। থেকে গেল। সঙ্গে আনা স্যাণ্ডউইচ দিয়ে খাওয়া সেরে রেফারেন্স বই খুলে বসলো।

প্রথমেই হারিকেনের ওপর লেখা অধ্যায়টা খুললো। রহস্যময় মেসেজে রয়েছে হারিকেনের উল্লেখ। পড়তে পড়তে একসময় উত্তেজিত হয়ে উঠলো সে. নোট

লিখে রাখলো। তারপর বের করলো মধ্যযুগীয় ইংরেজ তীরন্দাজদের ওপর লেখা অধ্যায়। আবার উত্তেজিত হয়ে নোট লিখলো নোটবইয়ে। এরপর পড়লো সাগরের ওপর লেখা লেখাটা। কারণ মেসেজে 'ওশন' শব্দটা রয়েছে। নোট করার মতো কিছু পেলো না এখানে। লাঞ্চের সময় শেষ। বই বন্ধ করে উঠে গেল কাজ করার জন্যে।

পাঁচটার আগে ছাড়া পেলো না রবিন। লাইব্রেরি থেকে বেরিয়ে সাইকেলে চেপে সোজা চললো স্যালভিজ ইয়ার্ডে। দুপুরে বিশেষ কথাগুলো জানার পর থেকে এতোক্ষণ উত্তেজনা চেপে রাখতে খুব কষ্ট হয়েছে তার। এখন আর তর সইছে না।

ইয়ার্ডে ঢুকে বুঝলো, সকালে না এসে ভালোই করেছে। সারাটা দিন মুসা আর কিশোরকে গাধার খাটুনি খাটতে হয়েছে। কয়েক ট্রাক মাল কিনে এনেছেন রাশেদ পাশা। সেগুলো গোছানো তখনও শেষ করতে পারেনি।

'উফ্ফ্, মরে গেছি,' রবিনকে দেখেই বলে উঠলো কিশোর। 'সকালে মুসা এলো। সবে হেডকোয়ার্টারে ঢুকবো ঢুকবো করছি, এই সময় চাচা নিয়ে এলো মালগুলো। বোরিস আর রোভারেরও অবস্থা কাহিল আজ।'

'টিমের কোনো খবর আছে?' জিজ্ঞেস করলো রবিন।

'ফোন করেছিলো। কাল যাওয়ার পরই নাকি লারমার ধরে জিজ্ঞেস করেছে, এতোক্ষণ কোথায় কি করেছে টিম। ভয়ে বলে দিতে বাধ্য হয়েছে সে। এখানে যা যা শুনে গেছে সব। শুনে নাকি আরও রেগে গেছে লারমার।'

'রাগলো কেন?'

'জানে না।'

'মেসেজগুলো আমাদের হাতে পড়েছে জেনেই হয়তো রেগেছে। আমরা সাবধান করে ফেললে হয়তো তার কোনো অসুবিধে হবে।' নোটবই বের করলো রবিন। 'কিশোর, কি জেনেছি জানো...'

'আরে, রবিন এসে গেছো?' পেছন থেকে বলে উঠলেন মেরিচাচী, কখন এসেছেন বুঝতেই পারেনি ওরা। 'ছিলে কোথায়? নিশ্চয় লাইব্রেরিতে। যাক, এসেছো ভালো হয়েছে। নাও,' বলতে বলতে ইয়া বড় এক খাতা তার হাতে গুঁজে দিলেন তিনি। 'মালের লিস্টটা করে ফেলো তো। ভুলটুল কোরো না। আমি যাই, রাতের খাবার লাগবে এতোগুলো লোকের...

এক মুহূর্ত আর দাঁড়ালেন না তিনি। ছেলেদেরকে কোনোরকম প্রতিবাদের সুযোগ না দিয়ে তাড়াতাড়ি কেটে পড়লেন সেখান থেকে।

'নাও, শুরু করো,' দু'হাত নাড়লো মুসা। 'আমরা তো মরেছি। তুমি আর বাদ থাকো কেন?'

'বলো,' খাতাটা খুলে কলম নিয়ে তৈরি হলো রবিন।

'একটা রকিং চেয়ার,' মুসা বললো।

'একটা...রকিং...চেয়ার। তারপর?'

'এক সেট বাগান করার যন্ত্রপাতি। মরচে পড়া।'

'এক সেট...বাগান...করার...যন্ত্রপাতি...'

আরও এক ঘন্টা কাজ চললো। ক্লান্ত হয়ে ওখানে ঘাসের ওপর বসে পড়লো কিশোর। মুসা শুয়েই পড়লো। রবিন বসলো ওদের পাশে। তার আবিষ্কারের কথা জানানোর জন্যে নোটবই বের করলো আবার। 'এই শোনো, মেসেজটার মানে বের করতে হবে না?'

'আমি আর আজ ওসবে নেই,' জোরে হাত ঝাড়লো মুসা। 'তোমরা পারলে করোগে। আমার একটা আঙুল নড়ানোরও ক্ষমতা নেই।'

'আমিও ঠিকমতো ভাবতে পারবো না এখন,' কিশোর বললো। 'যা করার কাল সকালে করবো।'

'কিন্তু কয়েকটা সূত্র পেয়েছি আমি,' বললো রবিন। 'অন্তত দুটো লাইনের সমাধান তো হবেই। মিলে যায়...'

'সূত্র?' বাতাসে খামচি মারলো মুসা। 'শব্দটাই শুনিনি কখনও।'

'আচ্ছা, এক কাজ করা যাক না,' মুসাকে বললো কিশোর। 'ওর কথাগুলো তো শুনতে পারি আমরা। তাতে কোনো কষ্ট হবে না। রবিন, বলো, শুনি।'

'হারিকেনের ওপর একটা লেখা পড়লাম দুপুরে। লিখেছে, হারিকেনের সব চেয়ে নিরাপদ জায়গা হলো ওটার কেন্দ্র। একেবারে শান্ত। অথচ ওই জায়গাকে কেন্দ্র করেই চারপাশে ঘন্টায় একশো মাইল বেগে বইতে থাকে ঝড়।'

'থামলে কেন? বলে যাও।'

হারিকেনের ওই কেন্দ্রকে বলা হয় আই, বাংলায় চোখ। কিছু বুঝলে? আই-এর উচ্চারণ 'আই', অর্থাৎ আমির মতো। এবং এই আই হলো মেসেজের পয়লা শব্দ।'

'আমি এখন পয়লা শব্দ যেটা শুনতে চাই, সেটা খাবার,' বিষণ্ণ ভঙ্গিতে পেটে হাত বোলালো মুসা।

'রবিন,' মুসার কথায় কান দিলো না কিশোর, সোজা হয়ে গেছে পিঠ। 'ঠিক বলেছো! আর কি জেনেছো?'

'বোম্যান। আগের দিনে ইংরেজ তীরন্দাজরা তীর বানাতো ইউ গাছ দিয়ে...'

'ইউ গাছ?' ফোড়ন কাটলো মুসা। 'গ্রীক দেবতারা দিয়ে যেতো নাকি? নামও তো শুনিনি।'

'ক'টা গাছের নামই বা তুমি জানো? ইউ হলো একজাতের চিরশ্যামল গাছ।

বানান, ওয়াই-ই-ডাবলিউ। উচ্চারণ ওয়াই-ও-ইউ দিয়ে তৈরি শব্দ ইউ-এর মতো।'

'ইউ, মানে তুমি,' বিড়বিড় করলো কিশোর। হাতের তালুতে চাপড় মারলো সে। 'রবিন, ঠিকই বলেছো। আরেকটা শব্দ পাওয়া গেল। চলো, হেডকোয়ার্টারে। খাবার রেডি হতে দেরি আছে। ততোক্ষণে মানেগুলো বের করে ফেলি।'

'কাল করলে হতো না?' মিনমিন করে বললো মুসা। কিন্তু কিশোর আর রবিন রওনা হতেই সে-ও চললো পিছু পিছু।

পাঁচ মিনিট পর ডেস্ক ঘিরে বসলো তিন গোয়েন্দা।

'হ্যাঁ, তাহলে কি পাওয়া গেল?' শুরু করলো কিশোর। 'প্রথম লাইনঃ ইট'স কোয়ায়েট দেয়ার ঈভ্‌ন্ ইন আ হারিকেন। ধরলাম এই লাইন দিয়ে "আই" বোঝানো হয়েছে।' শব্দটা লিখে নিলো একটা কাগজে। 'দ্বিতীয় লাইনঃ জাস্ট আ ওয়ার্ড অভ অ্যাডভাইস, পোলাইটলি গিভেন। পরামর্শ বলতে চেয়েছে।' কাগজে লিখলো ইংরেজিতে, সাজেশন। 'এখন তৃতীয় লাইনের "ওল্ড ইংলিশ বোম্যান লাভড ইট" দিয়ে যদি হয় "ইউ"...' প্রথম দুটো শব্দের পাশাপাশি লিখলো এই শব্দটাও। 'তাহলে হলোঃ আই সাজেশন ইউ...নাহ্, হলো না। তার চেয়ে বলিঃ আই সাজেস্ট ইউ...'

'আই সাজেস্ট ইউ,' চেঁচিয়ে উঠলো মুসা। ক্লান্তি আর ক্ষুধার কথা ভুলে গেছে বেমালুম, 'হচ্ছে, কিশোর, হচ্ছে! খাইছে, পরের শব্দটা কি?'

'বিগার দ্যান আ রেইনড্রপ; স্মলার দ্যান অ্যান ওশন। জলরাশি বোঝাতে চেয়েছে মনে হয়। জলরাশি তো কত রকমই আছে; নদী-নালা খাল-বিল, পুকুর, হ্রদ, সাগর...'

'দাঁড়াও, দাঁড়াও,' হাত তুললো রবিন। 'বলেছে, বৃষ্টির ফোঁটার চেয়ে বড়, মহাসাগরের চেয়ে ছোট, সাগরই ধরে নিলাম। কি দাঁড়ালো? সাগর। সী। এস-ই-এ, কিন্তু উচ্চারণ এস-ডাবল-ই, সী-এর মতো...'

'সী, মানে দেখা,' বলতে বলতে শব্দটা লিখে নিলো কিশোর।

'এখন পাঁচ নম্বর,' রবিন বললো। 'আয়্যাম ফোর। হাউ ওল্ড আর ইউ? হ্যাঁ, এটা বেশ কঠিন। কি বোঝাতে চেয়েছে?'

'আমার বয়েস চার। তোমার কতো?'

'এটা তো বাংলা মানে হলো। কিন্তু ইংরেজি শব্দটা কি?'

'ওই আগের লাইনগুলোর মতোই ঘুরিয়ে বলেছে। বর্ণমালার চার নম্বর অক্ষরটার কথা বলেনি তো?'

'চার নম্বরটা কি?' উত্তেজিত কণ্ঠে বললো মুসা। বেশ মজা পাচ্ছে এখন।

'ডি। তাতে কি?'

'তাতে? অনেকে ডি-এর উচ্চারণ দি-এর মতো করে। যদি ধরি টি-এইচ-ই, দি, বা দা, বা দ্য,' লিখে ফেললো শব্দটা, 'তাহলে মেলে। আর মাত্র একটা শব্দ বের করতে পারলেই···ইট সিটস অন আ শেলফ লাইক আ ওয়েল-ফেড-এলফ।' কি বোঝা যায়?' দুই সহকারীর দিকে তাকালো গোয়েন্দাপ্রধান।

'ই-এল-এফ, এল্‌ফ্‌ মানে তো হলো একজাতের ভূত,' রবিন বললো।

'শেলফে ভূতের মতো কি বসে থাকে?' মুসার প্রশ্ন। 'ছারপোকা? তেলাপোকা? টিকটিকি···'

এল্‌ফ্‌ শব্দটাও ব্যবহার করেছে দ্বিধায় ফেলার জন্যে,' বললো কিশোর। 'রবিন, লাইব্রেরিতে শেলফের দিকে তাকালেই কি চোখে পড়ে? এল্‌ফের মতো বেঁটে মোটা মোটা ভূত···'

'মোটা মোটা বই!' উত্তেজনায় লাফ দিয়ে টুল থেকে উঠে পড়লো রবিন।

'হ্যাঁ, বই।'

'আর ওয়েল-ফেড, মানে পেট-পুরে-খাওয়া বলে বোঝাতে চেয়েছে অক্ষরে বোঝাই···ঠিক, বই-ই। আর কোনো সন্দেহ নেই।'

শব্দটা লিখে নিয়ে বললো কিশোর, 'তাহলে, ছয়টা শব্দ দিয়ে একটা পুরো লাইন হলো। আই সাজেস্ট ইউ সী দা বুক।'

'বাহ্‌, চমৎকার,' চুটকি বাজালো মুসা। 'খুব সহজ এর মানে। বইতে কিছু দেখার পরামর্শ দিচ্ছে। কিন্তু কি দেখবো? কোন বইতে দেখবো? আর দেখার পর ওটা দিয়ে কি করবো?'

'জানা যাবে। আরও দুটো মেসেজ আছে। ওগুলোর মানে বের করতে পারলেই···'

'কিশোওর! মুসাআ!' বাইরে থেকে ডাক শোনা গেল মেরিচাচীর। 'এইমাত্র দেখলাম এখানে···কোথায় গিয়ে ঢুকলি?'

'দূর, এতো তাড়াতাড়ি সেরে ফেললো?' বিরক্ত কণ্ঠে বললো কিশোর। অনিচ্ছা সত্ত্বেও উঠে দাঁড়ালো। 'আজ আর হচ্ছে না। কাল সকালে চেষ্টা করবো। চলো।'

চোদ্দ

খেতে খেতে আলোচনা চললো।

'বইটা কি বই?' একই প্রশ্ন আবার করলো মুসা। 'বাইবেল?'

'মনে হয় না,' মাথা নাড়লো কিশোর। বড় একটা মাংসের বড়া নিজের প্লেটে তুলে নিয়ে ছুরি দিয়ে কাটতে কাটতে বললো, 'আন্দাজে কিছু বলে লাভ নেই। কাল অন্য মেসেজগুলোর মানে বের করতে পারলেই...'

'কী বলছিস তোরা?' মুখ তুললেন রাশেদ পাশা। 'নতুন কোনো কেস পেয়েছিস নাকি?'

'কতগুলো অদ্ভুত মেসেজ পেয়েছি, চাচা। তোমার আনা ওই চেঁচানো ঘড়িটা দিয়েই শুরু। একটা মেসেজের মানে অবশ্য বের করে ফেলেছি...'

'এই বকবক না করে চুপচাপ খা তো!' ধমক লাগালেন মেরিচাচী। 'এই বেশি ভেবে ভেবেই অকালে পাগল হবি। কতোবার বলেছি, এতো ভাববি না। সারা দিন গতর খাটাবি, পেট ভরে খাবি, রাতে নাক ডেকে ঘুমাবি। শরীর-মন দুটোই ভালো থাকবে, বাঁচবিও বেশি দিন।' বড় করে এক টুকরো কেক কেটে মুসার পাতে দিতে দিতে বললেন, 'এই ছেলেটাই ভালো। খেতে পারে, খাটতেও পারে, কথা বলে কম...'

হেসে ফেললো কিশোর। 'তা ঠিক। বেশি খেলে ঘুম তো আসবেই। এই এখন আমার যেমন আসছে। আজ মেরে ফেলেছো, চাচী। সারা শরীর ব্যথা হয়ে গেছে।'

'আরে না, কি যে বলো?' মেরিচাচীর পক্ষ নিলো মুসা। 'বেশি খেলে ঘুম আসবে কেন?' বলতে না বলতেই মস্ত এক হাই তুললো সে।

রবিন আর রাশেদ পাশাও হাসতে শুরু করলেন। চেষ্টা করেও গম্ভীর হয়ে থাকতে পারলেন না মেরিচাচী।

খাওয়ার পর বারান্দায় বেরোলো তিন গোয়েন্দা।

'আবার যাবে নাকি হেডকোয়ার্টারে?' রবিন জিজ্ঞেস করলো।

'না, আজ আর না,' বললো কিশোর। 'কাল সকালে।'

বিদায় নিয়ে সাইকেলে চাপলো মুসা আর রবিন। রওনা হলো যার যার বাড়ি। দুটো ব্লক একসাথে এসে আলাদা হয়ে দু'জনে চললো দু'দিকে। খেয়াল করলো, ইয়ার্ডের গেট থেকেই ওদের পিছু নিয়েছিলো একটা ছোট ডেলিভারি ভ্যান। এখন অনুসরণ করছে রবিনকে।

দুই বন্ধুকে বিদায় দিয়ে কিশোর ঢুকেছে রান্নাঘরে। টেবিল সাফ করে বাসন-পেয়ালা ধুতে সাহায্য করেছে চাচীকে। একের পর এক হাই তুলছে।

দেখে মেরিচাচী বললেন, 'যা, তুই ঘুমোতে যা। আমি একাই পারবো।'

সোজা নিজের ঘরে এসে কাপড় ছেড়ে শুয়ে পড়লো কিশোর। ভেবেছিলো, শোয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়বে। এতো ক্লান্তিতেও ঘুম এলো না। মনে এসে ভিড়

জমালো হাজারো ভাবনা। কি আছে মেসেজগুলোতে?

আই সাজেস্ট ইউ সী দা বুক। কি বই? দ্বিতীয় মেসেজে কি আছে জবাবটা? ভাবনা যতো বাড়ছে, দূর হয়ে যাচ্ছে ঘুম। না, হবে না। দ্বিতীয় মেসেজটার সমাধান না করে ঘুমোতে পারবে না। উঠে বসলো সে।

আবার কাপড় পরে নেমে এলো নিচতলায়। চাচা-চাচী টেলিভিশন দেখছিলেন, অবাক হয়ে তাকালেন।

'কি-রে, কিশোর,' মেরিচাচী জিজ্ঞেস করলেন। 'ঘুমোসনি?'

'ঘুম আসছে না। কতগুলো বাজে ভাবনা ঢুকেছে মাথায়। জঞ্জালের মধ্যে ফেলে দিয়ে আসি ওগুলো। নইলে ঘুমোতে পারবো না।'

'তোর মাথা সত্যি খারাপ হয়ে গেছে…'

মেরিচাচীর কথা শেষ হওয়ার আগেই বেরিয়ে এলো কিশোর। বারান্দা থেকে নেমে রওনা হলো ওয়ার্কশপের দিকে। মেইন গেট বন্ধ। চলে এলো বেড়ার কাছে। একটা বিশেষ জায়গায় আঙুলের চাপ দিতেই নিঃশব্দে উঠে গেল দুটো সবুজ বোর্ড। হেডকোয়ার্টারে ঢোকার অনেকগুলো গোপন পথের এটা আরেকটা, সবুজ ফটক এক। বেরিয়ে পড়েছে সরু প্রবেশ পথ। ওখান দিয়ে ঢুকলো ওয়ার্কশপে। তারপর দুই সুড়ঙ্গের মুখের ঢাকনা সরিয়ে পাইপের ভেতর দিয়ে চলে এলো মোবাইল হোমে। অফিসে ঢুকলো।

মাথার ওপরের আলোটা জ্বেলে দিয়ে ডেস্কের ড্রয়ার থেকে বের করলো মেসেজগুলো। সে আর মুসা গিয়ে মিস্টার হিরাম বারকেনের কাছ থেকে যেটা এনেছে, সেটা নিয়ে বসলো।

বার বার পড়লো লেখাগুলো। সেই সাথে চলেছে গভীর ভাবনা। ধীরে ধীরে আসতে আরম্ভ করেছে ধারণাগুলো। প্রথম মেসেজটা সমাধান করতে পারায়, দ্বিতীয়টা সহজ হয়ে গেল। সঠিক পথ দেখালো ওকে প্রথমটা-ই।

প্রথম লাইনের শুরুতে একটা ফুল নেয়ার জন্যে বলা হচ্ছে। কাগজে লিখলো সেঃ টেইক ওয়ান লিলি। স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো লেখাটার দিকে। এলিকে মেরে ফেলতে বলা হয়েছে। কিভাবে? হঠাৎ বুঝে ফেললো। ওয়ান লিলি-র ওয়ান-এর প্রথম দুটো অক্ষর আর লিলি-র শেষ দুটো অক্ষর বাদ দিলেই হয়ে যায় ই-এল-আই, এলি। এলিকে মারতে বলা হয়েছে। দুটো শব্দের মাঝের তিনটে অক্ষর কেটে দিলো সে। বাকি চারটে অক্ষর একসাথে করতেই হয়ে গেল 'ওনলি'।

'ওনলি!' একা একাই চেঁচিয়ে উঠলো কিশোর। 'পেয়েছি! এবার দ্বিতীয় লাইন। বলছেঃ পজিটিভলি নাম্বার ওয়ান।'

প্রথম মেসেজটায় আয়্যাম ফোর বলে 'ডি' বুঝিয়েছে। এটাতেও হয়তো ওয়ান

বলে 'আ' বোঝাতে চেয়েছে। ওনলির পাশে লিখলো আ। তার মনে হলো, তৃতীয় লাইনে 'ব্রুম' শব্দটার ওপর জোর দেয়া হয়েছে। কারণ, ঝাড়ু নিয়ে মৌমাছি তাড়াতে বলা হয়েছে। তারমানে ঝাড়ুটাই এখানে প্রধান। 'বী' মানে মৌমাছি, ইংরেজি দ্বিতীয় অক্ষরের উচ্চারণও 'বী'। বী-টাকেই তাড়াতে বলা হয়েছে। ব্রুম থেকে বী বাদ দিলে হলো 'রুম'।

ভীষণ উত্তেজিত হয়ে উঠেছে কিশোর। অনর্গল কথা বলছে নিজের সঙ্গে। জোরে জোরে। একা গভীর মনোযোগের কাজ করার সময় এরকম করে মাঝে মাঝে।

'এরপর আসছে,' বললো সে। 'হোয়াট ইউ ডু উইদ ক্লথস, অলমোস্ট। কাপড় দিয়ে কি করি আমরা? পরি। পরা ইংরেজি, ওয়্যার। বানান, ডাবলিউ-ই-এ আর। ওনলি আ রুম-এর সঙ্গে ওয়্যার মেলে না। তাহলে কি মেলে? আরেকটা ওয়্যার, কিংবা হোয়্যার। উচ্চারণ প্রায় একই, কিন্তু বানান আর মানে আলাদা।' লিখে ফেললো প্রথম তিনটে শব্দের পাশেঃ ডাবলিউ-এইচ-ই-আর-ঈ। বললো, 'তাহলে দাঁড়ালো; ওনলি আ রুম হোয়্যার···হ্যাঁ, পরিষ্কার হচ্ছে আস্তে আস্তে।'

পাঁচ নম্বর লাইনের মানে বের করা এতো সহজ হলো না। লাইনটার মানে, মা-ও নয়, বোন-ও নয়, ভাই-ও নয়, বাবা হতে পারে। ফাদার বসালে কিছু হয় না। 'ড্যাড', 'পপ' বসিয়েও হলো না। পরিবারের প্রধান যদি ধরা হয় ফাদারকে? হেড অভ দা ফ্যামিলি? নাহ্, হচ্ছে না।

নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটতে শুরু করলো সে। কি বলতে চাইছে? ফাদার ক্রিসমাস? না। ফাদার টাইম? অ্যাঁ, ফাদার টাইম! ঘড়ি নিয়ে কারবার যখন··· ঠিক, ফাদার টাইম!

দ্রুত লিখে ফেললো ওনলি আ রুম হোয়্যার-এর পাশে ফাদার টাইম। বাকি রইলো মাত্র একটা লাইন। ফাদার টাইম, অর্থাৎ বাবা ঘড়ি কি করে? সময় দেয়। আর কি করে। শব্দ করে। কিভাবে? মেকানিক্যাল হলে টিকটিক, ইলেকট্রিকে চললে 'গুঞ্জন'। না, ঠিক গুঞ্জনও বলা যায় না। আসলে শব্দটা সঠিক ভাবে বোঝানোর কোনো উপায় নেই। সেকথা বলাও হয়েছে, অলমোস্ট, নট কোয়াইট। তাহলে, গুঞ্জন ইংরেজি হলো হামস। লিখে ফেললো শব্দটা, হামস।

পুরো লাইনটা হলোঃ ওনলি আ রুম হোয়্যার ফাদার টাইমস হামস।

'হ্যাঁ, ঠিক আছে,' আপনমনে মাথা দোলালো কিশোর। 'শুধু একটা ঘর, যেখানে বাবা ঘড়ি গুঞ্জন করে। কথা হলো, কোথায় গুঞ্জন করে?' ওই মুহূর্তে একটা ঘরের কথাই মনে হলো তার। মিস্টার ক্লকের সেই সাউণ্ডপ্রুফ ঘরটা, যেখানে অসংখ্য ঘড়ি রয়েছে। তবে মেসেজ থেকে বোঝা গেল না, কোন বইয়ের

কথা বলা হয়েছে। যাবে, পাওয়া যাবে, নিজেকে আশ্বস্ত করলো সে। ছেঁড়া মেসেজটা বের করলো। নম্বরগুলোর দিকে তাকিয়ে ভাবলো কিছুক্ষণ। প্রথম লাইনে রয়েছেঃ ৩-২৭৪-৩৬৫-১৯৪৮-১২৭-১১১৫-৯

কি বোঝাতে চায়? বইটার ব্যাপারে কিছু? কোনো বিশেষ বইয়ের সাহায্যে কোড মেসেজ তৈরি করা যুদ্ধের সময় বেশ জনপ্রিয় ছিলো, এখনও গুপ্তচর মহলে এর ব্যবহার আছে। বইয়ের পাতা থেকে শব্দ বাছাই করে লাইন তৈরি করে প্রেরক। কোন পাতার কোন লাইনের কোন শব্দটি নিয়েছে, গুনে নম্বর লিখে দেয়। প্রাপক সেটা খুঁজে বের করে বুঝে নেয় মেসেজের মানে। সহজ কোড, কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই নিরাপদ। কারণ, অন্য কারও হাতে পড়লেও তার বোঝার উপায় নেই, কোন বই থেকে নেয়া হয়েছে। সেটা জানে শুধু প্রেরক আর প্রাপক।

সুতরাং কিশোরের জন্যেও বইয়ের নাম জানাটা খুব জরুরী। কিভাবে জানা যাবে? আর বইটা পেলেও কি আধখানা মেসেজ থেকে পুরো লাইনটা বোঝা সম্ভব?

বড় করে হাই তুললো সে। ঘুম পেয়েছে। থাক, আজ রাতের জন্যে যথেষ্ট হয়েছে। কাল সকালে উঠে আবার চেষ্টা করা যাবে, ভেবে, মেসেজগুলো আবার ড্রয়ারে ঢুকিয়ে রেখে উঠে দাঁড়ালো কিশোর। ট্র্যাপডোরের দিকে এগোতে যাবে, এই সময় বাজলো টেলিফোন।

এতো রাতে কে! অবাক হলো সে। তুলে নিলো রিসিভার। 'তিন গোয়েন্দা। কিশোর পাশা বলছি।'

অন্য পাশের কণ্ঠটা শুনে স্থির হয়ে গেল সে। জমে গেছে যেন বরফের মতো।

পনেরো

এগিয়ে চলেছে রবিন। পেছনে এঞ্জিনের শব্দ শুনছে, কিন্তু ফিরে তাকানোর কথা ভাবলো না একবারও। রাস্তায় গাড়ি থাকতেই পারে।

এক জায়গায় রাস্তার ধারে কোনো বাড়ি-ঘর নেই, খালি জায়গা। ঠিক ওখানটায় এসে পেছন থেকে শাঁ করে সামনে চলে এলো ভ্যানটা, রবিনের পথরোধ করে ঘ্যাঁচ করে ব্রেক কষলো।

লাফিয়ে বেরোলো এক কিশোর। 'রবিন!'

অবাক হয়ে ব্রেক চাপলো রবিন। টিম! উত্তেজিত। সাইকেল থেকে নেমে ঠেলে নিয়ে তার দিকে এগোলো রবিন। 'কি ব্যাপার, টিম? কিছু হয়েছে?'

পেছনের দরজা খুলে লাফ দিয়ে নামলো ছোটখাটো একজন মানুষ। 'হয়নি, তবে আমাদের কথা না শুনলে অনেক কিছুই হবে,' কড়া গলায় বললো সে।

'খবরদার, পালানোর চেষ্টা কোরো না।'

'সরি, রবিন,' অস্বস্তিতে গলা কাঁপছে টিমের। 'তোমার কাছে নিয়ে আসতে বললো ওরা। মা'কে ঘরে তালা আটকে রেখে এসেছে।

'হয়েছে হয়েছে, অতো ব্যাখ্যা করতে হবে না,' ধমক দিলো লোকটা। 'এই, তোমার সাইকেল ছাড়ো। ওঠো গাড়িতে।'

চট করে চারপাশে চোখ বোলালো একবার রবিন। নির্জন পথ। সাহায্যের জন্যে যে ডাকবে, সে উপায় নেই। দৌড় দিয়েও সুবিধে করতে পারবে না। সহজেই ধরে ফেলবে তাকে।

হ্যাণ্ডেল ধরে সাইকেলটা কেড়ে নেয়া হলো তার কাছ থেকে। পিঠে জোরে এক ধাক্কা দিয়ে লোকটা বললো, 'দাঁড়িয়ে আছো কেন? জলদি ওঠো। টিম, তুমিও।'

গাড়িতে আলো নেই। অন্ধকারে উঠে বসলো রবিন। তার পাশে টিম। সাইকেলটা ভ্যানে তুলে দরজা বন্ধ করে তালা লাগিয়ে দিলো লোকটা। বন্দি হলো দুই কিশোর।

'আমাদের ক্ষতি করবে না বলেছে,' নিচু কণ্ঠে বললো টিম। 'ওরা শুধু তথ্য চায়। ঘড়ি আর মেসেজগুলো সম্পর্কে। আমি তেমন কিছু বলতে পারিনি, তাই তোমাদের কাছে নিয়ে আসতে বাধ্য করলো। বললো, তোমাদের যে-কোনো একজনকে হলেই চলবে। ইয়ার্ডের ওপর অনেকক্ষণ থেকেই চোখ রাখছিলো। তুমি আর মুসা বেরোতেই পিছু নিলো।

মৃদু ঝাঁকুনি খেতে খেতে ছুটছে ভ্যান। গন্তব্য দু'জনের কাছেই অজানা।

'কারা ওরা?' জিজ্ঞেস করলো রবিন।

'একজন, লারমার। আরও দু'জন আছে। বেঁটে লোকটার নাম ডিংগো। আর লম্বা আরেকজন আছে, নাম মারকো।'

'ডিংগো আর মারকো! ওরা দু'জনই কাল কিশোরদেরকে ধরেছিলো। একটা মেসেজের অর্ধেকটা ছিঁড়ে রেখে দিয়েছে।'

'হ্যাঁ, ওরাই। ক'টা মেসেজ, মানে কী, জানতে চায়। মূল্যবান কোনো জিনিসের ইঙ্গিত রয়েছে মেসেজে। ওদের ধারণা, জিনিসটা কি, কোথায় লুকানো আছে জানি আমরা।'

'কে বললো আমরা জানি? কিশোরের অনুমান, দামী জিনিস আছে, ব্যস।'

'আজ বিকেলে ডিংগো আর মারকো এসেছে লারমারের সঙ্গে দেখা করতে। অনেকক্ষণ কথা বলেছে। তারপর এসে ধরলো আমাকে, যা যা জানি বলার জন্যে। বলতে বাধ্য করলো। সরি, রবিন, না বলে উপায় ছিলো না। খুব শয়তান লোক।

আমাকে মেরে ফেললেও বলতাম না, কিন্তু মার ওপর অত্যাচার করার ভয় দেখালো…'

'আরে না না, তোমার দুঃখিত হওয়ার কিছু নেই। আমি হলেও তা-ই করতাম। তোমার মা'কে তালা দিয়ে রেখেছে বললে না?'

'হ্যাঁ, আমরা যে বাড়িতে থাকি, মানে মিস্টার ক্লকের বাড়িতে। এরাও ক্লক ক্লকই করছিলো। আড়ি পেতে শুনেছি ওদের কথা। লারমার বললো, সে এই বাড়িতে উঠেছে গোপন জায়গা খুঁজতে। এমন একটা জায়গা, যেখানে দামী জিনিস লুকানো থাকতে পারে। রবিন, প্লীজ, তুমি যা জানো বলে দিও। নইলে আমার মা'কে ছাড়বে না। বলবে তো?'

'মুশকিল কি জানো, আমি নিজেই কিছু জানি না,' সত্যি কথাই বললো রবিন। 'একটা মেসেজের সমাধান করেছি। তাতে বলা হয়েছে বইটা দেখতে। কোন বই, জানি না।'

'বলতে না পারলে খুব রেগে যাবে ওরা,' শঙ্কিত হয়ে উঠলো টিম। 'ওরা ধরেই নিয়েছে, তোমরা মেসেজের সমাধান করে ফেলেছো। তোমাদের সম্পর্কে খোঁজখবর নিয়েছে। জেনেছে, আগেও অনেক জটিল রহস্যের সমাধান তোমরা করেছো।'

'সমাধান আসলে কিশোর করেছে,' ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেললো রবিন। 'ওদেরকে বিশ্বাস করাতে হবে, সত্যিই আমি কিছু জানি না। তাহলেই হয়তো ছেড়ে দেবে। আটকে রেখে তো লাভ নেই, অযথা ঝামেলা বাড়াতে চাইবে না ওরা।'

ওই আশা মনে নিয়েই নীরব হলো দু'জনে। ভ্যান চলেছে। মোড় নিচ্ছে মাঝে মাঝে। বুঝতে পারলো না ওরা যাচ্ছে কোনদিকে। দীর্ঘ কয়েক যুগ পরে যেন অবশেষে থামলো গাড়ি। বড় একটা দরজা খোলার শব্দ কানে এলো। ঝনঝন করে উঠে গেল স্প্রিঙ লাগানো দরজা, বোধহয় কোনো গ্যারেজের। আবার চললো ভ্যান, কয়েক ফুট এগিয়ে থামলো। পেছনে দরজা নামিয়ে দেয়ার শব্দ। ভ্যানের দরজার তালা খুললো খাটো লোকটা, ডিংগো।

'নামো, দু'জনেই,' আদেশ দিলো সে। 'ভালো চাইলে চুপচাপ থাকবে। নইলে কপালে দুঃখ আছে।'

রবিন আগে নামলো, পেছনে টিম। কংক্রীটের মেঝে। চারপাশে চোখ বোলালো রবিন। গ্যারেজই, বড় একটা ডাবল-গ্যারেজ। দরজা নামানো। দু'পাশে দুটো জানালা, পর্দা টানা, পাল্লা বন্ধ কিনা বোঝা গেল না। মাথার ওপরে একটা বাল্ব জ্বলছে। আর কোনো গাড়ি নেই। একটা গাড়িই বোধহয় রাখা হয়, কারণ

আরেকটা গাড়ির জায়গাকে ওয়ার্কশপ হিসেবে ব্যবহার করে—জিনিসপত্র দেখেই বোঝা যাচ্ছে। একটা ওয়ার্কবেঞ্চ, একটা ব্লোল্যাম্প আর কিছু যন্ত্রপাতি আছে।

বেঞ্চের পাশে কয়েকটা চেয়ার। সেগুলো দেখিয়ে ডিংগো বললো, 'যাও, বসো।' মুখে কুৎসিত হাসি। 'আরামেই বসো, কষ্ট করার দরকার নেই।'

রবিন আর টিম বসলো।

নগ্ন আলোয় ফ্যাকাসে লাগছে ল্যারমারের লম্বা মুখটা, চোখ আর নাকের নিচে অদ্ভুত ছায়া কেমন যেন কিম্ভুত করে তুলেছে চেহারাটাকে। এগিয়ে এলো দুই কদম। তার পেছনে ভ্যান থেকে নেমে হাসিমুখে এগোলো লম্বা লোকটা, মারকো।

'দড়ি দিয়ে শক্ত করে বাঁধো,' ডিংগোকে আদেশ দিলো ল্যারমার। 'তারপর কথা।'

বেঞ্চের ওপর থেকে দড়ি এনে রবিন আর টিমকে চেয়ারের সঙ্গে পেঁচিয়ে বাঁধলো ডিংগো।

একটা চেয়ার টেনে ওদের মুখোমুখি বসলো ল্যারমার। সাগর কলার মতো মোটা এক সিগার ধরিয়ে আরাম করে টান দিলো কয়েকটা। মুখ-ভর্তি ধোঁয়া নিয়ে ফুঁ দিয়ে ছাড়লো দুই বন্দির মুখে। ফিকফিক করে হাসলো শয়তানী হাসি। 'তামাক পছন্দ না, না? তোমার বয়েসে আমি অবশ্য খুবই পছন্দ করতাম। কি স্বাদ যে মিস করছো, বুঝতে পারছো না।'

'স্বাদের দরকার নেই আমার,' গম্ভীর হয়ে বললো রবিন। 'ফুসফুস কালি করার কোনো ইচ্ছে নেই।'

'ভালো কথা। বোঝা গেল, নিজের জন্যে মায়াদরদ আছে। প্রশ্নের জবাব তাহলে সরাসরিই দেবে আশা করি।' সিগারে আরেকটা লম্বা টান দিলো সে। 'হ্যাঁ, টিম নিশ্চয় সব জানিয়েছে?'

'বলেছে, মেসেজের মানে আপনারা জানতে চান,' গলা কাঁপছে রবিনের।

'হ্যাঁ, ঠিকই বলেছে। দামী কিছু জিনিস কোথাও লুকানো আছে। মেসেজে আছে ইঙ্গিত। জানতে চাই, সেটা কোথায়।' ভুরু কুঁচকে বিকট করে তুললো চেহারাটা। বদলে গেল কণ্ঠস্বর, 'মেসেজগুলো কিভাবে পেয়েছো, জানি। চেঁচানো ঘড়িটা পেয়ে, হ্যারিসন ক্লকের কথা জেনে গেছো তোমরা। ঠিক গিয়ে খুঁজে বের করেছো হেনরি মিলারকে, তার স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলে এসেছো। আরও দু'জনের কাছ থেকে দু'টো মেসেজ এনেছো।' রবিনের চোখে চোখে তাকালো। 'এখন বলে ফেলো, কি লেখা আছে ওগুলোতে।'

'আর হ্যাঁ,' রবিন জবাব দেয়ার আগেই মারকো বললো, 'আমি জানতে চাই, হেনরি মিলারের কাছে ওই চেঁচানো ঘড়িটা পাঠানোরই বা কি অর্থ? ভিন্ন ভিন্ন

লোকের কাছে কেন পাঠিয়েছে মেসেজগুলো? কি খেলায় মেতেছে হ্যারিসন ক্রুক?'

'ক্রুক কি খেলায় মেতেছে, সেটা ও জানবে কি করে?' ডিংগো বললো। 'ক্রুকের পেটে খালি শয়তানী বুদ্ধি, কথা পর্যন্ত সোজা করে বলে না। কেন করেছে এসব, একমাত্র ও-ই বলতে পারবে। আর যেহেতু ওকে পাওয়া যাচ্ছে না...'

'জানাও যাবে না,' বাক্যটা শেষ করে দিলো লারমার। 'ওসব জানার দরকারও নেই আমাদের। মাল কোথায় লুকানো আছে, এটা জানলেই আমি খুশি। নাও খোকা, শুরু করো। মেসেজে কি বলেছে?'

জোরে ঢোক গিললো রবিন। 'ইয়ে, একটা মেসেজের মানে বের করেছি আমরা। লিখেছেঃ আই সাজেস্ট ইউ সী দা বুক। ব্যস। এই একটা লাইনই।'

'আই সাজেস্ট ইউ সী দা বুক!' ঠোঁট কামড়ালো লারমার। 'কি বই?'

'জানি না, বলেনি।'

'দ্বিতীয়টায় নিশ্চয় বলেছে,' অধৈর্য হয়ে উঠছে লারমার। 'কি লিখেছে?'

'জানি না,' আবার ঢোক গিললো রবিন। 'মানে করার সময়ই পাইনি। ক্লান্ত ছিলাম। আগামী কাল করবো ভেবেছি।'

'দেখো, ছেলে!' কঠোর কণ্ঠে বললো লারমার, 'মিথ্যে বলো না! দ্বিতীয় মেসেজে কি লিখেছে জলদি বলো!'

'সত্যি বলছি আমি জানি না। ওটা নিয়ে ভাবিইনি। কাল সকালের জন্যে রেখে দিয়েছি।'

'সত্যি কথাই বলছে মনে হয়,' মারকো বললো।

'হয়তো,' নিশ্চিত হতে পারছে না লারমার। 'বেশ, ধরে নিলাম, দ্বিতীয়টার মানে জানো না। তৃতীয়টার? ওটা তো জানো? ওই যে, শুধু নম্বর লেখা আছে যেটায়। অর্ধেকটা আমার কাছে, মারকো ছিঁড়ে রেখে দিয়েছিলো।' পকেট থেকে ছেঁড়া কাগজটা বের করে রবিনের নাকের কাছে নাড়লো। 'কি মানে এসব নম্বরের?'

'আমি বলতে পারবো না,' মাথা নাড়লো রবিন। 'কিশোর হয়তো পারবে।'

ভীষণ হয়ে উঠলো লারমারের কুৎসিত চেহারা। তবে, নিশ্চিত হলো, রবিন মিথ্যে বলছে না।

'তার মানে আরও অপেক্ষা করতে হবে আমাদের,' মারকো বললো। 'সেটা করতে তো আপত্তি ছিলো না, কিন্তু অসুবিধে আছে। ছেলেগুলো বুঝে ফেললেই পুলিশের কাছে যাবে, তাদের নিয়ে যাবে লুকানোর জায়গাটায়। আমাদের আর কিছুই করার থাকবে না তখন। কাজেই দেরি করা যাচ্ছে না। তো, কী করা?'

'কি আর?' খেপা কুকুরের মতো ঘড়ঘড় করে উঠলো লারমার। 'এখুনি অন্য

'মেসেজগুলো নিয়ে নিতে হবে। কয়েকটা বাচ্চা ছেলে মানে বের করতে পারলে আমরা কেন পারবো না? ওগুলো লাগবে। এই ছেলে, কার কাছে মেসেজগুলো?'

'কিশোরের কাছে,' জবাব দিলো রবিন। 'ও এখন ঘুমোচ্ছে।'

'ঘুমোলে চলবে না, জাগতে হবে। ওকে ফোন করে বলো, মেসেজগুলো নিয়ে যেন এখানে চলে আসে। আমরা সবাই মিলে সমাধান করবো।'

'বললেই কি আসবে?' প্রশ্ন তুললো মারকো।

'বন্ধুকে ভালোবাসে ও, তাই না?' রবিনের দিকে চেয়ে ভ্রূকুটি করলো লারমার। 'ওর কোনো ক্ষতি নিশ্চয় চায় না। আমরা বললে খুশি হয়েই মেসেজগুলো নিয়ে হাজির হবে। তুমি কি বলো, ছেলে?'

'আমি কি করে জানবো?' হতাশ হয়েছে রবিন। সে ভেবেছিলো, মেসেজের মানে জেনে না বললে তাদেরকে ছেড়ে দেবে লারমার। ছাড়লো তো না-ই, বরং কিশোরকে আনানোরও মতলব করেছে ব্যাটারা।

'আমি জানি,' লারমার বললো। 'সে আসবে। এক কাজ করো, প্রথমে তোমার বাড়িতে ফোন করো। বাবা-মা'কে জানিয়ে দাও, জরুরী কাজে আটকা পড়েছো, রাতে বাড়ি ফিরবে না। কিশোরের ওখানে থাকবে। চিন্তা যাতে না করে। তারপর ফোন করো তোমার কোঁকড়াচুলো বন্ধুকে। আমাদের নির্দেশ জানিয়ে দাও।'

'ডিংগো, ফোনটা দাও ওকে,' মারকো বললো। 'হাত খুলে দাও।'

ওয়ার্কবেঞ্চের ওপর রাখা যন্ত্রটা তুলে এনে রবিনের কোলে রাখলো ডিংগো। 'নাও, ধরো।'

'আমি পারবো না,' মরিয়া হয়ে বললো রবিন। 'কাউকে ফোন করবো না আমি। যা যা জানি সব বলেছি…এখন…এখন…' শুকনো ঠোঁট চাটলো সে। 'আবার এসব করতে বলছেন!'

'ডিংগো,' ইঙ্গিতে ওয়ার্কবেঞ্চটা দেখালো লারমার। ব্লোল্যাম্পটা জ্বেলে আমার হাতে দাও তো।'

কথামতো কাজ করলো ডিংগো।

ব্লোল্যাম্পটা শক্ত করে ধরলো লারমার। হিসহিস শব্দে জ্বলছে উজ্জ্বল হলুদ আগুনের শিখা। ধীরে ধীরে সামনে বাড়ালো ওটা সে। মুখে তাপ লাগছে রবিনের। চোখ বন্ধ করে ফেললো।

'কি হলো? রিসিভার তোলো,' বললো লারমার।

'বাড়িতে নাহয় বললাম,' মিনমিন করে বললো রবিন। 'কিন্তু কিশোরকে? ওকে কোথায় পাবো?'

'হেডকোয়ার্টারে।'

'বললাম না, ও এখন ঘরে ঘুমোচ্ছে।'

'তাহলে ঘরেও করবে। আর একটি কথাও নয়। তোলো, রিসিভার তোলো পাঁচ সেকেণ্ড সময় দিচ্ছি। তারপর প্রথমে চুলে লাগাবো আগুন।'

ষোলো

'কিশোর, মহাবিপদে পড়েছি!' টেলিফোনে ভেসে এলো রবিনের কণ্ঠ। 'তোমার সাহায্য লাগবে!'

'হয়েছে কি?' উদ্বিগ্ন হলো কিশোর।

'মিস্টার লারমার, মারকো আর ডিংগো ধরে নিয়ে এসেছে আমাকে। টিমকেও।'

কিভাবে কি ঘটেছে, জানালো রবিন। শেষে বললো, 'মা'কে বলে দিয়েছি, আজ রাতে তোমার সঙ্গে থাকবো। মিস্টার লারমারের ইচ্ছে, তুমি মেরিচাচীকে বলে আসো, আমার সঙ্গে থাকবে। কেউ কিছু সন্দেহ যেন করতে না পারে। হুমকি দিচ্ছেন, কথামতো কাজ না করলে নাকি খুব খারাপ হবে আমাদের।' থামলো এক মুহূর্ত। 'তবে, মেসেজগুলো যদি আনো, আর কাউকে কিছু না বলো, তাহলে ছেড়ে দেবেন কথা দিয়েছেন। কিশোর, কি ভাবছো? কথা শুনবে? আমার পরামর্শ, শুনো না, পুলিশকে...'

চটাস করে চড় পড়লো। আঁউ করে উঠলো রবিন। ভেসে এলো লারমারের কর্কশ কণ্ঠ, 'শোনো ছেলে, বন্ধুকে বাঁচাতে চাইলে, তার অঙ্গহানী করাতে না চাইলে, যা বলেছি করবে। মেসেজগুলো নিয়ে জাঙ্কইয়ার্ডের গেটে দাঁড়িয়ে থাকবে। ঠিক আধ ঘন্টা সময় পাবে। ইতিমধ্যে পৌছে যাবে আমার ভ্যান। তুলে আনবে তোমাকে। খবরদার, কাউকে কিচ্ছু বলতে পারবে না। বুঝেছো? কথা না শুনলে প্রথমে তোমার বন্ধুর দুটো কাটা আঙুল উপহার পাবে, তারপর একটা কান, তারপর...'

'ঠিক আছে, মিস্টার লারমার,' বাধা দিয়ে বললো কিশোর। 'আমি আসছি। গেটে দাঁড়িয়ে থাকবো। গাড়ি পাঠান।'

'এই তো বুদ্ধিমান ছেলে।' কিশোরের মনে হলো আনন্দে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করলো একটা শুয়োর। লাইন কেটে দিয়ে নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটলো একবার। মুসাকে ডাকবে? না, থাক। অযথা তাকে এসবে জড়িয়ে লাভ নেই। লারমারকে ঠিক বিশ্বাস করা যাচ্ছে না। কি করবে, বোঝার উপায় নেই। হয়তো মিথ্যে হুমকি দেয়নি। মেসেজগুলো চাইছে। দিয়ে দিলেই যদি ঝামেলা চুকে যায়, দেয়াই

উচিত। মানে তো জানা-ই হয়ে গেছে দুটোর।

তিনটে মেসেজই—ছেঁড়াটা সহ—গুছিয়ে শার্টের পকেটে নিলো কিশোর। ট্র্যাপডোরের দিকে এগোতে গিয়ে আবার থামলো। সাবধান হতে দোষ কি? ফিরে এসে একটা কাগজে নোট লিখলোঃ ঘড়ির ঘরে খোঁজ করো আমাদেরকে। তার স্থির বিশ্বাস, ওর ঘরেই রয়েছে সমস্ত রহস্যের চাবিকাঠি। কাগজটা পেপার ওয়েইট চাপা দিয়ে এসে নামলো দুই সুড়ঙ্গে।

হামাগুড়ি দিয়ে পাইপ বেয়ে চলে এলো মুখের কাছে। মুখ বের করে দেখলো আশপাশটা। কারও থাকার কথা নয় এখন এখানে, তবু দেখলো। ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় হুঁশিয়ার করছে তাকে। পাইপ থেকে বেরিয়ে হেঁটে গেল সবুজ ফটক এক-এর দিকে।

সবে পৌঁছেছে, খুলবে, এই সময় ছায়া থেকে বেরিয়ে এলো একটা ছায়ামূর্তি। জঞ্জালের সাথে মিশে ছিলো।

পাঁই করে ঘুরেই সুড়ঙ্গের দিকে দৌড় দিলো কিশোর। কিন্তু লোকটার সঙ্গে পারলো না। ছুটে এসে পেছন থেকে জাপটে ধরলো তাকে। মুখ চেপে ধরলো কঠিন থাবা, যেন লোহার সাঁড়াশি। কানের কাছে কথা বললো হাসি হাসি একটা কণ্ঠ, 'তারপর? আবার আমাদের দেখা হলো। এবং এইবার আমিই জিতবো।'

কথায় ফরাসী টান। চিনতে পারলো কিশোর। শোঁপা! ইউরোপের কুখ্যাত ইন্টারন্যাশনাল আর্ট থিফ। আরেকবার ওর সঙ্গে প্রতিযোগিতা হয়েছিলো তিন গোয়েন্দার, ওকে ভুলবে না কিশোর। তাকে আর মুসাকে আটকে ছিলো ভয়াবহ গোরস্থানে, প্রচণ্ড কুয়াশার মধ্যে, মনে পড়তে গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠলো।

'তাহলে,' আবার বললো শোঁপা, 'চিনতে পেরেছো। সেবারেই বুঝেছো, বেশি চালাকি পছন্দ করি না আমি। কিছুক্ষণের জন্যে ছাড়তে পারি এখন, কথা বলবো। চেঁচাতে পারবে না। চেঁচালে নিজেই ক্ষতি করবে। বিশ্বাস করো কথাটা।'

বিশ্বাস করলো কিশোর। কোনোমতে মাথা ঝাঁকালো।

মুখ থেকে হাত সরালো শোঁপা। তারা, আর দূর থেকে আসা ইলেকট্রিক বাল্বের আবছা আলোয় লোকটার মুখের আদল দেখতে পেলো কিশোর। হাসিটাও চেনা গেল।

'খুব অবাক হয়েছো না?' শোঁপা বললো। 'কেন, একবারও মনে পড়েনি আমার কথা? এক মিলিয়ন ডলারের চোরাই ছবি, অথচ শোঁপা তার কাছে থাকবে না, এটা কোনো কথা হলো?'

'চোরাই ছবি?' চমকে গেল কিশোর। 'সেটাই খুঁজছেন নাকি?'

'কেন, তুমি জানো না?' কণ্ঠেই প্রকাশ পেয়ে গেল, বিস্মিত হয়েছে শোঁপা।

'পাঁচটা চমৎকার ছবি, দশ লাখ ডলার দাম, বছর দুই আগে চুরি গিয়ে এখনও নিখোঁজ হয়ে আছে। সেগুলো খুঁজতেই এসেছি আমি। তুমি নিশ্চয় জানো, না জানার ভান করছো। নইলে কিসের তদন্ত করছো ক'দিন ধরে?'

'মিথ্যে বলবো না, একটা চেঁচানো ঘড়ির রহস্য ভেদের চেষ্টা করছি। কিছু সূত্র হাতে এসেছে। বুঝতে পারছিলাম, মূল্যবান কোনো জিনিসের সাথে এর সম্পর্ক আছে। কি জিনিস, জানতাম না।'

'ঘড়ি? হ্যাঁ, জিনিসটা আমাকেও অবাক করেছে। টুকরো টুকরো করে...'

'আপনি চুরি করেছেন? কাল আপনিই রবিন আর টিমকে তাড়া করেছিলেন?'

'আমিই করেছি। তোমাদের পেছনেও লোক লাগিয়েছিলাম, কিন্তু গাধাগুলো লেগে থাকতে পারলো না, হারিয়ে ফেললো। গাড়ি রেখে তোমার বন্ধুরা থানার ভেতরে ঢুকলো। এই সুযোগে নিয়ে গেছি ঘড়িটা। সমস্ত যন্ত্রপাতি খুলে ফেলেছি। কোনো সূত্র পেলাম না। আমি ভেবেছি, খোদাই করে কোথাও কিছু লেখা আছে। তুমি নিশ্চয় কিছু পেয়েছো। তোমার যা ব্রেন আর চোখ, নজর এড়াতেই পারে না। কি পেয়েছো?'

'আপনাকে কেন বলবো? জানেন, আমি চেঁচালে এখুনি ছুটে আসবে বোরিস আর রোভার। ওদের একজনের সঙ্গেই পারবেন না আপনি। ধরে থানায় নিয়ে যাওয়াটা কোনো ব্যাপারই না।'

শব্দ করে হাসলো শোঁপা। 'ভালো, খুব ভালো। তোমার মতো সাহসী ছেলেদের পছন্দ করি আমি। কিন্তু তুমিই বা কি করে ভাবলে, আমি একা এসেছি? ইচ্ছে করলে আমিও তোমাকে...যাকগে, হুমকি দিয়ে লাভ নেই। আমি তোমাকে একটা অফার দিচ্ছি, বিনিময়ে কিছু চাইবো। আমি তোমাকে সাহায্য করবো, তুমিও আমাকে করবে।'

'আমাকে কি সাহায্য করবেন?'

'ক্রুকের বাড়ির যে ছেলেটার সঙ্গে তোমার বন্ধুত্ব হয়েছে, টিমের কথা বলছি। ওর বাবা জেলে। তাকে নির্দোষ প্রমাণ করতে সাহায্য করবো তোমাকে। আমি ছবিগুলো নিয়ে যাবো, তুমি মানুষটাকে জেল থেকে বের করে আনবে। নাকি, রাজি নও?'

দ্রুত ভাবছে কিশোর। মাথা ঝাঁকালো। 'বেশ, করবো। যদি আপনি কথা রাখেন। আরও একটা কাজ করতে হবে আপনাকে।'

'কী?'

সব কথা খুলে বললো কিশোর। রবিন আর টিম এখন কোথায় কি অবস্থায় আছে, আধ ঘন্টার মধ্যে ভ্যান আসবে ইয়ার্ডের গেটে তাকে তুলে নেয়ার জন্যে,

নিয়ে যাবে লারমার, মারকো আর ডিংগো যেখানে দুই কিশোরকে আটকে রেখেছে, সেখানে।

ফরাসী ভাষায় কি যেন বললো শোঁপা। ইংরেজিতে বললো, 'ওই গাধাগুলো! এতোখানি এগিয়ে যাবে, ভাবিনি। ভেবেছিলাম, ওরা কিছু বোঝার আগেই ছবিগুলো বের করে নিয়ে হাওয়া হয়ে যাবো।'

'ওদের কথাও জানেন আপনি?' অবাক হয়ে বললো কিশোর।

'জানি না মানে! শুনলে অবাক হবে, আরও অনেক কিছু জানি আমি। দু'সপ্তা ধরে আছি এই শহরে, সূত্র খুঁজছি। তদন্তের নিজস্ব কায়দা আছে আমার। এখানকার অনেক চোর-ডাকাত আর অপরাধীর টেলিফোন লাইন টেপ করে রেখেছি আমি, ওদের গোপন আলোচনা শুনি। ঠিক আছে, তোমার বন্ধুদের মুক্তিরও ব্যবস্থা করবো। ছবিগুলো বের করে নিয়ে চলে যাবো আজ রাতেই। কাল এ-সময়ে থাকবো পাঁচ হাজার মাইল দূরে। হ্যাঁ, ওরা যেভাবে বলেছে, সেভাবেই কাজ করে যাও। গেটে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকো। গাড়ি এসে যেখানে নিয়ে যায়, যাও। লোকজন নিয়ে তোমাদের পেছনেই থাকবো আমি। কিচ্ছু ভেবো না, যা করার আমিই করবো।'

'কি করবেন?'

'সেটা তোমার জানার দরকার নেই।'

শোঁপাকে বিশ্বাস করা ছাড়া উপায় নেই। সবুজ ফটক এক দিয়ে বেরিয়ে ঘরের দিকে চললো কিশোর। চেঁচানো ঘড়ির ব্যাপারে জড়িয়ে পড়েছে বলে নিজেকেই গাল দিচ্ছে এখন। রবিন আর টিমকে মুক্ত করতে পারবে তো ফরাসীটা? পারবে, আশা করলো সে।

বসার ঘরে ঢুকে দেখলো, চাচা-চাচী তখনও টেলিভিশন দেখছেন। বললো, রবিন ফোন করেছে। রাতটা ওদের বাড়িতেই কাটাবে। এরকম মাঝে মাঝেই গিয়ে থাকে কিশোর। অমত করলেন না রাশেদ পাশা। মেরিচাচীও কিছু বললেন না। অনুমতি নিয়ে নিজের ঘরে চলে এলো সে। গরম জ্যাকেট পড়লো।

আবার নিচতলায় নেমে, চাচা-চাচীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাইরে বেরোলো কিশোর। গেটের দিকে এগোলো।

ওখানে তার জন্যে অপেক্ষা করছে শোঁপা। এগিয়ে এসে কিশোরের কাঁধে হাত রেখে বললো, 'একটুও চিন্তা কোরো না। সব ঠিক হয়ে যাবে। গাড়ি এলে সোজা উঠে পড়বে। ওদের যাতে কোনো সন্দেহ না হয়। বুঝেছো?'

বলে আর দাঁড়ালো না শোঁপা। ঘুরে হাঁটতে শুরু করলো। মিলিয়ে গেল অন্ধকারে। গাড়িটা কোথায়, দেখতে পেলো না কিশোর। ইয়ার্ডের আরেক পাশে

হয়তো লুকিয়ে রাখা হয়েছে।

দাঁড়িয়ে আছে কিশোর। অন্ধকার খুব বেশি। আর নীরব। কেঁপে উঠলো একবার সে, ঠাণ্ডায় নয়।

হেডলাইট দেখা গেল। ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে একটা ছোট ভ্যান। কিশোরের পাশে এসে দাঁড়ালো। ঝটকা দিয়ে খুললো দরজা। মুখ বের করলো ডিংগো।

'আছো,' খসখসে কণ্ঠস্বর। 'এসো, ওঠো।'

সতেরো

হলিউডের দিকে চলেছে গাড়ি। চালাচ্ছে মারকো। ডিংগো আর মারকোর মাঝে গাদাগাদি করে বসেছে কিশোর।

'মেসেজগুলো নিয়েছো তো?' একসময় জিজ্ঞেস করলো মারকো।

'নিয়েছি,' শান্ত কণ্ঠে জবাব দিলো কিশোর।

'গুড,' বললো ডিংগো। 'আরি, মারকো?'

রীয়ার-ভিউ মিররের দিকে তাকিয়ে আছে মারকো। 'দেখেছ, মনে হয় ফলো করছে।'

'ফলো!' চেঁচিয়ে উঠলো ডিংগো। খপ করে চেপে ধরলো কিশোরের হাত। 'এই ছেলে, পুলিশকে...'

'না, স্যার,' তাড়াতাড়ি বললো কিশোর। আতঙ্কিত। সবটা অভিনয় নয়। শোঁপার গাড়িটা দেখে ফেলেছে ওরা। সত্যি সত্যি বিপদ হতে পারে এবার।

'পুলিশ নয়?' কঠিন কণ্ঠে বললো মারকো। 'তাহলে কে? কি হলো, কথা বলছো না কেন? কে?'

'আমি কি করে জানবো? পুলিশকে বলিনি। কাউকেই জানাইনি আমি।'

'কে তাহলে?'

'মেসেজের কথা জানে এমন কেউ হতে পারে। কাল ঘড়িটা চুরি হয়ে গেছে, টিমের গাড়ি থেকে। আমরা তো ভেবেছি আপনারা নিয়েছেন।'

'আমরা নিইনি।'

'তাহলে ওই লোকটাই নিয়েছে,' বুড়ো আঙুল দিয়ে ইঙ্গিত করলো কিশোর। 'আমার ওপর চোখ রেখেছিলো হয়তো। এখন পিছে পিছে আসছে। কোথায় যাচ্ছি দেখতে চায়।'

'হ্যাঁ, তা হতে পারে,' মাথা দোলালো ডিংগো। 'ঘড়ি খোয়া যাওয়ার কথা

লারমারকে বলেছে টিম। তার মানে মিথ্যে বলেনি। মালের পেছনে আরও লোক লেগেছে। মারকো, জলদি খসাও।'

'খসাচ্ছি। দেখি কতোক্ষণ লেগে থাকতে পারে।'

আরও মিনিট দুই একই গতিতে গাড়ি চালালো মারকো। ফ্রীওয়ের কাছে এসে হঠাৎ গতি বাড়িয়ে দিলো, পলকে ফ্রীওয়েতে উঠে ঢুকে গেল গাড়ির ভিড়ে। দেখতে দেখতে চলে এলো অনেকগুলো গাড়ির মাঝামাঝি। তীব্র গতিতে ছুটে চলেছে গাড়িগুলো, হলিউডের দিকে।

লস অ্যাঞ্জেলেস আর হলিউডের মাঝে বিছিয়ে রয়েছে যেন ফ্রীওয়ের জাল, নানাদিক থেকে বেরিয়ে একটার সঙ্গে আরেকটা মিশেছে অসংখ্য পথ, আশপাশের সমস্ত এলাকার সঙ্গে লস অ্যাঞ্জেলেস শহরের যোগাযোগ রক্ষা করেছে। সারাটা দিন আর রাতেরও বেশির ভাগ সময় অগুণতি গাড়ি চলাচল করে ওসব পথে। রাতের এই সময়েও সিক্স লেন হাইওয়ের একটা লেন ফাঁকা নেই। নানারকম গাড়ি আর ট্রাক ছুটে চলেছে ভীষণ গতিতে।

অ্যাক্সেলারেটরে পায়ের চাপ বাড়িয়ে পাশে সরতে শুরু করলো মারকো, গাড়ির ভিড় থেকে বের করে আনতে চায় ভ্যান। মিনিট দুয়েক পর পেছনের গাড়িটা আর দেখা গেল না, হারিয়ে গেছে বোধহয় বড় বড় কয়েকটা ট্রাকের পেছনে। সন্তুষ্ট হতে পারলো না মারকো। আরও দশ মিনিট ধরে কয়েকবার করে গাড়ির ভিড়ে ঢুকলো আর বেরোলো। শেষে আউটার লেনে বেরিয়ে শাঁ করে মোড় নিয়ে নেমে এলো একটা একজিট র‍্যাম্প-এ—হাইওয়ে থেকে বেরোনোর মুখ।

নিচের সিটি স্ট্রীটে নেমে গতি কমালো মারকো। তাকালো রীয়ার-ভিউ মিররের দিকে। এতোক্ষণে সন্তুষ্ট হলো। 'নেই।'

স্বাভাবিক গতিতে চলছে এখন ভ্যান। মনে মনে দমে গেছে কিশোর। শোঁপার ওপর ভরসা করেছিলো সে। কিন্তু মারকোর সাথে পারেনি শোঁপার ড্রাইভার, সাহায্যের আশাও শেষ।

কিছুক্ষণ পর দুটো বাড়ির মাঝের গলিপথে ঢুকলো ভ্যান। মোড় নিয়ে ঢুকলো একটা ড্রাইভওয়েতে। বড় একটা গ্যারেজের সামনে এসে দাঁড়ালো। একবার হর্ন বাজালো মারকো। মুহূর্ত পরেই গ্যারেজের একটা দরজা উঠে গেল। ভ্যান ভেতরে ঢুকতেই নেমে গেল আবার।

একপাশের দরজা খুলে মারকো নামলো। আরেক পাশেরটা খুলে কিশোরকে নিয়ে নামলো ডিংগো।

লারমারকে দেখতে পেলো কিশোর। তার পেছনে বসে আছে রবিন আর টিম, চেয়ারের সঙ্গে বাঁধা!

'কোনো অসুবিধে হয়েছিলো?' জিজ্ঞেস করলো লারমার। 'দেরি করে ফেলেছো।'

'একটা গাড়ি পিছু নিয়েছিলো,' মারকো জানালো। 'ওটাকে খসাতে সময় লাগলো। ছেলেটা বলছে পুলিশ নয়। ঘড়ি-চোরটা হতে পারে। কাল টিমের বাড়ি থেকে নাকি নিয়ে গিয়েছিলো।'

'আসেনি, ভালোমতো দেখেছো তো?'

মাথা ঝাঁকালো মারকো।

'গুড।' কড়া চোখে কিশোরের দিকে তাকালো লারমার। 'কোনো চালাকি-টালাকি করলে বুঝবে মজা। তো, মেসেজগুলো এনেছো তো?' হাত বাড়ালো। 'দেখি?'

পকেট হাতড়ে একটা কাগজ বের করলো কিশোর। 'এই যে, মিস্টার লারমার, পয়লা মেসেজটা।'

হাতে নিয়ে পড়লো লারমার। কিশোরের লেখা কাগজঃ আই সাজেস্ট ইউ সী দা বুক। 'হ্যাঁ, তোমার বন্ধু বলেছে এটার কথা। কি বই?'

'জানি না।'

'দ্বিতীয় মেসেজে কিছু বলেনি?'

'এই যে, স্যার, নিয়ে এসেছি। নিজের চোখেই দেখুন।'

'ওনলি আ রুম হোয়্যার ফাদার টাইম হামস! মানে কি?'

'বোধহয় মিস্টার ক্লকের ঘড়ি-ঘরের কথা বলেছে। সেখানে অসংখ্য ঘড়ি সারাক্ষণ গুঞ্জন করছে।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিকই বলেছো। তা-ই বুঝিয়েছে। কিন্তু তন্ন তন্ন করে খুঁজেছি ঘরটা, কিছুই পাইনি। দেখি, তৃতীয় মেসেজের অর্ধেকটা আছে আমার কাছে,' পকেট থেকে ছেঁড়া কাগজটা বের করলো লারমার।

কিশোরও পকেটে হাত ঢোকালো।

এই সময় ঘটলো ঘটনা। ঝনঝন করে ভাঙলো দু'পাশের জানালার কাচ। ঝটকা দিয়ে পাল্লা খুলে গেল। পর মুহূর্তেই হ্যাঁচকা টানে পর্দা সরলো। জানালার বাইরে দাঁড়িয়ে আছে দু'জন নীল পোশাক পরা লোক, হাতে অটোমেটিক পিস্তল।

'হাত তোলো!' লারমার, মারকো আর ডিংগোকে আদেশ দিলো একজন পুলিশ। 'কুইক!'

'পুলিশ!' চেঁচিয়ে উঠলো ডিংগো।

বিড়বিড় করে স্প্যানিশ ভাষায় কি বললো মারকো, বোঝা গেল না।

'চুপ!' ধমকে উঠলো আরেকজন পুলিশ। 'জলদি হাত তোলো। পালাতে

পারবে না। যা বলছি করো।'

ধীরে ধীরে হাত তুললো ডিংগো আর মারকো। লারমার পিছিয়ে গেল ওয়ার্কবেঞ্চের কাছে। মনে হলো, কিছু একটা অস্ত্র খুঁজছে।

কিন্তু পুলিশের নজর আছে ওর ওপর। চিৎকার করে উঠলো প্রথম লোকটা, 'এই, কি করছো? হাত তুলতে বললাম না?...আরে, পুড়ছে কী!'

'মেসেজগুলো পুড়ছে!' চেঁচিয়ে বললো কিশোর।

বেঞ্চের ওপর ব্লোল্যাম্পটা জ্বলছে, তার শিখাতেই কাগজগুলো পোড়াচ্ছে লারমার। দেখতে দেখতে পুড়ে ছাই হয়ে গেল ওগুলো।

'নাও, করো এবার সমাধান,' দাঁত বের করে হাসলো লারমার।

'প্রথম দুটো মনে আছে আমার,' পুলিশের দিকে তাকিয়ে বললো কিশোর। 'কিন্তু তিন নম্বরটা...,' হাত ওল্টালো সে। 'নাহ্, ক্লক কি বোঝাতে চেয়েছে, জানবো না!'

'কেন, মগজ খাটাও,' হেসে উঠলো লারমার। ডিংগো আর মারকোর দিকে চেয়ে হাসি মুছে গেল। 'গাধা কোথাকার!' হিসিয়ে উঠলো সে। 'খসিয়ে দিয়ে না এসেছিলে! এই বিচ্ছু ছেলেটা টেক্কা মেরে দিলো তোমাদের ওপর। পুলিশকে ঠিকই খবর দিয়ে এসেছে। আর তোমরা...' রাগে বাক্যটা শেষ করতে পারলো না সে, দাঁতে দাঁত চাপলো।

'বিশ্বাস করুন, পুলিশকে কিচ্ছু বলিনি আমি,' লারমারের মতোই অবাক হয়েছে কিশোরও। কি করে ঘটলো এটা, বুঝতে পারছে না।

'পিস্তল ধরে রাখো, মিক,' একজন পুলিশ আরেকজনকে বলে সরে গেল জানালার কাছ থেকে। ঘুরে গিয়ে তুলে দিলো গ্যারেজের দরজা। ঘরে ঢুকলো তৃতীয় আরেকজন। পেছনে আবার নামিয়ে দেয়া হলো দরজা।

ছায়া থেকে আলোয় এসে দাঁড়ালো লোকটা। হাসি হাসি মুখ। বললো, 'বাহ্, চমৎকার। সব কিছু কন্ট্রোলে এসে গেছে।'

কপাল কুঁচকে ফেললো কিশোর। কোনোমতে শুধু বললো, 'মিস্টার শোঁপা!' বুঝতে পারছে না, পুলিশের সঙ্গে চোরের খাতির হলো কিভাবে।

আঠারো

'হ্যাঁ, আমি,' বললো শোঁপা। 'বিখ্যাত আর্ট থিফ, তিন মহাদেশের পুলিশ যার জ্বালায় অস্থির।' লারমারের দিকে তাকালো। 'কি করে ভাবলে, তোমাদের মতো তিনটে শুঁয়োপোকা আমাকে টেক্কা দিয়ে বেরিয়ে যাবে?'

মনে হলো, লারমারও শোঁপার নাম শুনেছে। কালো হয়ে গেছে মুখ, চোখে অস্বস্তি। দুই সহকারীর মতোই নীরব। কিছু করার নেই। পরিস্থিতি আয়ত্তের বাইরে চলে গেছে।

'কিন্তু···কিন্তু···,' বুঝতে পারছে না কিশোর। 'আপনাকে খসিয়ে দিয়েছিলো ওরা। আমি নিজেও দেখেছি, আপনার গাড়িটা দেখা যায়নি। চিনে এলেন কি করে?

'যে পেশায় আছি, সাবধান তো হতেই হয় আমাকে, তাই না,' হালকা গলায় বললো শোঁপা। এগিয়ে এসে কিশোরের জ্যাকেটের পকেটে হাত ঢুকিয়ে ছোট, চ্যাপ্টা একটা জিনিস বের করলো। 'এটা ইলেকট্রনিক সিগন্যালিং ডিভাইস। ইয়ার্ডে তোমার সঙ্গে কথা বলার সময় এক ফাঁকে ঢুকিয়ে দিয়েছিলাম। আমার গাড়িতে রেডিও রিসিভার আছে। তোমার পকেটে যন্ত্রটা একনাগাড়ে সঙ্কেত দিয়ে যাচ্ছিলো। কাজেই, ফ্রীওয়েতে গাড়ি দেখে অনুসরণ করতে হয়নি আমাকে। পরিষ্কার বুঝতে পারছিলাম কখন কোন দিকে যাচ্ছে ভ্যান। তোমরা গ্যারেজে ঢোকার কয়েক মিনিট পরেই চলে এলাম আমরাও। তারপর আর কি? আমার দু'জন সহকারীকে পাঠালাম কাজ শেষ করতে।'

'মিস্টার শোঁপা!' কথা বললো রবিন। চেয়ারে বাঁধা, স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে লোকটার দিকে। 'কাল আপনিই আমাদের গাড়ির পিছু নিয়েছিলেন, না? ঘড়ি চুরি করেছেন।'

বাউয়ের কায়দায় মাথা নোয়ালো শোঁপা। 'সরি, বয়, আমিই। তবে তোমাদের কোনো ক্ষতি করার ইচ্ছে ছিলো না। বরং সাহায্যই করতে চেয়েছি, যাতে কাজে আরও তাড়াতাড়ি সফল হও। সে যাক, সময় খুব কম। নইলে আরও কথা বলতাম তোমাদের সঙ্গে, ভালোই লাগছে। হাজার হোক, পুরনো বন্ধু,' হাসলো সে। সহকারীদের দিকে চেয়ে বললো, 'দাঁড়িয়ে আছো কেন? হাতকড়া লাগাও।'

গ্যারেজের মাঝখানে ইস্পাতের একটা খুঁটি বসানো রয়েছে, ছাতের ভার রাখার জন্যে। পিস্তলের মুখে তিন চোরকে ওই খুঁটির কাছে নিয়ে গেল দুই পুলিশ। তিনজনকে মুখোমুখি দাঁড় করালো। তিন জোড়া হাতকড়া দিয়ে একজনের ডান হাতের সঙ্গে আরেকজনের বাঁ হাত বেঁধে দিলো। খুঁটিটাকে কেন্দ্র করে ঘুরতে পারবে ওরা এখন। বসতে পারবে, দাঁড়াতেও পারবে, কিন্তু যেতে পারবে না কোথাও।

'বাহ্, ভালো বুদ্ধি করেছো,' প্রশংসা করলো শোঁপা। 'এবার যাওয়া দরকার। কাজ পড়ে আছে।'

'এক মিনিট, শোঁপা,' লারমার বললো। 'এক সাথে কাজ করলেও তো পারি আমরা। সুবিধে হয় তাহলে। জিনিসগুলো তাড়াতাড়ি খুঁজে বের করতে পারবো। কি বলো?'

'কি সুবিধে হবে?' লারমারের কথায় গুরুত্বই দিলো না শোঁপা। 'তোমরা যতোখানি জানো, আমিও জানি। আমাকে ফাঁকি দিয়ে একাই মেরে দিতে চেয়েছিলে। মারো এখন। তোমাদের সাথে কাজ করার কোনো দরকারই এখন আমার নেই। দেখতেই পাচ্ছো, পুলিশ আমার সঙ্গে রয়েছে।' নীল পোশাক পরা দু'জনকে বললো, 'ছেলেগুলোকে খোলো। হ্যারি ক্রুকের বাড়িতে যেতে হবে আবার।'

কিছুক্ষণ পর গ্যারেজ থেকে বেরিয়ে এলো তিনজন লোক, আর তিন কিশোর। কালো একটা সেডান গাড়িতে চড়ে স্বাভাবিক গতিতে এগিয়ে চললো হলিউডের রাস্তা ধরে।

আপনমনেই হাসলো শোঁপা।

'কি ভাবছো?' পাশে বসা কিশোরকে জিজ্ঞেস করলো সে। 'নিশ্চয় আশা ছেড়ে দিয়েছিলে। আমার গাড়িটা হারিয়ে যেতে দেখে।'

'হ্যাঁ, তা দিয়েছিলাম,' স্বীকার করলো কিশোর। 'চমকে গিয়েছিলাম জানালায় পুলিশ দেখে। সত্যি বলবো? অসমাপ্ত কাজ পছন্দ নয় আমার। সব শেষ করে গিয়ে পুলিশ ডাকার আলাদা মজা…'

জোরে হেসে উঠলো শোঁপা। 'পুলিশ, না? ভেবো না, তোমার মজা নষ্ট হয়নি। ওরা পুলিশ নয়। পুলিশের পোশাক পরে আছে। পুরনো কাপড়ের দোকান থেকে ওরকম ইউনিফর্ম সহজেই জোগাড় করা যায় আজকাল। সেই যে প্রবাদ আছে নাঃ বাইরের চেহারা দেখে ভুলো না। হাহ্ হাহ্ হা!'

ঢোক গিললো কিশোর। তেতো হয়ে গেল মন। তাকে কেউ বোকা বানিয়ে আনন্দ পাক, এটা সহ্য করতে পারে না সে। শোঁপার প্রতি তার বিদ্বেষ বাড়লো।

'টিম,' গায়ের সঙ্গে চেপে বসা টিমকে বললো কিশোর। 'মিস্টার শোঁপার সঙ্গে চুক্তি হয়েছে আমার। তোমাকে আর রবিনকে মুক্ত করবেন। তাঁর কথা তিনি রেখেছেন। আরও একটা কাজ করার কথা দিয়েছেন তিনি, তোমার বাবাকে নির্দোষ প্রমাণ করবেন।'

'করবেন?' প্রায় চেঁচিয়ে উঠলো টিম। 'ইস্, কি ভালোই না হতো!'

'ভেবো না,' শোঁপা বললো, 'হয়ে যাবে। আমি যখন হাত দিয়েছি…শোঁপার জন্যে কঠিন কিছুই নেই। হ্যাঁ, কিছু কথা তোমাদের জানানো দরকার। কিশোর, নিশ্চয় আন্দাজ করতে পারছো, হ্যারি ক্রুক ভালো লোক ছিলো না। বাইরে

অভিনেতার খোলস, আসলে ছিলো চোরের সর্দার। দামী দামী ছবি চুরি করে সেগুলো ধনী ক্রেতার কাছে বিক্রি করা ছিলো তার দলের কাজ।'

'হুঁ, সে-জন্যেই,' বলে উঠলো রবিন, 'নাম পাল্টে রহস্যময় আচরণ করতো ক্লক। চোর ছিলো বলেই। চুরি করে এনে রান্নাঘরে ছবিগুলো তাহলে সে-ই লুকিয়েছিলো।'

'চুরি হয়তো সে করেনি, অন্য কেউ করে এনে তার হাতে দিয়েছে। অনেক সহকারী ছিলো তার। ডিংগো তাদের একজন। আগে জকি ছিলো। জকি মানে জানো তো? রেসের ঘোড়ার পেশাদার ঘোড়সওয়ার। ডিংগোর আরও সহকর্মী ছিলো। সব ক'জন অসৎ। ফলে মাঠ থেকে বের করে দেয়া হলো ওদেরকে। ছোট হালকা শরীর, জানালা দিয়ে সহজেই ঢুকতে পারে। তাই ওদেরকে বেছে নিলো ক্লক। ছবি চুরি করে এনে ক্লকের কাছে দিতো ওরা। ক্লক সেগুলো নিয়ে গিয়ে বিক্রি করতো ধনী দক্ষিণ আমেরিকানদের কাছে। যাদের কাছে বেচতো, তারাও লোক সুবিধের না।

'বছর দুই আগে কয়েকটা ছবি চুরি করার পর বেশি গোলমাল শুরু করলো পুলিশ। ওগুলো পাচার করার সুযোগ পেলো না ক্লক। যার কাছে বিক্রি করার কথা ছিলো, সেই লোকটা জড়িয়ে পড়লো রাজনৈতিক গণ্ডগোলে, ধরে তাকে জেলে ভরে দিলো তার দেশের সরকার। ছবিগুলো লুকিয়ে ফেলতে বাধ্য হলো ক্লক। ইচ্ছে ছিলো, সময় সুযোগমতো পরে কারো কাছে বিক্রি করবে। ইতিমধ্যে ঠাণ্ডা হয়ে আসবে পরিস্থিতি।

'ডিংগো আর মারকোর টাকা দরকার। কয়েক দিন পর আরও তিনটে ছবি চুরি করে আনলো ওরা। আগেরগুলোই বিক্রি করতে পারেনি ক্লক, আরও তিনটে নিয়ে কি করবে? কিন্তু সে-কথা শুনতে চাইলো না দুই চোর। ওরা চাপাচাপি শুরু করলো টাকার জন্যে। ক্লককে বললো, টাকা দিতে না পারলে ছবিগুলো ফেরত দিয়ে দিক। আগের পাঁচটা ছবি লুকিয়ে ফেলেছে ক্লক, বের করতে চাইলো না। দশ লাখ ডলারের মাল, কে হাতে পেয়ে ফেরত দিতে চায়?

'একটা রফা হয়তো হয়ে যেতো, কিন্তু কাকতালীয় একটা ব্যাপার ভণ্ডুল করে দিলো ক্লকের সমস্ত পরিকল্পনা। পুলিশের চোখ পড়লো টিমের বাবার ওপর। শেষ তিনটে ছবি চুরির ব্যাপারে তাকে সন্দেহ করে বসলো ওরা। এটা বুঝতে পেরে এক চাল চাললো ক্লক। ছবিগুলো লুকিয়ে রাখলো রান্নাঘরে। যাতে ওগুলো খুঁজে পায় পুলিশ, দোষ চাপে গিয়ে বেকার ডেলটনের ঘাড়ে।'

'আ-আমার বাবাকে ফাঁসিয়েছে! ক্লঅক!' তিক্ত কণ্ঠে বললো টিম, বিশ্বাস করতে পারছে না। 'অথচ আমি আর মা ভাবতাম কতো ভালো মানুষ!'

'এই দুনিয়ায় লোক চেনা মুশকিল! হ্যাঁ, তোমার বাবাকে ক্রুকই ফাঁসিয়েছে। এর কিছুদিন পরই রহস্যজনক ভাবে নিরুদ্দেশ হয়ে গেল। আমার বিশ্বাস, টাকার জন্যে চাপ দিচ্ছিলো ডিংগো, মারকো আর লারমার। দিতে পারেনি বলেই পালিয়েছিলো ক্রুক। দক্ষিণ আমেরিকাতে লুকিয়েছিলো। পুলিশ আর সহকারীদের চোখে ধুলো দিলেও আমাকে ফাঁকি দিতে পারেনি। দুনিয়ার সব জায়গায় লোক আছে আমার।

'যোগাযোগ করলাম ওর সাথে। চুক্তিতে আসতে চাইলাম। ঘোড়েল লোক, কিছুতেই রাজি হলো না। রাগ করে চলে এলাম। নিজেই খুঁজে বের করার চেষ্টা করলাম ছবিগুলো। কিছু দিন পর অসুখে পড়লো ক্রুক। ডাক্তার বলে দিলো, বাঁচবে না। লোকের মুখে শুনলাম, টিমের বাবার জন্যে অনুতপ্ত সে। তাদের জন্যে কিছু করতে চায়। অদ্ভুত কতগুলো মেসেজ লিখে কয়েকজন বন্ধুর কাছে পাঠালো। সেই সাথে একটা আজব চেঁচানো ঘড়ি। এর কিছু দিন পর মারা গেল সে।'

'ঘড়ি আর মেসেজগুলো কেন পাঠালো, জানেন?' রবিন জিজ্ঞেস করলো। 'তার চেয়ে পুলিশের কাছে একটা চিঠি লিখে সব বলে দিলেই কি ভালো হতো না? নির্দোষ জানলে টিমের বাবাকে ছেড়ে দিতো পুলিশ, হয়তো বিনা দোষে জেলে পাঠানোর জন্যে ক্ষতিপূরণও দিতো।'

'আসলে ক্রুক লোকটাই ছিলো জটিল। সহজ কাজ সহজভাবে না করে খালি প্যাঁচের মধ্যে যেতো। তবে কেন করেছে, তারও নিশ্চয় কোনো কারণ আছে। সবগুলো মেসেজের সমাধান হলেই বুঝতে পারবো।'

'মেসেজ তো পুড়িয়ে ফেলেছে,' মনে করিয়ে দিলো কিশোর। 'মানে আর বের করবেন কিভাবে?'

'কেন, মনে নেই? একবার পড়লেই তো সব মনে থাকে তোমার,' উৎকণ্ঠা চাপা দিতে পারলো না শোঁপা, প্রকাশ পেয়ে গেল কণ্ঠস্বরে।

'প্রথম দুটো মনে আছে, কিন্তু তৃতীয়টার মানেই বের করতে পারিনি। অর্ধেকটা আমার কাছে, বাকি অর্ধেক লারমারের···প্রথম মেসেজটাতে লিখেছেঃ আই সাজেস্ট ইউ সী দা বুক। দ্বিতীয়টাতেঃ ওনলি আ রুম হোয়্যার ফাদার টাইম হামস।'

'বই? কিসের বই? ঘড়ি কোন ঘরে গুঞ্জন করে, সেটা বোঝা সহজ। জানি আমরা। আমার মনে হয়, ওই ঘরটায় গেলেই সব রহস্যের সমাধান হয়ে যাবে।'

মোড়ের কাছে গাড়ি রাখতে বললো শোঁপা।

নেমে সবাই হেঁটে চললো ক্রুকের বাড়ির দিকে। ওদেরকে বাড়ির ভেতরে নিয়ে এসে মায়ের খোঁজে চললো টিম। 'মাআ! মাআ!' বলে ডাকলো।

ভাঁড়ার ঘর থেকে শব্দ শোনা গেল। দরজায় জোরে জোরে কিল মারছে।

দরজার বাইরের হুড়কো খুলে দিলো টিম। সঙ্গে সঙ্গে পাল্লা খুলে বেরিয়ে এলো তার মা। 'তুই এসেছিস, টিম! ওই শয়তান লারমার আর সঙ্গীরা! আটকে ফেললো ভাঁড়ারে···আরে, পুলিশ নিয়ে এসেছিস দেখি। ভালোই হয়েছে। এখুনি ব্যাটাদের অ্যারেস্ট করতে বল।'

'ওদের ব্যবস্থা হয়েছে, ম্যাডাম,' টিমের মায়ের সামনে এসে ফরাসী কায়দায় বাউ করলো শোঁপা। 'আপনাদের ভালো চাই।'

'মা, ইনি মিস্টার শোঁপা। বলছেন, বাবা নাকি নির্দোষ।'

'তাই নাকি? ইনি জানেন আমার স্বামী নিরপরাধ?'

'জানি, ম্যাডাম। তবে সেটা পুলিশের কাছে প্রমাণ করতে হবে। আর সেই প্রমাণ রয়েছে মিস্টার ক্রুকের ঘরে। ও, ক্রুক কে জানেন না বোধহয়। রোজার, জেমস রোজার। তাঁর আরেক নাম হ্যারিসন ক্রুক। লাইব্রেরির কিছু জিনিস নষ্ট করতে হতে পারে, সবই আপনাদের ভালোর জন্যে। আপত্তি আছে?'

'আপত্তি! মোটেই না। তবু টিমের বাবাকে ছাড়িয়ে আনুন।'

'থ্যাংক ইউ। আপনি এখানেই থাকুন। রবিন, টিম, তোমরাও থাকো। আমরা ঢুকি। শোনো, কারো সাথে যোগাযোগ করবে না। ফোন এলে ধরবে না। ঠিক আছে?'

'ধরবো না,' টিমের মা বললো। 'ছেলেদের নিয়ে রান্নাঘরে যাচ্ছি আমি। খেয়েছি সেই কখন। খিদেয় পেট জ্বলছে। আপনারা যান, মিস্টার শোঁপা।'

মহিলাকে আরেকবার ধন্যবাদ দিয়ে কিশোরের দিকে ফিরলো শোঁপা। 'চলো, পথ দেখাও।'

এদিকে যখন মহা-উত্তেজনা, মুসা ওদিকে ড্রইং রুমে বাবার সঙ্গে বসে টেলিভিশন দেখছে। চোখই শুধু রয়েছে পর্দায়, মন বসাতে পারছে না। হ্যারিসন ক্রুক আর তার আজব ঘড়ির কথা ভাবছে।

'বাবা,' জিজ্ঞেস করলো মুসা, 'হ্যারিসন ক্রুকের নাম শুনেছো? রেডিওতে নাটক করতো। নানারকম চিৎকার করতো আরকি।'

'হ্যারিসন ক্রুক? চিনি। তেমন পরিচয় ছিলো না। গোটা দুই ছবির শুটিং করার সময় দেখা হয়েছে তার সঙ্গে। চেঁচাতে পারতো! রক্ত ঠাণ্ডা করে দিতো একেবারে। পুরানো একটা নাটকে এক কাণ্ড করেছিলো সে।'

'কাণ্ড!' আনমনে হাত বাড়িয়ে সামনের টেবিলে রাখা প্লেট থেকে কয়েকটা পোট্যাটো চিপস তুলে মুখে পুরলো মুসা। 'কি কাণ্ড, বাবা?'

'অ্যাঁ?' মুসার কথায় মন নেই বাবার। ওয়েস্টার্ন ছবি হচ্ছে টিভিতে। কাহিনীতে গতি এসেছে।

আবার একই প্রশ্ন করলো মুসা।

পর্দা থেকে চোখ না সরিয়ে অনেকটা অন্যমনস্ক হয়েই জবাব দিলেন মিস্টার আমান।

চোখ মিটমিট করলো মুসা। তার বাবা এখন যে তথ্যটা জানালেন, নিশ্চয় জানে না কিশোর। মেলাতে পারছে না মুসা, কিন্তু মনে হচ্ছে, কোথায় একটা যোগসূত্র রয়েছে। কিশোর হয়তো বুঝবে। ডাকবে নাকি? বলবে? তথ্য মূল্যবান হলে, কাঁচা ঘুম থেকে ডেকে তুললেও কিছু মনে করবে না কিশোর।

দ্বিধা করছে মুসা। এই সময় বলে উঠলেন মিস্টার আমান, 'অনেক রাত হয়েছে। যাও, ঘুমাতে যাও।'

'যাচ্ছি।'

সিঁড়ির গোড়ায় পৌঁছতে না পৌঁছতেই হাই উঠতে আরম্ভ করলো তার। ভাবলো, থাক এখন। সকালে জানালেই হবে কিশোরকে।

উনিশ

লাইব্রেরিতে ঢুকেই কাজে লাগলো শোঁপা, মুহূর্ত সময় নষ্ট করলো না। দুই সহকারীকে দরজা-জানালার সমস্ত পর্দা টেনে দিতে বলে, নিজে গিয়ে আলো জ্বাললো। চোখ বোলালো সারা ঘরে।

'শত শত বই,' নিজে নিজেই কথা বলতে লাগলো। 'তিনটা পেইনটিং, বাজে। বড় একটা আয়না। অনেক ঘড়ি। দেয়ালে কতগুলো খোপ, বহু জিনিস রাখা যাবে। মেসেজে বলেছে, বইয়ে দেখার জন্যে। দ্বিতীয়টাতে বলেছে, ঘড়ির ঘরে খুঁজতে। তৃতীয়টায় বলেছে···কিশোর, দেখি তো তোমার অর্ধেকটা।'

বের করে দিলো কিশোর।

নম্বরগুলো দেখতে দেখতে ভুরু কুঁচকে গেল শোঁপার। 'কোন পাতা, আর কতো নম্বর শব্দ, সেটা বোঝাতে চেয়েছে। বইটা পেলে কয়েক মিনিটের ব্যাপার। কিন্তু কোন্ বই? কিশোর, কোন্ বইয়ের কথা বলেছে?'

'বুঝতে পারছি না। বইটা হয়তো এ-ঘরেই আছে।'

'হুঁ, আমারও তা-ই মনে হয়। এসো না কয়েকটা খুঁজে দেখি।'

কাছের তাকটা থেকে তিন-চারটে বই নামিয়ে উল্টে-পাল্টে দেখলো শোঁপা। তারপর আবার তুলে রেখে দিলো।

'না, কিছুই বোঝা যায় না। এতো বই, ক'টা দেখবো? পুরো মেসেজটা থাকলে···তোমার মাথাটা খাটাও তো কিশোর। পারলে তুমিই পারবে।'

নিচের ঠোঁটে জোরে জোরে চিমটি কাটতে আরম্ভ করলো কিশোর।

'মিস্টার শোঁপা···' কিছুক্ষণ পর বললো সে।

'হ্যাঁ?'

'মেসেজগুলো হেনরি মিলারের জন্যে পাঠানো হয়েছিলো। তিনি হয়তো সমাধান করতে পারবেন। অন্তত কোনো সূত্র-টুত্র তো দিতে পারবেনই। নিশ্চয় বইটার নামও জানেন।'

'ঠিক বলেছো,' তুড়ি বাজালো শোঁপা। 'ফোন করে জিজ্ঞেস করো।'

'কিন্তু তিনি তো হাসপাতালে।'

'অ্যাঁ! তাহলে?' ঝুলে পড়লো শোঁপার চোয়াল, 'আর কোনো উপায়?'

'তাঁর স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করতে পারি। জানতেও পারেন।'

'যাও। জলদি করো।'

'রবিনকে দিয়ে বরং করাই। তার সঙ্গে মহিলার পরিচয় আছে, কথা হয়েছে।'

মিসেস ডেলটনের সঙ্গে বসে তখন চা খাচ্ছে রবিন আর টিম।

'কি হলো, কিশোর? কিছু পেয়েছো?' রবিন জিজ্ঞেস করলো।

'নাহ্। তোমাকে একটা কাজ করতে হবে,' কি করতে হবে বুঝিয়ে বললো কিশোর।

হলঘরে গিয়ে ডিরেক্টরি থেকে মিস্টার মিলারের নম্বর বের করে ডায়াল করলো রবিন। ফোন ধরলেন মিসেস মিলার, গলা শুনেই চিনতে পারলো সে। মেসেজের কথা বলে, বইটার কথা জিজ্ঞেস করলো। তিনি কি কিছু বলতে পারবেন?

ওপাশে কয়েক সেকেণ্ড নীরবতা, বোধহয় ভাবছেন মহিলা। তারপর বললেন, 'একটা বইয়ের নাম খুব মনে পড়ছে। বইয়ের কাহিনী ক্লকের, লিখেছে হেনরি। এতো বেশি আলোচিত হয়েছে, স্পষ্ট মনে আছে নামটা। আ স্ক্রীম অ্যাট মিডনাইট। চলবে?'

'নিশ্চয়!' টেলিফোনেই চেঁচিয়ে উঠলো রবিন। 'থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ!' রিসিভার রেখে খবরটা জানালো কিশোরকে।

চরকির মতো পাক খেয়ে ঘুরেই লাইব্রেরিতে ছুটলো কিশোর। পেছনে দৌড় দিলো শোঁপা। ঢুকে দরজা লাগিয়ে দিলো।

বিভিন্ন তাকে মিনিট দুই খোঁজাখুঁজি করে বইটা বের করলো শোঁপা। 'এই যে, আ স্ক্রীম অ্যাট মিডনাইট, বাই হ্যারিসন ক্লক অ্যাণ্ড হেনরি মিলার। কপাল খুলছে। মেসেজটা কোথায়? ছেঁড়াটা···হ্যাঁ, দেখি···তিন নম্বর পৃষ্ঠা, সাতাশ নম্বর

শব্দ…কাগজ-কলম নাও…'

দ্রুত পাতা উল্টে তিন নম্বর পৃষ্ঠায় থামলো শোঁপা। 'শব্দটা লেখো…স্ট্যাণ্ড…তারপর হলো গিয়ে…'

একের পর এক শব্দ বলছে শোঁপা, কিশোর লিখে নিচ্ছে।

শেষ হয়ে গেল মেসেজ। বইটা বন্ধ করে শোঁপা বললো, 'ব্যস, এইই। পড় তো, কি হয়েছে?'

পড়লো কিশোর, স্ট্যাণ্ড ইন দা মিডল অভ দা রুম অ্যাট ওয়ান মিনিট টু মিডনাইট। হ্যাভ টু ডিটেকটিভস অ্যাণ্ড টু রিপোর্টারস উইদ ইউ। হোল্ড হ্যাণ্ডস, মেকিং আ সার্কল, অ্যাণ্ড কীপ অ্যাবসলুটলি সাইলেন্ট ফর ওয়ান মিনিট। অ্যাট মিডনাইট এক্সাক্টলি…' থেমে গেল সে। 'আর নেই।'

'ইস্‌সি, আসল জায়গায় ছিঁড়ে ফেলেছে হারামজাদা! ঠিক মাঝরাতে কি ঘটবে? কি ঘটতে পারে? জানার কোনো উপায় নেই! মেসেজ পুড়িয়ে ফেলেছে। ক্লক মৃত। কে বলতে পারবে?' জোরে নিঃশ্বাস ফেললো। 'অসাধারণ ধূর্ত ছিলো লোকটা, ক্ষুরধার বুদ্ধি। ঠিক তার মতো করে কে ভাবতে পারবে?…এখন এক কাজ করা যায়। আরও ভালোমতো খুঁজতে হবে এঘরে। দরকার হলে দেয়াল ভেঙে ফেলবো। কিন্তু যদি এঘরে লুকানো না থাকে?'

'তাহলে আর জানা যাবে না কোনোদিন,' চিন্তিত ভঙ্গিতে বললো কিশোর। হঠাৎ হাত তুললো, 'মিস্টার শোঁপা, দেয়ালের ওই ছবিগুলো নয় তো! আসল ছবির ওপর নতুন করে আঁকা…'

'না, এতো সহজের মধ্যে যাবে না ক্লক। তবু, দেখি।'

একটা ছবি নামিয়ে প্রথমে খালি চোখে পরীক্ষা করে দেখলো শোঁপা। কিছু বোঝা গেল না। পকেটনাইফ বের করে ক্যানভাসের এক কোণায় রঙ চেঁছে তুলে ফেললো।

'না, একেবারেই বাজে জিনিস,' ঠোঁট বাঁকালো সে। 'বইয়েই খুঁজতে হবে। লুকানো চাবি-টাবিও রেখে যেতে পারে। এক ধার থেকে সব বই দেখবো।'

'দাঁড়ান!' একটা বুদ্ধি এসেছে মাথায়।'

'কী?'

'মেসেজের বাকিটা উদ্ধার করতে পারবো মনে হচ্ছে।'

'কিভাবে!'

'বই থেকে শব্দ বাছাই করে মেসেজ তৈরির সময় অনেকেই শব্দের তলায় দাগ দিয়ে রাখে। সুবিধে হয়। মিস্টার ক্লকও ওরকম কিছু করে থাকলে…'

'আরি, খেয়াল করলাম না তো দাগ আছে কিনা! দেখি আবার?' তাড়াতাড়ি

আবার বইটা খুলে দেখলো শোঁপা। 'ঠিক! ঠিকই বলেছো তুমি। দাগ দিয়েছে। পেন্সিলের হালকা দাগ, এতো আবছা, প্রায় চোখে পড়ে না। দেখো।'

বইটা হাতে নিয়ে এক এক করে পাতা ওল্টাতে শুরু করলো কিশোর, খুব ধীরে। মনোযোগ দিয়ে দেখছে প্রতিটি পাতার প্রতিটি লাইন। এবার কাগজ-কলম নিয়েছে শোঁপা। অবশেষে একটা পাতায় থেমে একটা শব্দ বললো কিশোর। লিখে নিলো শোঁপা।

মোটা বই। অপরিসীম ধৈর্যের পরিচয় দিতে হলো কিশোরকে। দিলো। এসব কাজে কষ্ট করতে তার কোনো আপত্তি থাকে না।

শেষ পাতাটাও ওল্টানো শেষ হলো। আর শব্দ নেই। বই বন্ধ করলো কিশোর।

'শেষ, না?' শোঁপা বললো। 'প্রথম থেকে পড়ি। স্ট্যাণ্ড ইন দা মিডল অভ দা রুম অ্যাট ওয়ান মিনিট টু মিডনাইট। হ্যাভ টু ডিটেকটিভস অ্যাণ্ড টু রিপোর্টারস উইদ ইউ। হোল্ড হ্যাণ্ডস, মেকিং আ সার্কল, অ্যাণ্ড কীপ অ্যাবসলুটলি সাইলেন্ট ফর ওয়ান মিনিট। অ্যাট মিডনাইট এক্সাক্টলি দা অ্যালার্ম অভ দা স্ক্রীমিং ক্লক হুইচ আই সেন্ট ইউ শুড গো অফ। হ্যাভ ইট সেট অ্যাট ফুল ভলিউম। লেট দা স্ক্রীম কনটিনিউ আনটিল মাই হাইডিং প্লেস ইজ আনকাভারড।'

পড়া শেষ করে মুখ তুলে তাকালো শোঁপা। 'কিছু বুঝলে?'

ভুরু কুঁচকে ভাবছিলো কিশোর, দাঁত দিয়ে নখ কাটছে, শোঁপার প্রশ্নে মুখ তুললো। 'উঁম্?'

আবার একই প্রশ্ন করলো শোঁপা, 'কিছু বুঝলে?'

'মানে তো সহজ,' মুখ থেকে আঙুল সরালো কিশোর। 'মাঝরাতের এক মিনিট আগে, অর্থাৎ এগারোটা উনষাট মিনিটে ঘরের ঠিক মাঝখানে দাঁড়াতে বলা হয়েছে। দাঁড়ালাম। দু'জন গোয়েন্দা আর দু'জন সাংবাদিককে উপস্থিত থাকতে বলা হয়েছে। গোয়েন্দা পাবো, কিন্তু সাংবাদিক আনা সম্ভব না। নাকি?'

'না, সম্ভব না,' মাথা নাড়লো শোঁপা।

'তারপর বলছে, হাত ধরাধরি করে একটা চক্র তৈরি করে নীরবে অপেক্ষা করতে। আসলে নীরবে অপেক্ষা করাটাই আসল কথা, হাত ধরাধরিটা কোনো ব্যাপার নয়। ওরা বেশি নাটকীয়তা, নাটকের লোক তো, সে-জন্যেই ওরকম করতে বলেছে। না করলেও হয়তো চলবে। বলছে, ঠিক বারোটায় বাজবে অ্যালার্ম ক্লক, যেটা হেনরি মিলারের কাছে পাঠিয়েছিলো। বাজবে মানে চিৎকার করে উঠবে আর কি। এই রাত বারোটার ব্যাপারটারও কোনো মানে নেই, আমার বিশ্বাস। এটাও নাটকীয়তা, রহস্য গল্পের রহস্য বাড়ানোর হাস্যকর প্রচেষ্টা—ঠিক

রাত বারোটা, কিংবা মধ্যরাত, যেন সন্ধ্যা আটটা কিংবা ভোর চারটেয় হলে রহস্য জমে না। যত্তোসব! হ্যাঁ, যা বলা হয়েছে, ঘড়ি তো চিৎকার করবে, ভলিউম পুরো বাড়িয়ে দিতে হবে ওটার। চিৎকার করিয়ে যেতে হবে যতোক্ষণ না ক্লকের গোপন জায়গা বেরিয়ে পড়ে।'

'তোমার ধারণা, চেঁচানো ঘরিটাতেই রয়েছে রহস্যের চাবিকাঠি?'

সরাসরি জবাব দিলো না কিশোর। ঘুরিয়ে বললো, 'হতে পারে, এমন কোনো মেকানিজম রয়েছে গোপন জায়গাটায়, চিৎকারের শব্দে সক্রিয় হয়ে উঠবে। সরে যাবে কোনো লুকানো প্যানেল-ট্যানেল বা দরজা। শব্দের সাহায্যে তালা খোলা তো আজকাল কোনো ব্যাপারই নয়। কিছু তালা আছে, আপনি ভালো করেই জানেন, মালিককে কাছে গিয়ে শুধু বলতে হয় "খোলো", ব্যস, খুলে যায়। মিস্টার ক্লকের কণ্ঠস্বরও বোধহয় ওরকম কিছুই করবে।'

'হ্যাঁ, এটা সম্ভব,' মাথা দোলালো শোঁপা। 'শব্দের সাহায্যে অনেক তালা খুলেছি আমি।'

'ঘড়িটা কোথায়? নিয়ে আসুন, চেষ্টা করে দেখি।'

'নেই। নষ্ট করে ফেলেছি।'

'নষ্ট করে ফেলেছেন!'

'হ্যাঁ, বললাম না, খুলে ফেলেছি। যন্ত্রপাতি কোথায় যে কোনটা ফেলেছি···মাঝে মাঝে এমন গাধামো করি না···অন্য কি করা যায়, বল।'

'আর কি করবেন?' হতাশ ভঙ্গিতে দু'হাত নাড়লো কিশোর। 'হবে না।'

'হতেই হবে! দরকার হলে ঘর ভেঙে ফেলবো আমি।' এক সহকারীর দিকে ফিরে আদেশ দিলো, 'বিল, যন্ত্রপাতি। কুইক!'

বিশ

লাইব্রেরি বলে আর চেনা যায় না এখন ঘরটাকে। হাতুড়ি, বাটালি, ড্রিল মেশিন, কুড়াল আর শাবল নিয়ে আক্রমণ করেছিলো শোঁপার লোকেরা। প্রথমেই তাক থেকে সমস্ত বই নামিয়ে মেঝেতে স্তূপ করেছে। তারপর নামিয়েছে ছবিগুলো আর আয়না। দেয়ালের এক ধার থেকে খোঁজা আরম্ভ করেছে, ফাঁপা জায়গা, কিংবা গোপন খোকর আছে কিনা দেখেছে। দেয়ালের কয়েকটা তাকও ভেঙে টেনেটুনে নামিয়েছে। ধারণা ছিলো, লুকানো দরজা-টরজা বা দেয়াল-আলমারি থাকতে পারে। ছাতও বাদ রাখেনি। অনেক জায়গার আস্তরণ খসিয়ে ফেলেছে। মোট কথা, ধসিয়ে দেয়াটা বাকি রেখেছে শুধু।

কিন্তু নিরাশ হতে হয়েছে ওদেরকে, ব্যর্থ হয়েছে চেষ্টা। কিছুই পায়নি। কিচ্ছু না। লুকানো ফোকর, দরজা, কিংবা দেয়াল আলমারির চিহ্নও নেই। ছবি লুকিয়ে রাখার মতো কোনো জায়গা-ই নেই।

প্রচণ্ড হতাশা রাগিয়ে দিয়েছে শোঁপাকে।

'শেষ পর্যন্ত পারলাম না, অ্যাঁ!' কপালের ঘাম মুছলো সে। 'হেরে গেলাম ক্রুকের কাছে? বিশ্বাসই করতে পারছি না! কোথায় লুকালো? কোথায়?'

'তার মানে টিমের বাবাকে নির্দোষ প্রমাণ করতে পারছেন না?' কিশোর প্রশ্ন করলো।

'ছবিগুলো না পেলে কি করে করি? তোমার চোখের সামনেই তো খোঁজা হলো।...আর কোনো উপায়? বুদ্ধি-টুদ্ধি কিছু?'

নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটতে শুরু করলো কিশোর। আনমনে মাথা দোলালো কিছুক্ষণ। 'মিস্টার শোঁপা,' বাঁ হাতের তালুর দিকে তাকিয়ে আছে সে। 'ঘড়ি নষ্ট হয়েছে বটে। কিন্তু চিৎকারটা বোধহয় হয়নি।'

'মানে?' দুই লাফে কাছে চলে এলো শোঁপা।

চেয়ারে হেলান দিয়ে কয়েক সেকেণ্ড পা দোলালো কিশোর। ধীরে ধীরে বললো, 'মিস্টার শোঁপা, হিরাম বারকেনের কাছে অনেকগুলো টেপ আছে। রেডিওর নাটক রেকর্ড করে রেখেছেন। হ্যারিসন কক যতগুলোতে কণ্ঠ দিয়েছে, সব। তার মধ্যে আ স্ক্রীম অ্যাট মিডনাইটও নিশ্চয় আছে। ঘড়ির মধ্যে যে চিৎকারটা ঢুকিয়ে দিয়েছিলো, সেটা কোনো নাটকেরও হতে পারে। মানে, ওরকম ভাবে চিৎকার করেছিলো হয়তো কোনো নাটকে। তাহলে টেপ বাজালেই সেই চিৎকার পেয়ে যাবো আমরা। এখন, মিস্টার বারকেন দয়া করে টেপগুলো আর রেকর্ডারটা দিলেই হয়। ঘড়ি আর দরকার হবে না আমাদের।'

'এখুনি, এক্ষুণি ফোন করো তাকে!' চেঁচিয়ে উঠলো শোঁপা। দপদপ করে লাফাচ্ছে কপালের একটা শিরা। 'সময় খুব কম।'

হলঘরে এসে বারকেনকে ফোন করলো কিশোর।

শুনে প্রথমে অবাক হলেন বারকেন। বুঝিয়ে বললো কিশোর।

'হ্যাঁ, এবার বুঝেছি,' বললেন তিনি। 'কোন চিৎকারটার কথা বলেছো, তা-ও বুঝেছি। ঠিক যেটা চাইছো, সেটাই দিতে পারবো। ওই চিৎকারই বিখ্যাত করেছিলো হ্যারিকে। আমি টেপটা বের করে রাখছি। মেশিনও রেডি রাখবো। এসে নিয়ে যাও। তবে কথা দিতে হবে, পরে সমস্ত ঘটনা আমাকে খুলে বলবে। রহস্যটা দারুণ ইনটারেসটিং।'

কথা দিলো কিশোর। বললো, একজন লোক পাঠাচ্ছে, টেপ আর রেকর্ডার

আনার জন্যে।

রান্নাঘর থেকে এসে রবিন, টিম আর মিসেস ডেলটনও কিশোরের কথা শুনছিলো। তার সঙ্গে লাইব্রেরিতে চললো। ঘরটার অবস্থা দেখে চমকে গেল ওরা।

'হায় হায়, করেছে কি?' মাথায় হাত দিলো রবিন। 'একেবারে লণ্ডভণ্ড...তা, কিছু পেলে?'

'এখনও পাইনি,' কিশোর বললো।

'বাড়ি ভাঙার চেষ্টা হয়েছিলো নাকি!' মিসেস ডেলটনের চোখ বড় বড় হয়ে গেছে। 'এই কাণ্ড করবে জানলে কক্ষণো খোঁজার অনুমতি দিতাম না।'

'আপনার স্বামীকে বাঁচানোর চেষ্টাই করছি আমরা, মিসেস ডেলটন,' শোঁপা বললো। 'প্রমাণ খুঁজছি। নির্দোষ যে, এটা প্রমাণ করতে হবে আদালতে। আর খুঁজতে মানা করছেন?'

'নষ্ট যা করার তো করেই ফেলেছেন। আর বাকিই বা আছে কি। খুঁজুন। দেখুন, প্রমাণ বেরোয় কিনা।'

'না, আর কিছু ভাঙবো না। হলে এখন ভালোভাবেই হবে। তবে এই-ই শেষ চেষ্টা।'

আপাতত আর কিছু করার নেই। টেপ আর রেকর্ডার এলে তারপর যা করার করবে। কাজেই বসে থাকতে হলো। গাড়ি নিয়ে মিক গেছে ওগুলো আনার জন্যে।

ঘন্টাখানেক পর ফিরলো সে। ভারি মেশিনটা নামিয়ে রাখতে রাখতে বললো, 'আরিব্বাপরে, দশ মন হবে! টেপ ঢুকিয়েই দিয়েছে এর মধ্যে। শুধু চালালেই হবে এখন।'

'কিশোর,' শোঁপা বললো, 'চালাতে পারবে এটা?'

'পারবো।' উঠে এসে চামড়ার বাক্স থেকে মেশিনটা বের করলো কিশোর। সকেটে প্লাগ ঢুকিয়ে কানেকশন দিলো। 'ভুল হয়ে গেছে। এতোক্ষণ শুধু শুধু বসে না থেকে ঘরটা গুছিয়ে ফেলতে পারতাম। ঠিক আগের মতো হবে না, যতোটা পারা যায় আরকি। ছবিগুলো জায়গা মতো ঝোলাতে হবে, আয়নাটা আগের জায়গায়। বইগুলো তাকে।'

প্রতিবাদ করতে গিয়েও কি ভেবে থেমে গেল শোঁপা। সঙ্গীদের নির্দেশ দিলো কাজ করার।

আয়নাটা লাগালো ওরা। ছবিগুলো ঝোলালো। বই যতোগুলো সম্ভব, তুলে সাজিয়ে রাখলো তাকে, আর বুকশেলফে।

'উহ্, অনেক সময় নষ্ট হয়েছে। নাও, শুরু করো,' কিশোরকে বললো শোঁপা। 'দেখো, কিছু হয় কিনা।'

টেপ চালু করে দিলো কিশোর। ভলিউম কমিয়ে রেখেছে। বসে থাকেনি সে। টেপটা চালিয়ে সেই জায়গায় নিয়ে এসেছে, যেখান থেকে শুরু হয়েছে চিৎকার। ওয়াইণ্ড করে সামান্য পিছিয়ে নিয়ে আবার প্লে-এর বোতামটা টিপে দিলো। বললো, 'সবাই চুপ, প্লীজ। একটুও শব্দ করবেন না।'

সবাই নীরব হতেই ভলিউম বাড়িয়ে দিলো কিশোর।

নারী-পুরুষের কিছু সংলাপের পর চিৎকারটা হলো। তীক্ষ্ণ, কাঁপা কাঁপা, ভয়ঙ্কর। বন্ধঘরে প্রতিধ্বনি তুললো। শেষ হলো ধীর লয়ে।

সবাই অধীর হয়ে আছে। ভাবছে, দেয়ালের কোথাও কোনো গোপন ফোকরের দরজা খুলে যাবে, কিংবা দেয়ালের কোনো জায়গায় ফাঁক দেখা দেবে আরব্য উপন্যাসের আলিবাবার গুহার মতো।

সে-রকম কিছু ঘটলো না।

'জানতাম, হবে না!' উত্তেজনায় দাঁড়িয়ে গিয়েছিলো, ধপ করে আবার বসে পড়লো শোপা। ঘাড় ডলছে। 'ওরকম কিছু থাকলে আগেই পেয়ে যেতাম। তেমন জায়গা নেই এঘরে। ছবিগুলোও নেই।'

'আমার মনে হয়, আছে,' হঠাৎ-আগ্রহে সামনে ঝুঁকে পড়লো কিশোর। একটা পরিবর্তন চোখে পড়েছে তার। বুঝতে পারছে, কোথায় লুকানো রয়েছে ছবিগুলো। 'আবার করে দেখি,' বললো সে। 'ভলিউম বোধহয় আরও বাড়াতে হবে।'

ভলিউম পুরো বাড়িয়ে দিলো কিশোর। টেপ রিওয়াইণ্ড করে প্লে-বাটন টিপলো।

ভীষণ চিৎকার যেন চিরে দিলো কানের পর্দা। চড়ছে…চড়ছে…চড়ছে…কানে আঙুল দিতে হলো সবাইকে।

এই সময় ঘটলো ঘটনাটা।

ভেঙে চুরচুর হয়ে গেল বড় আয়নাটা। ঝুরঝুর করে মেঝেতে ঝরে পড়লো কাচ। মাত্র এক সেকেণ্ডেই ফ্রেমে আটকানো কয়েকটা ছোট টুকরো ছাড়া আর সব পড়ে গেল।

আয়নার জায়গায় এখন দেখা যাচ্ছে উজ্জ্বল রঙের একটা ছবি। ওদের চোখের সামনেই গোল হয়ে মুড়ে মেঝেতে পড়ে গেল ওটা। পেছনে আরেকটা। ওটাও পড়লো। তার পেছনে আরও একটা। পর পর পাঁচটা ছবি পড়লো কাচের টুকরোর ওপর। ফ্রেমের পেছনের শক্ত পর্দা আর আয়নার মাঝখানে রাখা হয়েছিলো ছবিগুলো।

অবশেষে বোঝা গেল চেঁচানো ঘড়িতে অ্যালার্মের জায়গায় চিৎকারের ডিস্ক লাগানোর কারণ।

ছুটে গেল শোঁপা। কাচের পরোয়া করলো না, মাড়িয়ে গিয়ে নিচু হয়ে তুলে নিলো একটা ছবি। কালোর পটভূমিকায় ঝলমল করে উঠলো গাঢ় লাল, নীল, সবুজ। 'এগুলোই! হ্যাঁ, এগুলোই!' ফিসফিস করছে সে, যেন জোরে কথা বললে কাচের মতোই ছবিগুলোও চুরমার হয়ে যাবে। 'দশ লাখ ডলার...পেলাম...'

ঝটকা দিয়ে খুলে গেল লাইব্রেরির ভেজানো দরজা। তীক্ষ্ণ কণ্ঠে আদেশ এলো, 'খবরদার, নড়বে না! হাত তোলো!'

এক মুহূর্ত স্তব্ধ নীরবতা।

দরজার দিকে ঘুরে গেল সাত জোড়া চোখ।

দরজা জুড়ে দাঁড়িয়েছে দু'জন পুলিশ। হাতে উদ্যত রিভলভার। তাদের পেছনে উঁকি দিচ্ছে পুলিশ চীফ ইয়ান ফ্লেচারের মুখ। তাঁর পেছনে মুসার বাবা মিস্টার রাফাত আমান। দু'জন পুলিশের মাঝের ফাঁক বেড়ে গেল, ঠেলে সরিয়ে দেয়া হয়েছে তাদের। সেখানে দেখা দিলো আরেকটা মুখ। মাথার খুলি কামড়ে রয়েছে যেন বাঁকা তারের মতো চুল, খাটো করে ছাঁটা। কুচকুচে কালো মুখ হাসিতে উদ্ভাসিত, ছবিগুলোর মতোই ঝলমল করছে ঝকঝকে সাদা দাঁত।

'খাইছে, কিশোর,' বলে উঠলো মুসা আমান। 'একেবারে সময়মতো হাজির হয়ে গেছি, না? তা ঠিকঠাক আছো তো তোমরা? ঘুমোতে গিয়েছিলাম, বুঝলে। ঘুম এলো না। কেন যেন খালি দুশ্চিন্তা হচ্ছিলো তোমাদের জন্যে। তাছাড়া বাবা একটা কথা বলেছে, খচখচ করছিলো মনে। তোমাকে বলার জন্যে অস্থির হয়ে উঠলাম। সকালের জন্যে আর বসে থাকতে পারলাম না। উঠে ফোন করলাম তোমাদের বাড়িতে। শুনলাম রবিনদের বাড়ি গেছো। করলাম ওদের ওখানে। রবিনের মা বললো, রবিন তোমাদের ওখানে গেছে। ভাবলাম, হেডকোয়ার্টারে আছো। ফোন করলাম। ধরলো না কেউ। সন্দেহ হলো। ছুটে গেলাম ওখানে। টেবিলের ওপর পেলাম তোমার নোট। ফোন করলাম এখানে। অনেকক্ষণ চেষ্টা করেছি। কেউ ধরলো না। তাড়াতাড়ি বাড়ি গিয়ে বাবাকে বললাম। তাকে নিয়ে সোজা ছুটলাম থানায়। তারপর আর কি। পুলিশ নিয়ে চলে এলাম।'

ঘরে ঢুকলেন ইয়ান ফ্লেচার। এগিয়ে এসে শোঁপার হাত থেকে নিয়ে নিলেন ছবিটা। সাবধানে রাখলেন টেবিলে। একবার দেখেই মাথা নাড়লেন, 'চিনেছি। থানায় ফটো পাঠানো হয়েছিলো এটার। বছর দুই আগে এক গ্যালারি থেকে চুরি গিয়েছিলো।' কিশোরের দিকে ফিরলেন। 'কালই বুঝেছি, ডেঞ্জারাস কোনো কেসে জড়িয়েছো। থানার কাছেই টিমের গাড়ি থেকে ঘড়ি চুরি হয়ে গেল! ভাগ্যিস মুসা গিয়েছিলো, সময়মতো আসতে পেরেছি।'

শোঁপার দিকে তাকালো কিশোর। ধরা পড়েছে, অথচ বিন্দুমাত্র উদ্বেগ নেই

চেহারায়। শান্ত। হাসছে। ফ্লেচারের অনুমতি নিয়ে হাত নামালো। সিগার বের করে ধরালো। ধোঁয়া ছেড়ে বললো, 'চীফ, অ্যারেস্ট তো করলেন। কিন্তু আমার অপরাধ জানতে পারি?'

'সেটা আবার বলতে হবে নাকি?' মেজাজ দেখিয়ে বললেন চীফ। 'চোরাই মাল সহ হাতেনাতে ধরেছি। তাছাড়া অন্যের ঘরে বেআইনী ভাবে ঢুকে মালপত্র নষ্ট...'

'তাই?' চীফকে থামিয়ে দিলো শোঁপা। জোরে জোরে দু'বার টান দিলো সিগারে। সেটা আঙুলের ফাঁকে নিয়ে ওপরের দিকে মুখ করে হালকা ধোঁয়ার মেঘ সৃষ্টি করতে করতে বললো, অযথা লজ্জায় পড়তে যাবেন না, প্লীজ। খবরের কাগজওলারা আপনার চাকরি খেয়ে ছাড়বে। আর যদি কপাল গুণে চাকরিটা বেঁচেই যায়, অজাগা-কুজাগায় ট্রান্সফার এড়াতে পারবেন না। আমি বেআইনী কিছুই করিনি। কতগুলো চোরাই ছবি খুঁজে বের করতে এসেছি। যে-কেউ সেটা করতে পারে, পেলে পুলিশের হাতে তুলে দিয়ে বাহবা নিতে পারে। আমিও শুধু তা-ই করেছি। এই ছেলেগুলোকে জিজ্ঞেস করুন,' কিশোর, রবিন আর টিমকে দেখালো সে। 'ওরা সাক্ষী। জিজ্ঞেস করুন, ওরাও আমার সঙ্গে খুঁজেছে কিনা?'

'কিন্তু মালপত্র নষ্ট...,' খানিক আগের গলার জোর হারিয়েছেন ক্যাপ্টেন।

'অনুমতি নিয়েই করেছি। মালিকের অবর্তমানে এই বাড়ি দেখাশোনার ভার রয়েছে এই মহিলার ওপর,' টিমের মা'কে দেখালো শোঁপা। 'তাঁকে বার বার জিজ্ঞেস করেছি আমি, খুঁজবো কিনা। ছবিগুলো পাওয়া গেছে। আপনারা এসেছেন। দয়া করে নিয়ে যেতে পারেন ওগুলো। আপনারা না এলে আমি নিজে গিয়ে পৌঁছে দিয়ে আসতাম।' বিমল হাসি ছড়িয়ে পড়লো চিত্র-চোরের চেহারায়।

'কিন্তু...কিন্তু—' কথা খুঁজে পাচ্ছেন না চীফ।

'কিন্তুর কি আছে? জিজ্ঞেস করুন। সাক্ষীরা তো এখানেই আছে। ওরা মিথ্যে বলবে না। কিশোর , বলো না, আমি সত্যি বলছি. না মিথ্যে?'

চোখ মিটমিট করলো কিশোর। অনিচ্ছাসত্ত্বেও বলতে হলো, 'হ্যাঁ, স্যার, মিস্টার শোঁপা ঠিকই বলছেন। চোরাই ছবি খুঁজে বের করতে আমরাও সাহায্য করেছি তাঁকে।'

'কিন্তু ও ফেরত দিতো না!' রাগে চেঁচিয়ে উঠলেন ফ্লেচার। অসহায় ভঙ্গিতে থাবা মারলেন নিজের উরুতে। 'কিছুতেই দিতো না। নিয়ে পালিয়ে যেতো।'

'সেটা আপনার ধারণা,' শান্তকণ্ঠে বললো শোঁপা। 'প্রমাণ করতে পারবেন না। তো, আমি এখন যাই। জরুরী কাজ আছে। আর যদি অ্যারেস্ট করে নিয়ে যেতে চান, নিতে পারেন। নিজেরই ক্ষতি করবেন শুধু শুধু।'

দুই সহকারীকে হাত নামানোর ইঙ্গিত করলো শোঁপা। 'চলো! এখানে আর আমাদের দরকার নেই।'

'দাঁড়াও!' চেঁচিয়ে উঠলো একজন পুলিশ। 'এতো সহজে ছাড়া পাবে না। পুলিশের পোশাক পরার অপরাধে ওই দু'জনকে ধরতে পারি আমরা।'

'পারেন নাকি?' হাই তুললো শোঁপা, যেন ঘুম ঠেকিয়ে রাখতে পারছে না। 'এই বিল, এদিকে এসো। ওনাকে দেখাও মনোগ্রামগুলো…'

'এন.ওয়াই-পি-ডি!' অবাক হলেন চীফ।

'হ্যাঁ, স্যার,' বিনীত কণ্ঠে বললো শোঁপা। 'নিউ ইয়র্ক পুলিশ ডিপার্টমেন্ট। এটা একটা নিছক রসিকতা। ওরা দু'জনেই অভিনেতা, ভাড়া করেছি ছবিগুলো খোঁজায় সাহায্য করতে। জানেনই তো, নিউ ইয়র্ক এখান থেকে তিন হাজার মাইল দূরে, এই শহরে ওখানকার পুলিশের কাজ করার অধিকার নেই। করতে হলে আপনাদের অনুমতি নিয়ে করতে হবে। কাজেই, লস অ্যাঞ্জেলেসে নিউ ইয়র্ক পুলিশের ব্যাজ পরাটা বেআইনী কিছু নয়, আসলে কোনো ব্যাপারই নয় ওটা। ওরা নিউ ইয়র্কের আসল পুলিশ হলে অনুমতি না নেয়ার জন্যে আটকাতে পারতেন আপনারা। অভিনয়ের জন্যে পারেন না। তা-ও পারতেন, যদি পুলিশের পোশাক পরে ধাপ্পা দিয়ে কারো কোনো ক্ষতি করতো। কিছুই করেনি ওরা।'

ঢোক গিললো কিশোর। আরেকবার গাধা মনে হলো নিজেকে। অন্যদের মতো সে-ও ঠকেছে, দু'জনকে লস অ্যাঞ্জেলেসের পুলিশ মনে করে।

'এই, চলো,' সহকারীদের বলে দরজার দিকে রওনা হলো শোঁপা।

বাঘের দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন সেদিকে ক্যাপ্টেন। শক্ত হয়ে গেছে হাতের মুঠো।

দরজার কাছে গিয়ে ঘুরলো শোঁপা। হাসি হাসি মুখ করে বললো, 'কিশোর, চলি। তোমার সাথে কাজ করার মজাই আলাদা। আগেও বলেছি, আবার বলছি, আমার দলে চলে এসো। তোমার বুদ্ধি আর আমার অভিজ্ঞতা একসাথে হলে দুনিয়ার কোনো বাধাই বাধা থাকবে না আমাদের জন্যে। আসবে?'

'আপনি বরং আরেক কাজ করুন না,' পাল্টা প্রস্তাব দিলো কিশোর। 'চুরি ছেড়ে গোয়েন্দা হয়ে যান। আমাদের সঙ্গে হাত মেলান। দুনিয়ার সব না হোক, কিছু চোর অন্তত চুরি ছাড়তে বাধ্য হবে। কিংবা হাজতে ঢুকবে।'

স্থির দৃষ্টিতে এক মুহূর্ত কিশোরের দিকে তাকিয়ে রইলো শোঁপা। তারপর হাসলো। 'এ-কারণেই তোমাকে আমার পছন্দ, ইয়াং ম্যান। আই লাইক ইউ। চলি, আবার দেখা হবে।'

'আমার সঙ্গেও তোমার দেখা হবে, শোঁপা,' কঠিন কণ্ঠে বললেন ফ্লেচার।

'কথা দিচ্ছি, এবারের মতো আর বোকামি করবো না তখন। অসময়ে হাজির হবো না।'

তাঁর দিকে চেয়ে সামান্য মাথা নুইয়ে, হেসে বেরিয়ে গেল শোঁপা।

একুশ

চেঁচানো ঘড়ির কেসের বিবরণ লিখে শেষ করেছে রবিন। উপসংহারে লিখলোঃ

দক্ষিণ আমেরিকায় খোঁজ নিয়েছে পুলিশ। সত্যিই মারা গেছে হ্যারিসন ক্রুক।

সেই গ্যারেজ থেকে ধরা হয়েছে ডিংগো, মারকো আর লারমারকে। তেমনি হাতকড়া পরা অবস্থায়ই ছিলো ওরা, ছুটতে পারেনি। নিজেদের অপরাধ স্বীকার করেছে। ক্রুকই ছবিগুলো রান্নাঘরে লুকিয়েছিলো টিমের বাবাকে ফাঁসানোর জন্যে, এই জবানবন্দীও দিয়েছে আদালতে। জেল থেকে মুক্তি পেয়েছে বেকার ডেলটন।

আ স্ক্রীম অ্যাট মিডনাইট নাটকে চিৎকার করেছে ক্রুক, সেই চিৎকারই ডিস্কে রেকর্ড করে ঘড়িতে ঢুকিয়েছে। নাটকটিতে একটা দৃশ্য ছিলো, চিৎকারের শব্দে চুরচুর হয়ে ভেঙে গেছে একটা আয়না। ছবি লুকানোর ক্ষেত্রে ওই কায়দাটাকেই কাজে লাগিয়েছে ধড়িবাজ ক্রুক। তার জানা ছিলো, বিশেষ পরিবেশে, বিশেষ শব্দ তরঙ্গের জোরালো ধাক্কা সইতে পারে না পাতলা কাচ, ভেঙে যায়।

সেদিন রাতে, নাটকের ওই দৃশ্যটার কথাই বলেছিলেন মিস্টার রাফাত আমান। শুনে, মুসার মনে হয়, তথ্যটা জরুরী, কিশোরকে জানানো দরকার।

থুতনিতে কলমের মাথা ঠেকিয়ে কিছুক্ষণ ভাবলো রবিন। আর কোনো পয়েন্ট আছে? না, সবই লেখা হয়েছে। কিছু বাকি নেই। ফাইলটা বন্ধ করে, ফিতে বেঁধে, সযত্নে রেখে দিলো ফাইলিং কেবিনেটে। আগামী দিন এটা নিয়ে যাবে বিখ্যাত চিত্রপরিচালক মিস্টার ডেভিস ক্রিস্টোফারের অফিসে দেখা করার জন্যে।

ঃ শেষ ঃ

কানা বেড়াল

প্রথম প্রকাশঃ এপ্রিল ১৯৯০
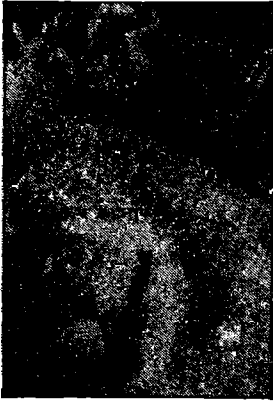
কাজে ব্যস্ত কিশোর পাশা আর মুসা আমান, এই সময় বড় বড় দুটো কাঠের গামলা নিয়ে তিন গোয়েন্দার ব্যক্তিগত ওয়ার্কশপে ঢুকলেন রাশেদ পাশা। ছেলেদের সামনে এনে মাটিতে রাখলেন ওগুলো। কোমরে হাত দিয়ে বললেন, 'কাজ নিয়ে এলাম। রঙ করতে হবে। লাল, নীল আর সাদা ডোরা।'

'ওই গামলায় রঙ ?' অবাক হলো মুসা।

'এখন ?' হাতের স্ক্রু-ড্রাইভার নেড়ে বললো কিশোর।

'তিন গোয়েন্দার জন্য একটা কি-জানি-যন্ত্র বানাচ্ছে কিশোর,' ওয়ার্কবেঞ্চে রাখা ইলেকট্রনিক যন্ত্রগুলো দেখিয়ে বললো মুসা।

'নতুন আবিষ্কার ?' আগ্রহী হলেন রাশেদ পাশা, ক্ষণিকের জন্যে ভুলে গেলেন গামলার কথা। 'কী?'

'কি জানি?' হাত নাড়লো মুসা। 'আমাকে কিছু বলে নাকি? আমি তো শুধু ওর ফাইফরমাশ খাটছি।'

'পরে করলে হয় না, চাচা?' কিশোর জিজ্ঞেস করলো।

'না, আজ রাতেই দরকার। ঠিক আছে, তোমরা না পারলে বোরিস আর রোভারকে গিয়ে বলি,' মিটিমিটি হাসি রাশেদ পাশার চোখের তারায়। 'কিন্তু তাহলে গামলাগুলো ডেলিভারিও দেবে ওরাই।'

সতর্ক হয়ে উঠলো কিশোর। 'মানে?'

রাশেদচাচার সারা মুখে হাসি ছড়ালো। ধরো, ওই গামলাগুলোকে সিংহের আসন বানানো হলো। কেমন হবে?'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকালো মুসা, 'সিংহেরা শুধু এই তালেই আছে। কখন লাল-নীল চেয়ারে বসবে।'

কিশোর হাসছে না। চোখ উজ্জ্বল। 'ঠিক বলেছো, চাচা, খুব ভালো হয়। উপুড় করে বসালে চমৎকার সীট হবে সিংহের···তবে অবশ্যই সার্কাসে!'

'খাইছে ! সার্কাস !' হাসি মুছে গেল মুসার মুখ থেকে। 'গামলা ডেলিভারি দিতে গেলে সার্কাসের ভেতরটা ঘুরিয়ে দেখাবে আমাদেরকে?'

'ঠিক সার্কাস নয়,' হাসিমুখে খবর জানালেন রাশেদ পাশা। 'কারনিভল। আমাদের দেশের মেলা আরকি। নানা রকমের খেলা, আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা আছে। কাল রাতে এসে আস্তানা গেড়েছে রকি বীচে। সিংহ বসার বেদীগুলো নাকি পুড়ে গেছে। মুশকিলে পড়েছে বেচারা লায়ন ট্রেনার। কিসে বসিয়ে সিংহের খেলা দেখায়? অনেক খুঁজেও ওরকম বেদী কোনোখানে পেলো না, শেষে আমাদের ফোন করলো, পুরনো বেদী-টেদী যদি থাকে। নেই, বলেছি। শেষে আমিই পরামর্শ দিয়েছি, গামলা দিয়ে আসন বানানো সম্ভব,' কথা থামিয়ে বিশাল গোঁফের কোণ ধরে টানলেন তিনি। 'ওগুলো পেলে খুব উপকার হবে ওদের। হয়তো ঘুরিয়ে দেখাতেও পারে।'

'কিশোর!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠলো মুসা। 'তাহলে আর দেরি করছি কেন আমরা? রঙ আনো। আমি স্প্রে গান রেডি করছি।'

আধ ঘন্টার মধ্যেই রঙ হয়ে গেল। শুকাতে সময় লাগবে। এই সুযোগে সাইকেল নিয়ে রবিনকে খবর দিতে চললো মুসা, রকি বীচ পাবলিক লাইব্রেরিতে, যেখানে পার্টটাইম চাকরি করে রবিন মিলফোর্ড। শুনে, রবিনও উত্তেজিত। সময় আর কাটে না, কখন অফিস ছুটি হবে। ছুটির পর আর এক মুহূর্ত দেরি করলো না। সাইকেল নিয়ে ছুটলো স্যালভিজ ইয়ার্ডে।

তাড়াতাড়ি মুখে কিছু গুঁজে রাতের খাওয়া শেষ করলো তিন গোয়েন্দা। সাড়ে সাতটা নাগাদ বেরিয়ে পড়লো। গামলা দুটো বেঁধেছে কিশোর আর মুসার সাইকেলের ক্যারিয়ারে।

দূর থেকেই চোখে পড়লো কারনিভলের আলো। একটা পরিত্যক্ত পার্কের পাশে অসংখ্য তাঁবু আর কাঠের ছোট ছোট খুপড়ি। সাময়িক তারের বেড়া, যাওয়ার সময় আবার তুলে নিয়ে চলে যাবে। জোরে জোরে বাজনা বাজছে মানুষকে আকৃষ্ট করার জন্যে। ঘুরছে শূন্য নাগরদোলা। একটা পথের মাথায় দাঁড়িয়ে আছে দু'জন ভাঁড়।

লায়ন ট্রেনারের তাঁবু খুঁজে বের করতে অসুবিধে হলো না। লাল কাপড়ে সাদা অক্ষরে লিখে বিজ্ঞাপন টানানো হয়েছেঃ কিং—দুনিয়ার সবচেয়ে বুদ্ধিমান সিংহ। তাঁবুর সামনে দাঁড়িয়ে লম্বা একজন লোক, পরনে গাঢ় নীল পোশাক, পায়ে চকচকে বুট; ওদের দেখে এগিয়ে এলো। গোঁফে তা দিয়ে বললো, 'এসে গেছো! দেখি? ভালো হয়েছে তো?'

'পাশা স্যালভিজ ইয়ার্ড কখনও বাজে মাল সাপ্লাই দেয় না,' কিশোর বললো।

'বাহ্,' হেসে উঠলো লোকটা। 'একেবারে বারকারদের মতো কথা বলছো, ইয়াং ম্যান।'

'বারকার কি, স্যার?' জিজ্ঞেস করলো মুসা।

'আন্দাজ করো তো,' মিটিমিটি হাসছে লোকটা।

'বাজি রেখে বলতে পারি, আমাদের কিশোর জানে,' ঘোষণা করলো রবিন।

তাকে নিরাশ করলো না গোয়েন্দাপ্রধান। 'বারকার হলো, যে সার্কাস কিংবা কারনিভলের বাইরে দাঁড়িয়ে দর্শকদের জানায়, ভেতরে কি মজার মজার ব্যাপার হচ্ছে। এটা এক ধরনের বিজ্ঞাপন, পুরনো।'

'জানো তাহলে,' লোকটা বললো। 'আরও নাম আছে ওদের। কেউ বলে স্পাইলার, কেউ পিচম্যান। যতোই বোঝাও বারকারদের, লাভ হবে না, বাড়িয়ে বলবেই। আসলে ওটাই ওদের কাজ। তবে খুব ভালো আর অভিজ্ঞ বারকারের মিথ্যে বলার প্রয়োজন পড়ে না, সত্যি কথা বলেই দর্শক আকৃষ্ট করতে পারে। এই আমাদের বারকারের কথাই ধরো না, কিঙের কথা এক বর্ণ বাড়িয়ে বলবে না সে। অথচ যা বলবে তাতেই লোকে দেখার জন্যে পাগল হয়ে উঠবে। সিংহকে ট্র্যাপিজের খেল দেখাতে দেখেছো কখনও?'

'খাইছে!' চোখ বড় বড় হয়ে গেল মুসার। 'সিংহ আবার ট্র্যাপিজে উঠতে পারে নাকি?'

'আমাদেরটা পারে। বিশ্বাস না হলে নিজের চোখেই দেখবে। আর ঘন্টাখানেকের মধ্যেই ফার্স্ট শো শুরু হবে। এসো, তোমরা আমার মেহমান। টিকেট লাগবে না।...ও, আমি মারকাস। মারকাস দ্য হারকিউলিস।'

বাইরে চেঁচিয়ে চলেছে বারকার। ইতিমধ্যেই দর্শক জমেছে কয়েকজন।

নাগরদোলায় চড়লো তিন গোয়েন্দা। কয়েক চক্কর ঘুরে নেমে এলো। ব্রাস রিঙের কাছে এসে ছোঁয়ার চেষ্টা করলো। রবিন আর কিশোর ব্যর্থ হলো, মুসা পারলো একবার। ভাঁড়ের ভাঁড়ামি দেখলো কিছুক্ষণ, তারপর চললো গেম বুদের দিকে, যেখানে ডার্ট ছোঁড়া, রিং নিক্ষেপ আর রাইফেল শুটিঙের প্রতিযোগিতা হয়।

'আমার মনে হয় ফাঁকিবাজি আছে,' খানিকক্ষণ দেখে বললো রবিন। 'দেখছো না কি সহজেই জায়গামতো লাগিয়ে দিচ্ছে।'

'না,' মাথা নাড়লো কিশোর। 'মারতে মারতে ওস্তাদ হয়ে গেছে ওরা। হিসেব করে মারে...'

তার কথা শেষ হলো না। চিৎকার শোনা গেল, 'ফাঁকিবাজ! দাও, দাও ওটা! আমি পুরস্কার পেয়েছি!'

চেঁচাচ্ছে লম্বা এক প্রৌঢ়, মাথায় স্লাউচ হ্যাট। পুরু গোঁফ। চোখে কালো কাচের চশমা। অন্ধকার হয়ে আসছে, এ-সময় সাধারণত ওরকম চশমা পরে না লোকে। শুটিং গ্যালারির দায়িত্বে এক সোনালি চুল কিশোর, তাকেই গালিগালাজ করছে লোকটা। ছেলেটার হাতে একটা স্টাফ করা জানোয়ার। হঠাৎ ওটা কেড়ে নিয়ে তিন গোয়েন্দার দিকে দৌড়ে এলো প্রৌঢ়।

চেঁচিয়ে উঠলো সোনালি চুল ছেলেটা, 'ধরো, ধরো ওকে! চোর, চোর!'

দুই

ছেলেটার চিৎকারে পেছনে তাকাতে গিয়ে সোজা এসে কিশোরের গায়ের ওপর পড়লো লোকটা। তাল সামলাতে না পেরে তাকে নিয়ে পড়লো মাটিতে।

'আঁউউ' করে উঠলো কিশোর।

ছুটাছুটি শুরু করলো কয়েকজন দর্শক। দৌড়ে এলো প্রহরী।

'এই, এই, থামো!' কালো চশমাওয়ালাকে বললো এক প্রহরী।

উঠে দাঁড়িয়েছে লোকটা। জানোয়ারটা বগলের তলায় চেপে রেখে কিশোরকে ধরলো। আরেক হাতে বেরিয়ে এসেছে একটা লম্বা ছুরি। কর্কশ কণ্ঠে হুমকি দিলো, 'খবরদার, কাছে আসবে না!' কিশোরকে টেনে নিয়ে চললো গেটের দিকে।

বোকা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে রবিন আর মুসা। চোরটাকে ধরার জন্যে এগোলো দুই প্রহরী। ওদেরকে দেখে ফেললো সে। ক্ষণিকের জন্যে অসতর্ক হলো, মুহূর্তটার সদ্ব্যবহার করলো কিশোর। ঝাড়া দিয়ে লোকটার হাত থেকে ছুটে দিলো দৌড়। গাল দিয়ে উঠে তাকে ধরার জন্যে হাত বাড়ালো সে, ধরতে পারলো না। কিশোরের কাঁধে বাড়ি লেগে হাত থেকে ছুটে গেল ছুরিটা। উড়ে গিয়ে পড়লো মাটিতে।

তোলার সময় নেই বুঝে সে-চেষ্টা করলো না চোরটা। বগলের জানোয়ার-টাকে হাতে নিয়ে ঝেড়ে দৌড় দিলো গেটের দিকে।

প্রহরীরা পিছু নিলো। ছেলেরাও ছুটলো ওদের পেছনে। ঘুরে সাগরের ধার দিয়ে দৌড়াতে লাগলো লোকটা। উঁচু কাঠের বেড়ার এক ফাঁক দিয়ে ঢুকে গেল পরিত্যক্ত পার্কের ভেতরে।

পিস্তল বের করলো দুই প্রহরী। ইশারায় ছেলেদেরকে আসতে বারণ করে নিজেরা সাবধানে ঢুকলো পার্কের ভেতরে। আর ফেরার নাম নেই। অধৈর্য হয়ে উঠলো কিশোর। বললো, 'নিশ্চয় কিছু হয়েছে। চলো তো দেখি!'

বেড়ার ধার ঘুরেই থেমে গেল আবার। প্রহরীরা দাঁড়িয়ে আছে। চোরটা নেই।

ঘাসে ঢাকা ছোট্ট একটুকরো খোলা জায়গা। ডানে উঁচু বেড়া, বাঁয়ে মহাসাগর। পানিতে গিয়ে নেমেছে বেড়ার একমাথা। বেড়ার ওই অংশ কাঠের বদলে চোখা শিকের তৈরি। ওরা যেদিক দিয়ে ঢুকেছে, একমাত্র সেদিকটাই খোলা।

'গেল কোনখান দিয়ে!' বিড়বিড় করলো এক প্রহরী।

'সাঁতরে যায়নি তো?' রবিন বললো।

'না। তাহলে দেখে ফেলতাম।'

'কিন্তু এখানেই তো ঢুকতে দেখলাম,' ভোঁতা গলায় কিশোর বললো।

চারপাশে দেখতে দেখতে আচমকা চেঁচিয়ে উঠলো মুসা। 'দেখো!' এগিয়ে গিয়ে কি একটা জিনিস কুড়িয়ে নিলো। সবাই দেখলো, সেই স্টাফ করা জানোয়ারটা, যেটা নিয়ে পালাচ্ছিলো চোর। তারমানে ব্যাটা এখানে এসেছিলো।

'নিয়ে পালাতে অসুবিধে হচ্ছিলো বোধহয়,' রবিন মন্তব্য করলো। 'ফেলে গেছে। কিন্তু পালালো কিভাবে?'

'নিশ্চয় বেড়ায় কোনো ফাঁকফোকর আছে,' বললো আরেক প্রহরী।

'কিংবা দরজা,' বললো দ্বিতীয় প্রহরী।

'বেড়ার নিচে সুড়ঙ্গও থাকতে পারে,' মুসার অনুমান। বেড়ার একমাথা থেকে আরেকমাথা ভালোমতো খুঁজে দেখলো ওরা। মানুষ পালাতে পারে, এরকম কোনো গুপ্তপথই দেখলো না।

'নাহ্, কিচ্ছু নেই,' আনমনে নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটলো কিশোর।

'ব্যাটার নিশ্চয় পাখা গজিয়েছে,' এক প্রহরী বললো। 'উড়ে যাওয়া ছাড়া তো আর কোনো পথ দেখি না।'

'তাই তো,' বললো দ্বিতীয় প্রহরী। 'বারো ফুট উঁচু বেড়া। ওড়া ছাড়া উপায় কী?'

চিন্তিত ভঙ্গিতে বেড়ার ওপরের দিকে তাকিয়ে আছে কিশোর। 'সাঁতরে যায়নি বলছেন। বেড়ার নিচে সুড়ঙ্গ নেই। মানুষের পাখা গজানোও সম্ভব নয়। বেড়া পেরোনোর একটাই পথ, ডিঙিয়ে যাওয়া।'

'মাথা খারাপ!' বললো প্রথম প্রহরী। 'ওই বেড়া ডিঙাবে কি করে?

'কিশোর,' মুসাও বললো। 'কিভাবে? বেয়ে ওঠা অসম্ভব।'

'আমিও তাই বলি,' একমত হলো রবিন।

'যাওয়ার আর যখন কোনো পথ নেই, অসম্ভবকেই কোনোভাবে সম্ভব করেছে,' কিশোর বললো। 'এছাড়া বিশ্বাস যোগ্য আর কি ব্যাখ্যা আছে?'

আর কোনো ব্যাখ্যা দিতে না পেরে এক প্রহরী বললো, 'চলে যখন গেছে, ওটা নিয়ে ভেবে আর লাভ নেই। আমাদের জিনিস তো ফেলে গেছে। চলো, যাই।' জানোয়ারটার জন্যে মুসার দিকে হাত বাড়ালো সে।

বেড়ার দিকে তখন তাকিয়ে আছে কিশোর। প্রহরীর দিকে ফিরলো। 'গ্যালারিতেই যাচ্ছি। আমরাই নিয়ে যাই।'

'তাহলে তো ভালোই হয়। আমাদের সময় বাঁচে। নিয়ে যাও। আমরা থানায় যাচ্ছি ডায়েরী করাতে।'

প্রহরীরা চলে গেল।

গ্যালারির দিকে হাঁটতে হাঁটতে মুসা বললো, 'গ্যালারিতে কেন আবার? শুটিং করে পুরস্কার নিতে?'

'চেষ্টা করতে দোষ কি? তবে সেজন্যে যাচ্ছি না। যাচ্ছি, সোনালি চুল ছেলেটাকে জিজ্ঞেস করতে, জিনিসটা কেন ছিনিয়ে নিচ্ছিলো চোর,' মুসার হাতের জানোয়াটার দিকে ইঙ্গিত করলো কিশোর।

এই প্রথম ওটাকে ভালো করে দেখার সুযোগ পেলো তিন গোয়েন্দা। স্টাফ করা একটা বেড়াল, লাল-কালো ডোরা। পা-গুলো বিচিত্র ভঙ্গিতে বাঁকানো, শরীরটাও। হাঁ করা মুখে সাদা ধারালো দাঁত। এক কান খাড়া, আরেক কান নিচে নামানো। একটা মাত্র চোখ, লাল, আরেকটা কানা। গলায় পাথর বসানো লাল কলার। এরকম অদ্ভুত বেড়াল জীবনে এই প্রথম দেখছে ওরা।

'এই জিনিস চাইছিলো কেন লোকটা?' কিশোরের প্রশ্ন। 'দেখে তো দামি কিছু মনে হয় না।'

'হয়তো স্টাফ করা জানোয়ার সংগ্রহের বাতিক আছে,' রবিন বললো। 'পছন্দের জিনিস জোগাড়ের জন্যে চুরি করতেও দ্বিধা করে না অনেকে।'

'কিন্তু তাই বলে স্টাফ করা বেড়াল?' মুসা মানতে পারলো না। 'তা-ও আবার কারনিভলের শুটিং গ্যালারি থেকে? কতো আর দাম ওটার, বলো?'

'দামের ব্যাপারে মাথা ঘামায় না ওরা,' কিশোর বললো। 'কোটিপতি লোকও চুরি করে। কিন্তু আমাদের এই চোরটাকে সেরকম কেউ মনে হলো না। কে জানে, হয়তো হেরে গিয়ে জেদের বশেই করেছে কাজটা।'

'হেরে গেলেও অবশ্য আমি করতাম না। তবে, আমাকে ঠকানোর চেষ্টা করলে অন্য কথা...'

শুটিং গ্যালারিতে ঢুকলো ওরা। কাউন্টারের ওপাশ থেকে হেসে স্বাগত জানালো ওদেরকে সোনালি-চুল ছেলেটা। 'কি সাংঘাতিক! চোরটাকে ধরেছে?' জিজ্ঞেস করলো সে।

'পালিয়েছে,' হাতের বেড়ালটা দেখালো মুসা। 'এটা ফেলে।' যার জিনিস তাকে ফিরিয়ে দিলো সে।

'যাবে কোথায়? পুলিশ ধরে ফেলবে,' বলতে বলতে রেগে গেল ছেলেটা। 'পাঁচটা হাঁসের মাত্র তিনটা ফেলেছে, অথচ বলে কিনা আমি ঠকিয়েছি,' আবার হাসলো সে। 'আমি রবি কনর। এই বুদ আমার। তোমরা কি এ-লাইনের?'

চোখ মিটমিট করলো রবিন। 'মানে?'

'ও বলতে চাইছে,' কিশোর বুঝিয়ে দিলো, 'আমরাও ওর মতো কারনিভল কিংবা সার্কাসের লোক কিনা।...না, রবি, আমরা অন্য কাজ করি। রকি বীচেই থাকি। আমি কিশোর পাশা...ও মুসা আমান...আর ও হলো রবিন মিলফোর্ড।

তিনজনে একই ইস্কুলে একই ক্লাসে পড়ি, বন্ধু।'

'খুব খুশি হলাম,' তারপর গর্বিত ভঙ্গিতে যোগ করলো সোনালি-চুল, 'আমি কিন্তু এ-লাইনের ফুল অপারেটর। পাঙ্ক কিংবা রাফনেক নই।'

'কি বললো ও?' কিশোরের দিকে চেয়ে ভুরু নাচালো মুসা। 'ভিনগ্রহের ভাষা?'

'না, এই গ্রহেরই। পাঙ্ক হলো কারনিভলের শিক্ষানবিস, আর রাফনেক শ্রমিক গোছের লোক। রবি, তোমার বয়েসে ফুল অপারেটর হওয়া একটু অস্বাভাবিক না?'

'এই কারনিভলের মালিক আমার বাবা তো,' বলেই বুঝলো বোকামি হয়ে গেছে, কথা ঘুরিয়ে ফেললো রবি। 'বাবা বলে, যেকোনো কারনিভলে ফুল অপারেটরের কাজ চালাতে পারবো আমি। তা তোমরা খেলবে নাকি? পুরস্কার জিততে চাও?'

'ওই কানা বেড়ালটা জিততে চাই আমি,' মুসা বললো।

'বাহ্, ভালো নাম দিয়ে ফেলেছো তো! কানা বেড়াল...হাহ্ হাহ্!'

'যাও না, দেখো চেষ্টা করে,' কিশোর বললো মুসাকে। 'রবি, বেড়ালটা পুরস্কারের জন্যে তো ?'

হাসলো রবি। 'নিশ্চয়। তবে পাঁচ গুলিতে পাঁচটা হাঁসই ফেলতে হবে। আমি নাম দিয়েছিলাম বাঁকা বেড়াল, কিন্তু কানা বেড়াল শুনতে ভাল্লাগছে। ঠিক আছে, কানা বেড়ালই সই। ওটা ফার্স্ট প্রাইজ। জেতা কঠিন। তা-ও জিতে নিয়ে গেছে লোকে, চারটে। আর মাত্র একটাই আছে।'

'বেশ, পঞ্চমটা আমি জিতবো,' সদম্ভে ঘোষণা করলো মুসা। এগিয়ে গিয়ে কাউন্টারের সঙ্গে শেকল দিয়ে বাঁধা রাইফেলটা তুলে নিলো।

'দাঁড়াও, দাঁড়াও!' হাত নাড়লো রবি। প্রায় লাফ দিয়ে এসে দাঁড়ালো কাছে।

তিন

'কী?' সচকিত হলো মুসা।

'পয়সা,' হেসে, খাঁটি পেশাদারি ভঙ্গিতে হাত বাড়ালো রবি। 'আগে পয়সাটা দিয়ে নাও।'

'এরকম করেই কথা বলো নাকি তুমি?' রবিনও অবাক হয়েছে।

পকেট থেকে পয়সা বের করে দিলো মুসা। সেটা হাতে নিয়ে রবি বললো, 'বাবা বলে, আমার রক্তেই রয়েছে কারনিভল। জাত কারনিভল-ম্যান।'

রাইফেল কাঁধে ঠেকিয়ে নিশানা করলো মুসা। সাবধানে টিপলো ট্রিগার। পড়ে গেল একটা খেলনা হাঁস। পর পর গুলি করে আরও দুটো ফেলে দিলো।

'বাহ্, ভালো হাত তো তোমার,' হাততালি দিলো রবি। 'সাবধান। এখনও দুটো বাকি।'

আবার গুলি করলো মুসা। ফেলে দিলো চতুর্থটা।

'আরি!' মুসাকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করার জন্যে বললো রবি, ঘাবড়ে দিয়ে তার হাত কাঁপিয়ে দিতে চায়। সত্যি জাত কারনিভল-ম্যান, ভুল বলে না তার বাবা। 'সাংঘাতিক তো! তবে শেষটা ফেলা খুব কঠিন। ভালো মতো সই করো।'

রবির উদ্দেশ্য বুঝে কিশোর বললো, 'কাকে কি বলছো, রবি? আফ্রিকায় সিংহ শিকারে যাওয়ার জন্যে তৈরি হচ্ছে ও, উড়ন্ত ঘুঘু ফেলে দেয়, আর এ-তো কিছুই না। মারো, মুসা, ফেলে দাও। বেড়ালটা আমাদের দরকার।'

ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে আছে রবি। বুঝতে পারছে, বিফল হয়েছে সে। স্থির হয়ে আছে মুসার হাত, রাইফেল ধরা আঙুলগুলো নিথর। ট্রিগারে আলতো চাপ।

পড়ে গেল পঞ্চম হাঁসটাও।

'জিতেছি!' চেঁচিয়ে উঠলো মুসা। গলা কাঁপছে। ভেতরে ভেতরে প্রচণ্ড উত্তেজিত, গুলি করার সময় অনেক কষ্টে চেপে রেখেছিলো।

'দারুণ দেখিয়েছো, মুসা,' গোয়েন্দা-সহকারীর পিঠ চাপড়ে দিলো রবি। 'চমৎকার নিশানা।' বেড়ালটা তার হাতে দিতে দিতে বললো, 'এই নাও, ফার্স্ট প্রাইজ শেষ। নতুন কোনো পুরস্কারের ব্যবস্থা করতে হবে। অ্যানটিক কয়েকটা ছুরি আছে, ওয়েস্টার্ন কাউবয়রা ব্যবহার করতো।'

চোখ চকচক করে উঠলো কিশোরের। ছুরি তার খুব পছন্দ। ওয়েস্টার্ন কাউবয়দের জিনিস শুনে লোভ সামলাতে পারলো না। তাড়াতাড়ি পয়সা বের করে দিলো রবির হাতে। রাইফেল তুলে নিলো।

'পাঁচটা ফেলতে হবে কিন্তু,' মনে করিয়ে দিলো রবি।

পর পর দুটো হাঁস ফেললো কিশোর। পরের তিনটে মিস করলো। একবারের বেশি সুযোগ দেয়ার নিয়ম নেই, মুখ কালো করে সরে দাঁড়ালো সে।

'আমি দেখি তো,' রবিন এগিয়ে এলো। পয়সা দিয়ে রাইফেল তুলে নিলো। ছুরিটা পেলে কিশোরকে উপহার দেবে।

সে-ও দুটোর বেশি ফেলতে পারলো না।

ইতিমধ্যে জমে উঠছে কারনিভল, ভিড় বাড়ছে। শুটিং গ্যালারিতেও বেশ লোক জমেছে।

তিন গোয়েন্দাকে অনুরোধ করলো রবি, 'তোমরা একটু থাকবে এখানে? আমি চট করে গিয়ে ছুরিগুলো নিয়ে আসি। এই কাছেই আছে।'

'তিনজনকেই থাকতে হবে?' মুসা বললো।

'কেন, আসতে চাও? বেশ, এসো। ইচ্ছে করলে আরও একজন আসতে পারো। এখানে একজন থাকলেই চলবে।'

'রবিন, তুমি যাও,' কিশোর বললো। 'আমি থাকি।'

গ্যালারির পেছনে দুই গোয়েন্দাকে নিয়ে এলো রবি। কারনিভলের মূল এলাকার চেয়ে আলো এখানে কম। ছোট একটা ব্যাগেজ ট্রেলার দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে।

'কাছেই রাখি,' কারণ জানালো রবি, 'চোরের ভয়ে। সুযোগ পেলেই এটা ওটা নিয়ে চলে যায়। তাই চোখে চোখে রাখতে হয়।'

ঢাকনা খুলে ভেতর থেকে একটা পোঁটলা বের করলো রবি। সেটা থেকে ছুরির বাক্স বের করে রবিনের হাতে দিলো, 'ধরো, আমি ঢাকনা…,' হঠাৎ থেমে গেল সে। মুসার পেছনে তাকিয়ে আছে, চোখ বড় বড়। 'কি সাংঘাতিক! একদম চুপ! নড়বে না কেউ!' ফিসফিসিয়ে বললো।

ভ্রূকুটি করলো রবিন। 'বোকা বানানোর চেষ্টা কোরো না, রবি। ওসব কারনিভলের কায়দা…'

'চুপ!' রবির কণ্ঠে ভয় মেশানো উত্তেজনা। 'আস্তে, খুব আস্তে ঘোরো। কিং!'

স্থির হয়ে গেল দুই গোয়েন্দা। ঢোক গিললো মুসা। ধীরে ধীরে ঘুরলো দু'জনেই। শুটিং গ্যালারির পরে আরেকটা বুদ, কোনো ধরনের খেলা দেখানোর জায়গা। কারনিভলে ঢোকার মূল গলিপথ থেকে দেখা যায় না ওই বুদের পেছনটা। মাঝে ঘাসে ঢাকা একটুকরো খোলা জায়গা। সেখানে, ছেলেদের কাছ থেকে বড় জোর বিশ ফুট দূরে দাঁড়িয়ে আছে কালো কেশরওয়ালা এক মস্ত সিংহ।

চার

'শুটিং গ্যালারির দিকে পিছিয়ে যাও,' নিচু গলায় বললো রবি। 'তাড়াহুড়ো করবে না। বুনো নয় কিং, পোষা, ট্রেনিং পাওয়া। কিন্তু চমকে গেলে বিপদ বাধাবে। বুদে ঢুকতে পারলেই আমরা নিরাপদ। ফোন আছে ওখানে, সাহায্য চাইতে পারবো।'

ছেলেরা ছাড়া আর কারও চোখে পড়েনি এখনও সিংহটা। জ্বলজ্বলে হলুদ চোখ। হাঁ করে বিকট হলদে দাঁত দেখালো। ঝাঁকি দিলো রোমশ কালো লেজের ডগা।

'না, রবি,' মুসার কণ্ঠ কাঁপছে। 'রাস্তার দিকে চলে যেতে পারে সিংহটা। তখন?'

'কিন্তু আর কি করবো? মারকাস ছাড়া সামলাতে পারবে না ওকে।'

সিংহের চোখে চোখ রাখলো মুসা। ফিসফিসিয়ে বললো, 'তুমি রবিনকে নিয়ে চলে যাও। জানোয়ার সামলানোর অভিজ্ঞতা আছে আমার, দেখি চেষ্টা করে। তুমি গিয়ে মারকাসকে পাঠাও।'

'মুসাআ!' বন্ধুকে বিপদে ফেলে যেতে চাইছে না রবিন।

তার কণ্ঠ শুনে মৃদু গর্জন করে উঠলো সিংহটা।

'জলদি যাও!' ফিসফিসিয়ে জরুরী কণ্ঠে বললো মুসা। তাকিয়ে আছে সিংহের দিকে।

পিছাতে শুরু করলো রবিন আর রবি। ওদের দিকে চেয়ে এক কদম আগে বাড়লো সিংহ। খাঁচা থেকে বেরিয়ে দ্বিধায় পড়ে গেছে, অস্বস্তিতেও বোধহয়। শান্ত, দৃঢ়কণ্ঠে আদেশ দিলো মুসা, 'থামো, কিং। শোও...শুয়ে পড়ো।'

চট করে ফিরে তাকালো সিংহ। পা বাড়াতে গিয়ে থেমে গেল। হলুদ চোখে সতর্কতা।

'এই তো, লক্ষ্মী ছেলে, লক্ষ্মী কিং।'

ধীরে ধীরে লেজ দোলাচ্ছে সিংহ। অচেনা একটা ছেলের মুখে নিজের নাম আর আদেশ শুনে অবাক হয়েছে যেন। কোনো দিকেই তাকালো না মুসা। ক্ষণিকের জন্যেও চোখ সরালো না সিংহের চোখ থেকে। আবার বললো, 'শোও...শুয়ে পড়ো, কিং।'

এক মুহূর্ত বিরতি দিয়ে গলা সামান্য চড়িয়ে শেষবার আদেশ দিলো, 'শোও, কিং! কথা শোনো!'

চাবুকের মতো লেজ আছড়ালো সিংহ। আশেপাশে তাকিয়ে কী যেন বোঝার চেষ্টা করলো, তারপর ধপ করে গড়িয়ে পড়লো ঘাসের ওপর। বিশাল মাথা তুলে বেড়ালের মতো তাকালো মুসার দিকে, ঘড়ঘড় শুরু করবে বুঝি এখুনি।

'গুড, কিং।'

হঠাৎ পেছনে কথা সোনা গেল। লম্বা পায়ে মুসার পাশ দিয়ে সিংহের দিকে এগিয়ে গেল মারকাস। হাতে একটা বেত আর একটা শেকল। মোলায়েম গলায় কথা বলতে বলতে যাচ্ছে, খানিক আগে মুসা যেরকম করে বলেছিলো। বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে কেশরে ঢাকা মোটা গলাটায় শেকল পরিয়ে দিলো। তারপর টানতে টানতে নিয়ে চললো খাঁচার দিকে। সিংহটাও প্রতিবাদ করলো না, শান্ত সুবোধ প্রভুভক্ত কুকুরের মতো চলেছে পিছে পিছে।

ঢোক গিললো মুসা। উত্তেজনা প্রশমিত হতেই ফ্যাকাসে হয়ে গেল মুখ। বিড়বিড় করলো, 'খাইছে!'

পাশে এসে দাঁড়ালো রবিন, কিশোর আর রবি।

'দারুণ দেখিয়েছো!' রবি বললো।

'সত্যিই দারুণ, সেকেণ্ড!' এভাবে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা সাধারণত করে না গোয়েন্দাপ্রধান, লোকের দোষই বেশি দেখে। আর খুঁতখুঁত করে। 'কিং যে ছুটেছে, কেউ জানে না। একটা দুর্ঘটনা বাঁচিয়েছো।'

এতো প্রশংসায় লজ্জা পেলো মুসা। জবাব দেয়ার আগেই দেখলো ফিরে আসছে মারকাস দ্য হারকিউলিস। কাছে এসে শক্ত করে চেপে ধরলো মুসার কাঁধ। 'খুব, খুবই সাহসী তুমি, ইয়াং ম্যান। বলা যায় দুঃসাহসই দেখিয়ে ফেলেছো।

এমনিতে কিং শান্ত, কিন্তু লোকে ভয় পেয়ে হৈ-চৈ শুরু করলে ঘাবড়ে যেতো সে। বিপদ ঘটতো।'

আরও অস্বস্তিতে পড়লো মুসা, কোনোমতে হাসলো। 'আমি জানতাম, স্যার, ও পোষা। নইলে কখন ভাগতাম।'

'তবু আমি বলবো দুঃসাহস দেখিয়েছো। খাঁচার ভেতর সিংহ দেখেই কতোজনে ভয় পেয়ে যায়।' তিন গোয়েন্দার দিকে চেয়ে চোখ নাচালো লায়ন ট্রেনার। 'কিঙের খেলা দেখবে?'

'দেখাবেন?' উৎসাহে প্রায় চেঁচিয়ে উঠলো মুসা। 'কখন?'

'কয়েক মিনিটের মধ্যেই খেলা শুরু হবে।'

নিজের তাঁবুতে ফিরে চললো মারকাস। ওখানে আরও কিছুক্ষণ কাটিয়ে, রবি ফিরে গেল তার নিজের বুদে। শুটিং গ্যালারিতে তখন রীতিমতো ভিড় জমেছে।

সিংহের খেলা যে তাঁবুতে দেখানো হবে সেদিকে রওনা হলো তিন গোয়েন্দা। পথে দেখা গেল, দর্শক জমিয়ে ফেলেছে দুই ভাঁড়। একজন বেঁটে, মোটা। আরেকজন লম্বা, পাতলা নাক, বিষণ্ন চেহারা, সাদা রঙ মেখে আরও বিষণ্ন করে ফেলেছে। ভবঘুরে সেজেছে সে। ঢোলা প্যান্টের পায়ের কাছটা বেঁধেছে দড়ি দিয়ে। তার সঙ্গী হাসিখুশি। নানারকম শারীরিক কসরত দেখাচ্ছে, ডিমে তা-দেয়া মুরগীর মতো বিচিত্র শব্দ করছে গলা দিয়ে।

বিষণ্ন চোখে সঙ্গীর খেলা দেখছে লম্বা ভাঁড়, তাকে অনুসরণের চেষ্টা করে ব্যর্থ হচ্ছে। করুণ করে ফেলছে চেহারা। আবার চেষ্টা করছে, আবার বিফল হচ্ছে। বিষণ্ন থেকে বিষণ্নতর হয়ে যাচ্ছে চেহারা। তার এই কাণ্ড দেখে দর্শকরা হেসে অস্থির। শেষে, কঠিন একটা খেলা দেখাতে গিয়ে ইচ্ছে করেই ব্যর্থ হয়ে হাত-পা ছড়িয়ে চিত হয়ে পড়লো বেঁটে ভাঁড়। অবশেষে হাসি ফুটলো লম্বার মুখে।

'চমৎকার অভিনয়,' কিশোর বললো। সে নিজে ভালো অভিনেতা, তিন বছর বয়েসেই অভিনয় করেছে টেলিভিশনে। ফলে কারও ভালো অভিনয় দেখলে ভালো লাগে তার।

সিংহের তাঁবুর দিকে চললো আবার ওরা। তাঁবুর এধারে পর্দা দিয়ে আলাদা করা। এপাশে দর্শকদের দাঁড়ানোর জায়গা। বড় একটা খাঁচা, মাঝে শিকের আলগা বেড়া দিয়ে আলাদা করা। ভেতরে সেই গামলা দুটো, পাশা স্যালভিজ ইয়ার্ড থেকে রঙ করে আনা হয়েছে যেগুলো। খাঁচার ছাত থেকে ঝুলছে একটা ট্র্যাপিজ।

ছেলেরা তাঁবুতে ঢোকার পর পরই পর্দার ওপাশ থেকে বেরিয়ে এলো মারকাস। দর্শকদের উদ্দেশ্যে বাউ করে গিয়ে খাঁচায় ঢুকলো। মাঝের বেড়াটা সরিয়ে দিয়ে ইঙ্গিতে ডাকলো। ভয়ঙ্কর বুনো গর্জন করতে করতে খাঁচার এধারে চলে এলো কিং। চক্কর দিতে লাগলো খাঁচার স্বল্প পরিসরে, চোখমুখ পাকিয়ে এসে

থাবা মেরে মারকাসকে ধরার চেষ্টা করতে লাগলো।

হাসলো ছেলেরা। বুঝতে পারছে, সিংহটাও অভিনয় করছে ট্রেনারের সঙ্গে। লাফালো, গড়াগড়ি দিলো, নাচের ভঙ্গিতে পা ফেললো, ডিগবাজি খেলো, সব শেষে লাফিয়ে উঠলো ঝুলন্ত ট্র্যাপিজে। চোখ কপালে তুলে দিলো দর্শকদের।

'আরিব্বাপরে!' মুসা বললো। 'কতো কি করছে! আমি তো শুধু ওকে শুইয়েছি।'

'খুব ভালো খেলা দেখাচ্ছে, তাই না, কিশোর?' বলে, পাশে দাঁড়ানো কিশোরকে কনুই দিয়ে গুঁতো মারতে গেল রবিন, কাত হয়ে গেল একপাশে। কারো গায়ে লাগলো না তার কনুই। কিশোর নেই ওখানে ।

গেল কই? খোঁজ, খোঁজ। গোয়েন্দাপ্রধানের দেখা মিললো সিংহের খাঁচার পেছনে, কখন গেছে ওখানে খেয়ালই করেনি দুই সহকারী।

'এখানে কি, কিশোর?' জানতে চাইলো রবিন।

মুখে কিছু না বলে আঙুল তুলে ট্রেলারটা দেখালো কিশোর, তাঁবুর ভেতরেই থাকে ওটা, পর্দার অন্যপাশে। সিংহের ঘর। খেলা দেখানোর সময় খাঁচায় ঢোকে সিংহটা, অন্য সময় থাকে ট্রেলারটাতে। ট্রেলার আর খাঁচা একসঙ্গে যুক্ত, মাঝে শিকের বেড়া। বেড়া সরিয়ে দিলেই ট্রেলার থেকে খাঁচায় চলে আসতে পারে ওটা, বাইরে দিয়ে আসার দরকার হয় না। ট্রেলারের দরজায় বড় তালা লাগানো থাকে। কড়া দেখালো কিশোর। 'ভালো করে দেখো, বুঝবে,' গম্ভীর কণ্ঠে বললো সে। 'জোর করে খোলা হয়েছে। ইচ্ছে করেই কেউ ছেড়ে দিয়েছিলো কিংকে।'

পাঁচ

'তখন থেকেই ভাবছিলাম, বেরোলো কি করে সিংহটা?' বললো কিশোর। 'তাঁবুতে ঢুকে মনে হলো, যাই, দেখিই না। দেখলাম। কিন্তু কথা হলো, মারকাসের অগোচরে কে ছাড়লো কিংকে?' তালাটা তুলে দেখালো সে। 'এই দেখো, চাবির ফুটোর চারধারে আঁচড়ের দাগ, নতুন। বেশিক্ষণ হয়নি খুলেছে।'

'তুমি শিওর, কিশোর?' বিশ্বাস হচ্ছে না, কিন্তু কিশোরের কথা অবিশ্বাসও করতে পারছে না রবিন ।

মাথা ঝাঁকালো কিশোর ।

'কে করলো কাজটা?' মুসার প্রশ্ন ।

তিনজনেই ভাবছে, এই সময় পর্দার ওপাশে জোর হাততালি শোনা গেল। খেলা শেষ। লাফাতে লাফাতে এসে ট্রেলারে ঢুকলো কিং।

'উন্মাদের কাজ,' রবিন বললো।

সিংহটার দিকে চিন্তিত ভঙ্গিতে তাকিয়ে আছে কিশোর। 'উন্মাদ? আমার তা

মনে হয় না। নিশ্চয় কোনো কারণ আছে।'

'যেমন?' মুসা জানতে চাইলো।

'হতে পারে, দর্শককে ভয় দেখিয়ে কারনিভল করা কিংবা সিংহ পাকড়াও করে হিরো সাজার ইচ্ছে। কিংবা লোকের নজর আরেকদিকে সরিয়ে দিয়ে ফাঁকতালে কোনো জরুরী কাজ সেরে ফেলা।'

'কিন্তু তেমন তো কিছু ঘটেনি,' মুসা বললো।

'হিরো সাজতেও আসেনি কেউ,' বললো রবিন।

'আসার সময়ই হয়তো দেয়নি মুসা। অথবা যে কাজটা সারতে চেয়েছিলো সেই লোক, সেটার সুযোগ দেয়নি। থামিয়ে দিয়েছে সিংহটাকে।'

'কারনিভল বন্ধ করতে চাইবে কেন কেউ?' নিজেকেই যেন প্রশ্ন করলো রবিন। 'লোকের মারাত্মক ক্ষতি করে? সিংহ ছেড়ে দেয়া ছাড়া কি আর উপায় ছিলো না?'

'জানি না,' বিড়বিড় করলো কিশোর।

'কে করেছে ভাবছো? কারনিভলের কেউ?'

'মনে হয়। একটা ব্যাপার লক্ষ্য করেছো, ট্রেলারের কাছ থেকে বেশ দূরে চলে গিয়েছিলো? যেন, পথ দেখিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিলো তাকে সেখানে।'

'মারকাস?' জবাবটা নিজেই দিয়ে দিলো মুসা, 'না, সে নয়। তালা জোর করে খোলার দরকার হতো না তার। নিশ্চয় চাবি আছে।'

'ধোঁকা দেয়ার জন্যে করতে পারে। রবি গিয়ে বলার পর তবে তার টনক নড়লো। আরও আগে খোঁজ করলো না কেন সিংহটার? বিশেষ করে, কয়েক মিনিট পরেই যখন খেলা দেখানোর কথা?'

জবাব খুঁজে পেলো না দুই সহকারী।

ভ্রূকুটি করে কিশোর বললো আবার, 'সমস্যাটা হলো, প্রায় কিছুই জানি না আমরা এখনও। কে, কেন করেছে আন্দাজই করতে পারছি না। তবে…'

'তবে কী?' বাধা দিয়ে বললো মুসা। 'রহস্য মনে করছো নাকি এটাকে? তদন্ত করার কথা ভাবছো?'

'হ্যাঁ, ভাবছি…,' শুরু করেই থেমে গেল সে। ঠোঁটে আঙুল রেখে কথা বলতে নিষেধ করলো। বুড়ো আঙুল নেড়ে দেখালো তাঁবুর পেছন দিকে।

বিশাল একজন মানুষের ছায়া পড়েছে তাঁবুর দেয়ালে। চওড়া কাঁধ। কেমন হেলে রয়েছে মাথাটা, তাঁবুর গায়ে কান ঠেকিয়ে ভেতরের কথা শুনছে যেন। ছায়া দেখে মনে হয় না গায়ে কাপড় আছে।

'জলদি বেরোও,' ফিসফিস করে বললো কিশোর।

তাঁবুর পেছন দিয়ে পথ নেই। সামনে দিয়েই বেরোলো ওরা। ঘুরে তাড়াতাড়ি

চলে এলো তাঁবুর এক কোণে, পেছনে কে আছে দেখার জন্যে।

কেউ নেই।

'পালিয়েছে,' রবিন বললো।

এই সময় পেছনে শোনা গেল পায়ের শব্দ। 'এই যে,' কানের কাছে গমগম করে উঠলো ভারি কণ্ঠ, 'তোমরা এখানে কি করছো?'

চমকে উঠলো তিনজনেই। ঢোক গিললো মুসা। ফিরে তাকিয়ে দেখলো বিশালদেহী একজন মানুষ। কালো চোখ। কাঁধে ফেলা লম্বা, ভারি একটা হাতুড়ি।

'আ-আ-আমরা···,' তোতলাতে শুরু করলো মুসা।

রবি এসে দাঁড়ালো মানুষটার পেছনে। তিন গোয়েন্দাকে দেখে উজ্জ্বল হলো চোখ। 'বাবা খুঁজে পেলো তাহলে তোমাদের।'

'তোমার বাবা?' আবার ঢোক গিললো মুসা।

'হ্যাঁ, খোকা,' হাসি ফুটলো তাঁর মুখে, হাতুড়িটা নামিয়ে রাখলেন মাটিতে, হাতল ধরে রেখেছেন। 'ধন্যবাদ জানানোর জন্যে খুঁজছিলাম তোমাদের। কিংকে সামলে মহা-অঘটন থেকে বাঁচিয়েছো। রাফনেকদের সাহায্য করছিলাম, তাই তখন আমাকে খুঁজে পায়নি রবি।'

'তোমাদেরকে পুরস্কার দিতে চায় বাবা,' রবি বললো।

পুরস্কারের কথায় কানা বেড়ালটার কথা মনে পড়লো মুসার। 'খাইছে! আমার বেড়াল!' দ্রুত চারপাশে তাকালো সে, বেড়ালটা খুঁজলো। নেই।

'বেড়াল?' অবাক হলেন মিস্টার কনর।

'শুটিং গ্যালারিতে পুরস্কার পেয়েছিলো, বাবা,' রবি জানালো। 'ফার্স্ট প্রাইজ।'

'সিংহের তাঁবুতে ফেলে এসেছো হয়তো,' মুসাকে বললো রবিন।

কিন্তু তাঁবুতে তন্নতন্ন করে খুঁজেও বেড়ালটা পাওয়া গেল না। শুটিং গ্যালারিতে চললো সবাই। সেখানেও নেই ওটা। এমনকি মুসা যেখানে কিংকে শুইয়েছে সেখানেও নেই।

'ছিলো তো,' কোথায় রেখেছে, মনে করতে পারছে না মুসা, 'আমার হাতেই ছিলো। সিংহটাকে যখন দেখলাম, তখনও ছিলো। ভয়ে হয়তো হাত থেকে ছেড়ে দিয়েছি, কেউ তুলে নিয়ে গেছে।'

নীরবে ভাবছিলো কিশোর। কড়ে আঙুল কামড়াচ্ছিল। দাঁতের ফাঁক থেকে সরিয়ে নিয়ে বললো, 'মনে করতে পারছো না?'

আস্তে মাথা নাড়লো মুসা।

'এতো মন খারাপ করছো কেন?' মিস্টার কনর বললেন। 'আরেকটা পুরস্কার দেবো। বেড়ালের চেয়ে ভালো কিছু।'

আর চেপে রাখতে পারলো না কিশোর। বলে ফেললো, 'মিস্টার কনর,

আপনার কারনিভলে কোনো গোলমাল চলছে?'

'গোলমাল?' কালো চোখের তারা স্থির নিবদ্ধ হলো কিশোরের ওপর। 'কেন, একথা কেন?'

'সিংহের তাঁবুতে আমরা কথা বলছিলাম। এই সময় তাঁবুর পেছনে একটা লোকের ছায়া দেখলাম, মনে হলো আমাদের কথা আড়িপেতে শুনছে সে।'

'তোমাদের কথা আড়িপেতে শুনেছে?' ভুরু কোঁচকালেন তিনি। তারপর হেসে উঠলেন। 'ভুল করেছো। কিং তোমাদের ঘাবড়ে দিয়েছে। ভয় পেলে হয় ওরকম। উল্টোপাল্টা দেখে লোকে, শোনে...'

'জানি,' বাধা দিয়ে বললো কিশোর। 'কিন্তু ব্যাপারটা আমাদের কল্পনা নয়। তিনজনেই দেখেছি। আর কিংও নিজে থেকে ছাড়া পায়নি, ট্রেলারের দরজা খুলে দেয়া হয়েছিলো।'

কি যেন ভাবলেন মিস্টার কারসন। 'এসো, আমার ট্রেলারে।' শো দোখানোর জায়গা থেকে খানিক দূরে মাঠের মধ্যে পার্ক করা রয়েছে কারনিভলের লোকদের ট্রাক, ট্রেলার, কার। একটা ট্রাকের পেছনে লাগানো ট্রেলারে থাকে বাপ-ছেলে, মিস্টার কনর আর রবি। ট্রেলারের ভেতরে দুটো বাংক, কয়েকটা চেয়ার, একটা ডেস্ক—তাতে কাগজপত্র ছড়ানো, ছোট একটা আলমারি, বড় ঝুড়িতে নানারকম বাতিল জিনিস—ছেঁড়া স্টাফ করা একটা কুকুর, একটা বেড়াল, কিছু ভাঙা পুতুল।

'বাতিল মাল কিনে সারিয়ে নিই আমি,' গর্বের সঙ্গে বললো রবি। 'পরে পুরস্কার দিই।'

'বসো,' ছেলেদের বললেন কনর। 'সব খুলে বলো আমাকে।'

'বলার তেমন কিছু নেই, স্যার,' কিশোর বললো। 'তবে কিংকে ছেড়ে দেয়া হয়েছে, এটা ঠিক। জোর করে তালা খোলার চিহ্ন আছে।'

'এমনভাবে কথা বলছো, যেন অভিজ্ঞ গোয়েন্দা,' হাসলেন মিস্টার কনর।

'গোয়েন্দাই, স্যার,' পকেট থেকে তিন গোয়েন্দার কার্ড বের করে দিলো কিশোর। 'অনেক জটিল রহস্যের সমাধান করেছি আমরা।'

কার্ডটা পড়ে মাথা দোলালেন কনর। 'ভালো। মজার হবি...'

'ঠিক হবি নয়, স্যার, আমরা সিরিয়াস।' বলে পকেট থেকে বের করে দিলো আরেকটা কাগজ, পুলিশ চীফ ইয়ান ফ্লেচারের দেয়া সার্টিফিকেট।

সেটাও পড়লেন কনর। 'হুঁ, আসল গোয়েন্দা বলেই মনে হচ্ছে। পুলিশ তো আর মিছে কথা বলবে না। সে যাই হোক, ইয়াং ম্যান, এখানে কোনো কেস নেই তোমাদের জন্যে। কোনো রহস্য নেই। তুমি ভুল করেছো।'

'কিশোর পাশা ভুল করে না, স্যার,' ঘোষণা করলো রবিন।

'ওরকম জোর দিয়ে কিছু বলা যায় না,' হেসে বললেন কনর। 'বলতে পারো

সাধারণত ভুল করে না। একেবারেই ভুল করে না, এটা হতে পারে না। মানুষ মাত্রেই ভুল করে।'

'কিন্তু, বাবা...,' বলতে গিয়ে বাধা পেলো রবি।

কনর বললেন, 'থামো, রবি, অনেক হয়েছে। ওসব কথা আর শুনতে চাই না,' উঠে দাঁড়ালেন তিনি। 'কিশোর ভুল করেছে। তবে আমাদের অনেক উপকার করেছে ওরা, পুরস্কার একটা অবশ্যই দিতে হয়। কারনিভলের তিনটে ফ্রি পাস।' তিনটে কার্ড বের করে দিলেন তিন গোয়েন্দার হাতে। 'কী, খুশি হয়েছো তো?'

'নিশ্চয়,' বললো বটে, হাসি দেখা গেল না গোয়েন্দাপ্রধানের মুখে।

'আরি!' দরজার দিকে হাত তুলে চেঁচিয়ে উঠলো রবিন।

সবাই তাকালো। পেছনের দরজার পর্দায় মস্ত ছায়া পড়েছে। লম্বা এলোমেলো চুল, চাপ দাড়ি, পেশীবহুল চওড়া কাঁধ।

'ওই যে ছায়া!' দাঁতের ফাঁক দিয়ে হিসহিস শব্দ বেরোলো মুসার।

ডাকলেন কনর।

ঘরে ঢুকলো একজন লোক। হাঁ করে তার দিকে তাকিয়ে রইলো ছেলেরা। স্বাভাবিক উচ্চতা, কিন্তু দেখার মতো মাংসপেশী। ঠেলে ফুলে উঠেছে নগ্ন কাঁধের পেশী। পরনে কালো-সোনালি রঙের আঁটো পাজামা, গায়ের সঙ্গে মিশে রয়েছে। পায়ে চকচকে বুট। কালো অগোছালো চুল-দাড়ি কেমন যেন বন্য করে তুলেছে চেহারাটাকে।

'ও আমাদের স্ট্রং ম্যান,' পরিচয় করিয়ে দিলেন কনর, 'ওয়ালশ কোহেন। একটা রহস্যের তাহলে সমাধান হয়ে গেল, বয়েজ। কারনিভলে একজন মানুষ নানারকম কাজ করে, কোহেনও ব্যতিক্রম নয়। সে আমাদের সিকিউরিটি ইনচার্জ। তোমাদের ঘোরাফেরা দেখে নিশ্চয় সন্দেহ হয়েছিল তার, চুপ করে গিয়ে দেখে এসেছে কি করছো।'

'ঠিকই বলেছেন,' স্বীকার করলো কোহেন। মোটা, ভারি গলা।

মাথা ঝোঁকালেন কনর। 'তো, ছেলেরা, কোহেনের সঙ্গে আমার জরুরী কথা আছে। রবিরও শুটিং গ্যালারিতে যাওয়া দরকার। তোমরা ঘোরো গিয়ে, যা ইচ্ছে দেখো। ফ্রি পাস আছে, কোথাও পয়সা দিতে হবে না।'

'থ্যাংক ইউ, স্যার,' শান্তকণ্ঠে বললো কিশোর। ইশারায় রবিন আর মুসাকে আসতে বলে পা বাড়ালো দরজার দিকে। বাইরে বেরিয়ে সোজা চলে এলো ট্রেলারের পেছনে।

'কি করছো?' রবিন জিজ্ঞেস করলো।

'আমি শিওর, কিছু একটা ঘটছে এখানে,' নিচু গলায় বললো কিশোর। 'কোহেনকে সন্দেহ হচ্ছে আমার। প্রহরীর মতো লাগে না। এমনভাবে তাঁবর কাছে

আড়ি পেতে ছিলো, যেন চোর। আর রবিও কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলো, তার বাবা থামিয়ে দিয়েছেন। কাজেই জানালার কাছে দাঁড়িয়ে শুনবো কি হচ্ছে।'

'সরো!' বলতে বলতেই দু'জনকে ঠেলে আড়ালে নিয়ে এলো মুসা।

ট্রেলার থেকে নেমে দ্রুত গ্যালারির দিকে চলে গেল রবি, কোনোদিকে তাকালো না। পা টিপে টিপে জানালার কাছে এসে দাঁড়ালো ছেলেরা।

কোহেনের ভারি গলা শোনা গেল, '…কিংও ছুটলো। এরপর কি ঘটবে, কনর? হয়তো শেষ পর্যন্ত বেতনই দিতে পারবেন না আমাদের।'

'আগামী হপ্তায়ই বেতন পাবে। এতো চিন্তা করো না।'

'আপনাকে আর কি বলবো? জানেনই কারনিভলের লোকেরা কুসংস্কারে বিশ্বাসী। আজকের শো তেমন জমছে না। আরও অঘটন ঘটবে।'

'কোহেন, শোনো। তুমি…'

ভেতরে পায়ের শব্দ। ছেলেদের মাথার ওপরে বন্ধ হয়ে গেল জানালা। আর কথা শোনা গেল না। দাঁড়িয়ে থেকে লাভ নেই। সরে চলে এলো তিন গোয়েন্দা।

'সত্যিই গণ্ডগোল,' বলে উঠলো মুসা। 'কিন্তু আমরা কি করতে পারি? মিস্টার কনর আমাদের পাত্তাই দিলেন না।'

কিশোর চিন্তিত। 'রবিকেও কিছু বলতে দিলো না। যাকগে, পাস আছে আমাদের। নজর রাখতে পারবো। রবিন, কাল লাইব্রেরিতে গিয়ে পত্রিকা ঘাঁটবে। দেখবে, অন্যান্য শহরে কারনিভলটা কেমন জমিয়ে এসেছে। গত কয়েক দিনের কাগজ দেখলেই চলবে। কাল ভাববো, কি করা যায়।'

ছয়

সেরাতে ভালো ঘুম হলো না মুসার। মনে ভাবনা। তিন গোয়েন্দাকে তদন্ত করতে দেয়ার জন্যে কিভাবে রাজি করানো যায় মিস্টার কনরকে? সকাল পর্যন্ত ভেবেও কোনো উপায় বের করতে পারলো না। শেষে চেষ্টা ক্ষান্ত দিলো। রবিন কিংবা কিশোর উপায় বের করে ফেলবে। নাস্তার টেবিলে এসে দেখলো খাওয়ার শেষ পর্যায়ে রয়েছেন মিস্টার আমান।

'বাবা, এতো তাড়াতাড়ি উঠেছো আজ?' মুসা জিজ্ঞেস করলো।

'হ্যাঁ, ডেভিস ক্রিস্টোফার ডেকেছেন। নতুন একটা ছবি করবেন। জরুরী কাজ নাকি আছে,' কফির কাপে লম্বা চুমুক দিলেন। 'কিন্তু এদিকে যে একটা গোলমাল হয়ে গেল।'

'কী?'

'তোমার মাকে কাল রাতে কথা দিয়েছি, আজ বাগান সাফ করে দেবো।

তোমার তো স্কুল ছুটি, কাজও নেই। দাও না আমার কাজটা করে।'

মনে মনে গুঙিয়ে উঠলো মুসা। মুখে বললো, 'বেশ, দেবো।'

লাঞ্চের আগে বেরোতে পারলো না। বাগান সাফ করে, দুপুরের খাওয়া খেয়ে, সাইকেল নিয়ে স্যালভিজ ইয়ার্ডে চললো মুসা। হেডকোয়ার্টারে পৌঁছে দেখলো, কিশোর ডেস্কেই রয়েছে।

'কোনো উপায় বের করতে পারলে?' ভূমিকা নেই, সরাসরি জিজ্ঞাসা।

'নাহ্,' ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেললো মুসা। 'তুমি?'

'আমিও না,' মুখ গোমড়া করে রেখেছে কিশোর। 'দেখি, রবিন কি জেনে আসে। তার জন্যেই বসে আছি।'

বাইরে আওয়াজ শুনে গিয়ে সর্ব-দর্শনে চোখ রাখলো কিশোর। পেরিস্কোপটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে একটা বিশেষ অবস্থানে আনতেই ইয়ার্ডের অনেকখানি দেখা গেল।

'ওই, এসে গেছে।'

একটু পরেই ট্র্যাপডোরে টোকা পড়লো। ঢাকনা তুলে উঠে এলো রবিন। হাতে নোটবুক, ভীষণ উত্তেজিত।

রবিনের মুখ দেখেই আন্দাজ করা গেল, খবর আছে।

'সারাটা সকাল খরচ হয়েছে আমার,' রবিন বললো। 'কারনিভলে গুরুত্ব নেই, ফলে খবর থাকলেও কাগজের চিপায়-চাপায় থাকে। একগাদা কাগজ ওল্টাতে হয়েছে আমার।'

'কি জানলে?' কিশোর জিজ্ঞেস করলো।

নোটবুক খুললো রবিন। 'তিন হপ্তা আগে ভেনচুরায় পনি রাইড হারিয়েছে কারনিভল। খাদ্যে বিষক্রিয়ায় মারা গেছে ওদের তিনটে খেলুড়ে পনি ঘোড়া। তারপর, তিন দিন আগে স্যান মেটিওর উত্তরে একটা জায়গায় থাকার সময় আগুন লেগেছে। তিনটে তাঁবু পুড়েছে—আগুনখেকোর তাঁবু, সিংহের তাঁবু, আর শুটিং গ্যালারির খানিকটা। নেহাত কপালগুণে সময়মতো নেভাতে পেরেছে।'

'সিংহের তাঁবু?' কপাল কুঁচকে গেছে মুসার। 'একখানে দুবার অঘটন?'

'কাকতালীয় ব্যাপারও হতে পারে,' কিশোর বললো। 'ঝট করে সিদ্ধান্তে চলে আসা ঠিক নয়। তবে ইন্টারেসটিং মনে হচ্ছে। যদি পনি রাইডও ওই একই কারনিভলের হয়।'

'কোন কারনিভল, পেপারে কিছু লেখেনি,' রবিন বললো।

'কাল রাতে আমিও কিছু বইপত্র ঘেঁটেছি, সার্কাসের ওপর লেখা,' বললো কিশোর। 'চাচার বই। জানোই তো সার্কাসে কি-রকম আগ্রহ তার। বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়ে একবার সার্কাসের দলে ভর্তিও হয়েছিলো। একটা বইতে পেলাম, অনেক কুসংস্কার আছে সার্কাসের লোকের। পুরনো প্রবাদ আছেঃ কোনো সার্কাসে

দুর্ঘটনা ঘটতে শুরু করলে পর পর তিনবার ঘটবে। ঘটবেই। সুতরাং, কিঙের বেরিয়ে যাওয়াটা তৃতীয় দুর্ঘটনা বলা যায়।'

'তুমি বিশ্বাস করো এসব?' রীতিমতো অবাক হলো মুসা।

'আমার করা না করায় কিছু এসে যায় না, সেকেণ্ড। সার্কাসের লোকে করে। আরও কিছু বইয়ের লিস্ট দিয়েছে চাচা, তার কাছে ওগুলো নেই। ফলে সকালে লস অ্যাঞ্জেলেসে যেতে হলো, লাইব্রেরিতে। অনেক বই ঘেঁটেছি। জেনেছি, সার্কাসে কি কি খেলা থাকে, কোন পদে কি রকম লোক থাকে। আশ্চর্য কি জানো, কোথাও স্ট্রং ম্যানের উল্লেখ নেই।'

'তাহলে কোহেন?' প্রশ্ন তুললো মুসা।

'কি জানি। হতে পারে নতুন সৃষ্টি করা হয়েছে। কিংবা তার দেশের সার্কাসে ওরকম পদ আছে। লোকটা বিদেশী। আরেকটা ব্যাপার সহজেই চোখে পড়ে, তার আচার-আচরণ সন্দেহজনক।' ঝিক করে উঠলো কিশোরের চোখের তারা। তুড়ি বাজালো। 'পেয়েছি!'

'কি পেয়েছো ?' একসঙ্গে প্রশ্ন করলো দুই সহকারী ।

'কারনিভলে তদন্ত করার উপায়। রবিকে জড়িয়ে নিতে হবে।'

'কিভাবে?' রবিন জানতে চাইলো ।

'বলছি, মন দিয়ে শোনো...'

কয়েক মিনিট পর সর্ব-দর্শনে চোখ রাখলো মুসা। হঠাৎ বললো, 'আসছে! আমি যাই।'

তিন গোয়েন্দার ব্যক্তিগত ওয়ার্কশপের বাইরে রবির সঙ্গে দেখা করলো মুসা। ফোন করে তাকে আসতে বলেছে কিশোর।

'কি ব্যাপার, মুসা?' হাসলো সোনালি-চুল ছেলেটা। 'জরুরী তলব?'

'ভাবলাম, আমাদের গোপন হেডকোয়ার্টার দেখাই। হাজার হোক, তিনটে ফ্রি পাস পেয়েছি তোমাদের কাছে। চক্ষুলজ্জা বলেও তো একটা জিনিস আছে। কি করে কাজ করি আমরা, দেখবে এসো।'

দুই সুড়ঙ্গ দিয়ে রবিকে হেডকোয়ার্টারে নিয়ে এলো মুসা।

'কি সাংঘাতিক! কি জায়গা বানিয়ে রেখেছো জঞ্জালের তলায়!'

চোখ বড় বড় করে দেখলো রবিঃ মাইক্রোস্কোপ, টেলিফোন, পেরিস্কোপ, ওয়াকি-টকি, ফাইলিং কেবিনেট, মেটাল ডিটেকটর, তাক বোঝাই বই আর ট্রফি, আর আরও নানা রকম জিনিস যেগুলোর নামই জানে না সে। রবিন আর কিশোর কাজে ব্যস্ত, ঘরে যে লোক ঢুকেছে টেরই পায়নি যেন। একজনও চোখ তুললো না। আতশ কাচ দিয়ে একটা তালা পরীক্ষা করছে কিশোর। আলোকিত কাচের

তলায় রেখে কি যেন দেখছে রবিন।

ওদের কাজে ব্যাঘাত না ঘটিয়ে নিচু গলায় বললো মুসা, 'রবি, তোমাদের কারনিভলে গোলমাল হচ্ছে। সেটারই তদন্ত করছি।'

'কি করে জানলে? অসম্ভব!'

'তোমার কাছে কঠিন লাগছে, রবি,' ভারিক্কি চালে বললো মুসা। 'আমাদের কাছে কিছু না। বিজ্ঞান আর আমাদের অভিজ্ঞতাই সেটা সম্ভব করেছে।'

হঠাৎ উঠে দাঁড়ালো কিশোর। 'বুঝলাম। কিংকে ছেড়ে দেয়েছিলো একজন পেশাদার অপরাধী,' রবি যে আছে ঘরে দেখতেই পায়নি যেন। 'কোনো সন্দেহ নেই। তালাটার বাইরের প্যাটার্ন দেখলাম, টাইপ-সেভেন পিক-লক। সিংহের খাঁচায়ও একই তালা। নিশ্চয় গোলমাল পাকানোর জন্যেই খুলে দেয়া হয়েছিলো।'

বোকা হয়ে দাঁড়িয়ে শুনছে রবি, অর্ধেক কথা বুঝতে পারছে না। আরও তাজ্জব হওয়া বাকি আছে তার। কিশোর থামতেই রবিন শুরু করলো, 'হুঁ, বোঝাই যাচ্ছে, তিন হপ্তা আগে তিনটে ঘোড়া মরে যাওয়াতেই পনি রাইড খেলাটা বন্ধ করতে হয়েছে। তারপর পুড়লো তাঁবু, শুটিং গ্যালারির ক্ষতি হলো। নতুন তাঁবু কিনতে, গ্যালারি মেরামত করতে অবশ্যই টাকা নষ্ট হয়েছে। বেকায়দায় পড়ে গেছেন মিস্টার কনর। বেতন দিতে পারছেন না।'

রবিকে না দেখার অভিনয় চালিয়ে গেল কিশোর। মাথা ঝাঁকিয়ে রবিনের কথার সমর্থন জানালো। জিজ্ঞেস করলো, 'কর্মীদের কথা কি কি জানলে?'

'স্ট্রং ম্যান কোহেন কারনিভলে আগে কখনও কাজ করেনি, রেকর্ড নেই। আমার বিশ্বাস, লোকটা ভণ্ড।'

ভাব দেখে মনে হলো, বাজ পড়েছে রবির মাথায়। ঝুলে গেছে নিচের চোয়াল। আর চুপ থাকতে পারলো না। 'এসব কথা কে বলেছে তোমাদের?'

ফিরে তাকালো কিশোর আর রবিন। রবিকে দেখে যেন অবাক হয়েছে।

'আরে, রবি, কখন এলে?' কিশোর বললো।

'নিশ্চয় কেউ বলেছে তোমাদেরকে এসব কথা!' প্রশ্নের জবাব না দিয়ে গরম হয়ে বললো রবি।

'না, রবি,' মাথা নাড়লো কিশোর। 'আমরা গোয়েন্দা। তদন্ত করে জেনেছি। তারমানে, সত্যি জেনেছি?'

মাথা ঝোঁকালো রবি। 'হ্যাঁ, প্রত্যেকটা বর্ণ। এমনকি কোহেনের কথাও। ছদ্মনামে ঢুকেছে। টাকার দরকার, তাই একটা পদ তৈরি করে নিয়ে কারনিভলে কাজ করতে এসেছে। সার্কাসের চেয়ে কারনিভলের আয় কম, বেতনও কম, তারপরেও এসেছে। আমাদের এখানে যে কাজ করছে, পরিচিত কাউকে জানতে দিতে চায় না। আমরাও ওর আসল নাম জানি না। তবে স্ট্রং ম্যান হিসেবে খুব

ভালো, একথা বলা যায়।'

'তা হতে পারে। কিন্তু, রবি, তোমাদের কারনিভলে যে গোলমাল করছে কেউ, এটা তো ঠিক? কে করছে, সেটা বের করতে চাই আমরা। যদি তোমার বাবা অনুমতি দেন।'

এক এক করে তিন গোয়েন্দার মুখের দিকে তাকালো রবি। 'আগে বলো, কি করে জানলে? যাদু বিশ্বাস করি না আমি।'

'ভূতে বলেছে,' রহস্যময় হাসি হাসলো কিশোর। খুলে বললো, কিভাবে জেনেছে।

রবিন আর মুসার মুখেও হাসি। রবিকে তাজ্জব করে দিতে পারার আনন্দে।

'দারুণ হে! সত্যি তোমরা জাতগোয়েন্দা!' না বলে পারলো না রবি। 'কারনিভলের গণ্ডগোলের হোতা কে, বের করতে পারবে তোমরা। কিন্তু বাবাকে নিয়েই মুশকিল। বাইরের সাহায্য নিতে রাজি হবে না।'

'তাহলে খুব শীঘ্রি কারনিভল খোয়াতে হবে তাঁকে,' কিশোর বললো।

'বুঝি,' বিমর্ষ হলো রবি। 'আগামী হপ্তায় বেতন দিতে না পারলে…,' থেমে গেল সে। সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললো। 'বেশ, বাবা না নিলে না নিক, আমি নেবো তোমাদের সাহায্য। আমি জানি কি কারণে বাবাকে কারনিভল খোয়াতে বাধ্য করা হচ্ছে। আমার জন্যে!'

সাত

'আমার নানী,' রবি বললো। 'বাবাকে দেখতে পারে না,' বিষণ্ণ হয়ে গেল। 'খুব ছোটবেলায় মা মরেছে আমার। অ্যাকসিডেন্ট। মায়ের স্নেহ পাওয়ারও সুযোগ হয়নি আমার…' গলা ধরে এলো তার।

'দুঃখ করো না, রবি,' সান্ত্বনা দিলো কিশোর। 'তোমার বাবা আছে, আমার তো তা-ও নেই। দু'জনেই মারা গেছে মোটর দুর্ঘটনায়।'

এক মুহূর্ত অস্বস্তিকর নীরবতার পর রবি বললো, 'নানী বাবাকে দেখতে পারতো না, তার কারনিভলও পছন্দ করতো না। মা বাবাকে বিয়ে করুক, এটাও চায়নি। তাই বাবাকে দূষতে লাগলো নানী। বাবার জন্যেই নাকি মারা গেছে তার মেয়ে। বললো, কারনিভলে থাকা হতে পারে না আমার। মা মারা যাওয়ায় খুব দুঃখ পেয়েছিলো বাবা, কাজকর্ম ঠিকমতো করতো না, ফলে কারনিভলের অবস্থা শোচনীয় হয়ে গেল। নানী চাইলো আমি তার কাছে থাকি। মোটামুটি ধনীই বলা যায় তাকে। তা ছাড়া বাবা এক জায়গায় থাকতে পারে না, ব্যবসার খাতিরে যাযাবরের মতো ঘুরে বেড়াতে হয়।' ছায়া নামলো রবির চেহারায়। 'যতোই বড়

হলাম, নানীর ওপর বিতৃষ্ণা বাড়লো আমার। খারাপ নয় মহিলা, আমাকে অনেক আদর করে, কিন্তু আমি দেখতে পারি না। একটাই কারণ, দুনিয়ার সব কিছুতেই তার ভয়, আমাকে বাইরে বেরোতে দিতো না, কিছু করতে দিতো না। আমার ইচ্ছে বাবার কাছে কারনিভলে চলে যাই। নানী যেতে দেয় না। শেষে এ-বছরের গোড়ার দিকে পালিয়ে চলে এলাম বাবার কাছে। কি সাংঘাতিক, পাগলের মতো ছুটে এলো নানী। বাবাকে ভয় দেখালো, কেস করে দেবে। বাবা বললোঃ ঠিক আছে, রবি যদি যেতে চায়, আমার কোনো আপত্তি নেই, নিয়ে যান। আমি যেতে চাইলাম না। আইনত নানীও কিছু করতে না পেরে ফিরে গেল।

'শাসিয়ে-টাসিয়ে গেছেন?' জিজ্ঞেস করলো কিশোর।

'হ্যাঁ। বাবাকে বলে গেছে, আমাকে কিছুতেই কারনিভলে থাকতে দেবে না। মায়ের মতো মরতে দেবে না আমাকে। কোর্টে গিয়ে নালিশ করবে, আমার খাওয়া-পরা জোটানোর সাধ্য নেই বাবার। নানীর ভয়েই অনেকটা পালিয়ে ক্যালিফোর্নিয়ায় চলে এসেছে বাবা। প্রাণপণে খাটছে টাকা রোজগারের জন্যে, যাতে আদালতে নানীর নালিশ না টেকে। কিন্তু যে-হারে অ্যাকসিডেন্ট হচ্ছে, কারনিভলই খোয়াতে হবে বাবাকে!'

'তুমি সত্যি বিশ্বাস করো, তোমার নানী এসব করাচ্ছেন।'

'জানি না, কিশোর,' ধীরে ধীরে বললো রবি. 'নানী করাচ্ছে ভাবতেও খারাপ লাগে আমার। বাবাকে দেখতে পারে না, কিন্তু আমাকে তো ভীষণ আদর করে। নানী ছাড়া বাবার শত্রু আর কে থাকবে, বলো?'

'একটা ব্যাপার পরিষ্কার, তোমার ক্ষতি চান না তোমার নানী।' কিশোর যুক্তি দেখালো, 'দুর্ঘটনায় তোমারও ক্ষতি হতে পারতো। তিনিই যদি করাবেন, এসব কথা কি তিনি ভাবেননি?' নিচের ঠোঁটে একবার চিমটি কাটলো সে। 'রবি, আমার বিশ্বাস, এরকম কিছু তিনি করাতে পারেন না। হয়তো অন্য শত্রু আছে তোমার বাবার, যার কথা তুমি জানো না। কার্নিভল ধ্বংস করার পেছনে অন্য কারণ থাকতে পারে।'

'কে করছে জানি না, কিশোর। তবে একথা ঠিক, শীঘ্রি তাকে ঠেকাতে না পারলে বাবাকে শেষ করে দেবে। ঐ তৃতীয় দুর্ঘটনার আশঙ্কায় আতঙ্কিত হয়ে আছে কারনিভলের সবাই।'

'তৃতীয়টা তো ঘটেই গেছে?' অবাক হলো কিশোর।

মাথা নাড়লো রবি। 'না, কিঙের বেরিয়ে যাওয়াটাকে দুর্ঘটনা ধরছে না ওরা। কারণ তাতে কারও কোনো ক্ষতি হয়নি। ক্ষতি নাহলে দুর্ঘটনা ধরা হয় না। কাজেই তৃতীয়টার অপেক্ষায় আছে।'

'খুব খারাপ কথা,' রবিন বললো। 'সর্বনাশ হয়ে যাবে তো। আতঙ্ক নার্ভাস করে ফেলে মানুষকে, আর নার্ভাস হলে দুর্ঘটনা বেশি ঘটায় মানুষ।'

একমত হলো কিশোর। 'এবং এসবের মূলে সার্কাসের লোকের কুসংস্কার। লোকে যেটার ভয় বেশি করবে, সেটাই বেশি ঘটবে।'

'কিন্তু রবিদের কারনিভলে তো অন্য ব্যাপার ঘটছে,' মুসা মনে করিয়ে দিলো। 'আপনা-আপনি ঘটছে না। ঘটানো হচ্ছে।'

'সেটাই শিওর হওয়া দরকার, সেকেণ্ড,' কিশোর বললো। 'একটা ব্যাপার মনে খচখচ করছে, কিঙের ছাড়া পাওয়াটা অন্য দুটো দুর্ঘটনার মতো নয়। প্যাটার্ন মিলছে না। ওদুটো ঘটার সময় কারনিভল খোলা ছিলো না। দর্শকদের ক্ষতি হওয়ার ভয় ছিলো না।'

'তাহলে এটা হয়তো আসলেই দুর্ঘটনা?'

'না। ছেড়েই দেয়া হয়েছে,' জোর দিয়ে বললো গোয়েন্দাপ্রধান। 'কারনিভলে যাওয়া দরকার রবি, এখন তো বন্ধ, আমরা ঢুকতে পারবো?'

'নিশ্চয় পারবে। আমি সবাইকে বলবো, রিহারস্যাল দেখতে এসেছো। তোমাদের কথা সবাই জানে এখন। বিশেষ করে মুসার কথা। কোনো অসুবিধে হবে না।'

'কি খুঁজবো আমরা, কিশোর?' মুসার প্রশ্ন।

'বলতে পারবো না। কড়া নজর রাখার চেষ্টা করবো, যাতে আরেকটা দুর্ঘটনা ঠেকানো যায়। সাবধান থাকতে হবে আমাদের···,' থেমে গেল হঠাৎ।

মেরিচাচী ডাকছেন। দ্রুত গিয়ে সর্ব-দর্শনে চোখ রাখলো মুসা।

'রবিন,' আবার ডাকলেন তিনি, 'জলদি বেরিয়ে এসো। তোমার মা ফোন করেছেন। ডাক্তারের কাছে নাকি যাবার কথা?'

'হায়, হায়, ডেন্টিস্ট!' গুঙিয়ে উঠলো রবিন। 'ভুলেই গিয়েছিলাম!'

ভ্রূকুটি করলো কিশোর। কাজে বাধা পড়লে রাগ লাগে তার। মেনে নিতে পারে না। জোরে নিঃশ্বাস ফেলে হাত নেড়ে বললো, 'কি আর করবে, নথি, যাও। তোমার জন্যে আমাদের বসে থাকা উচিত হবে না। আমি আর মুসা যাচ্ছি। সময় নষ্ট হলে কখন কি করে বসে···ও হ্যাঁ, একটা দিনিজসপ্রে নিয়ে যাও। যোগাযোগ রাখতে পারবে আমাদের সঙ্গে।'

'কী সপ্রে!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠলো মুসা।

'দিনিজসপ্রে,' শান্তকণ্ঠে বললো কিশোর। 'দিক-নির্দেশক ও জরুরী-সংকেত প্রেরক, সংক্ষেপে বাংলায় দিনিজসপ্রে,' গর্বের হাসি হাসলো সে। 'কাল যেটা বানানো শুরু করেছিলাম তোমাকে নিয়ে, মাঝপথে তো চাচা এসে গামলা রঙ করতে দিলো। আজ সকালে বানিয়ে ফেলেছি। তবে মাত্র দুটো। আপাতত তাতেই চলবে। একটা রবিন নিয়ে যাক, আরেকটা আমরা নেবো। সুবিধে হবে। ওয়াকি-

টকি দেখলেই লোকে চিনে ফেলে। এটা দেখবেও না, আর দেখলেও সহজে চিনবে না।'

'ওই যন্ত্র দিয়ে কি হয়, কিশোর?' জানতে চাইলো রবি।

'ওটা? একধরনের হোমার বলতে পারো। নিজস্ব কিছু আবিষ্কার ঢুকিয়েছি ওটাতে। হোমার আমরা আগেও বানিয়েছি, ব্যবহার করেছি, তবে এখনকারটা আরও আধুনিক। সুযোগ-সুবিধে বেশি। প্রথমেই ধরো, সিগন্যাল পাঠাবে এটা। শব্দ করবে। আরেকটা হোমার নিয়ে যতোই কাছে যাবে, বাড়বে শব্দ। একটা ডায়াল আছে, তাতে দিক-নির্দেশক কাঁটা আছে, যেদিক থেকে শব্দ আসবে সেদিকে ঘুরে যাবে কাঁটাটা। প্রতিটি দিনিজসপ্রেতে গ্রাহক আর প্রেরক, দু'ধরনের যন্ত্রই আছে। জরুরী অবস্থার জন্যে ছোট্ট একটা লাল আলোর ব্যবস্থা আছে এতে। সুইচ টেপার ঝামেলা নেই, ভয়েস অপারেটেড মুখে বললেই কাজ শুরু করবে। ধরো, আমাদের মধ্যে কেউ বিপদে পড়লো। আর কিচ্ছু করার দরকার নেই, শুধু বলতে হবে 'সাহায্য'। ব্যস, অমনি অন্যদের দিনিজসপ্রের লাল আলো জ্বলতে-নিভতে শুরু করবে,' এক মুহূর্ত থেমে দম নিলো কিশোর। 'সব চেয়ে বড় সুবিধে, খুদে এই হোমারটা পকেটেই জায়গা হয়ে যাবে।'

বিস্ময় চাপা দিতে পারলো না রবি। চেঁচিয়ে উঠলো, 'কি সাংঘাতিক, খুব কঠিন করে কথা বলো তুমি, কিশোর! ...আর...আর, দুনিয়ার সব কিছুই করতে পারো, তাই না? সব কিছুতেই বিশেষজ্ঞ!'

'ইয়ে, রবি...,' প্রশংসায় খুশি হয় কিশোর। কিন্তু এতো বেশি প্রশংসা করেছে রবি, কিশোর পাশাকেও লজ্জায় ফেলে দিয়েছে, 'সব কিছু পারা তো একজন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। অনেক কিছুই করার চেষ্টা করি আরকি। গোয়েন্দাগিরিতে যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার চেষ্টা করি। হ্যাঁ, যা বলছিলাম, আমাদের হোমারের সঙ্কেত শুধু আমাদের হোমারই ধরতে পারবে, অন্য কোনো যন্ত্র নয়। রেঞ্জ তিন মাইল।'

ডাক পড়লো আবার। 'এই, রবিন, কোথায়? বেরোচ্ছো না?' মেরিচাচী অধৈর্য হয়ে উঠেছেন। 'তুমি এসো। আমি অফিসে যাচ্ছি।'

'দাও, কোথায় তোমার দিনিজসপ্রে,' কিশোরকে বললো রবিন। 'যতো তাড়াতাড়ি পারি ডাক্তার দেখিয়েই কারনিভলে চলে যাবো আমি।'

বাইরে বেরিয়ে, অফিসে মেরিচাচীকে বলে সাইকেল নিয়ে রওনা হয়ে গেল রবিন। মুসা আর কিশোরও সাইকেল বের করলো। রবি সাইকেল নিয়েই এসেছে। তিনজনে চললো কারনিভলে।

খানিক আগেও রোদ ছিলো, এখন মেঘলা বাতাস। বাতাস বাড়ছে। দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ায় না হলে এই সেপ্টেম্বরের গোড়াতেই বৃষ্টি আশা করা যেতো।

এখানে এখন বৃষ্টির সম্ভাবনা কম, কিন্তু সূর্যের মুখ ঢেকে দিয়েছে মেঘ। মন-খারাপ-করা আলো।

কারনিভলের কাছে পৌছে সাইকেল থেকে নামলো কিশোর। অন্য দু'জন থামতে বললো, 'রবি, তুমি আগে যাও, আমাদের সাথে গেলে সন্দেহ করতে পারে। শুটিং গ্যালারির আশেপাশে কড়া নজর রাখবে। মুসা মাঠের ওদিকে গিয়ে কর্মীদের রিহারস্যাল দেখবে, ওপাশটায় চোখ রাখবে। আমি টহল দেবো বুদ আর তাঁবু-গুলোর কাছে। সন্দেহজনক সামান্যতম ব্যাপারও যেন চোখ না এড়ায়। ঠিক আছে?'

রবি আর মুসা, দু'জনেই মাথা ঝাঁকালো।

ডেন্টিস্টের ওখানে পৌছে দেখলো রবিন, রোগীর লাইন। তার ডাক চলে গেছে। কাজেই অপেক্ষা করতে হলো। অযথা বসে থাকা স্বভাব নয় তার। সামনের টেবিলে রাখা পত্র-পত্রিকা ঘাঁটতে লাগলো।

ম্যাগাজিন ওল্টানো শেষ করে দৈনিক পত্রিকা ধরলো। স্থানীয় পত্রিকা। রকি বীচ থেকে বেরোয়। কিং-এর ছাড়া পাওয়ার খবর আছে কিনা খুঁজলো। কোনোটাতে নেই। তবে কারনিভল সম্পর্কে একটা প্রতিবেদন লিখেছে একটা পত্রিকা। বলা যায় এক ধরনের বিজ্ঞাপনঃ কারনিভলটা কতো ভালো, কতো কিছু দেখার আছে এতে, কতো মজা পাওয়া যাবে, এসব। এতো ছোট আর সাধারণ খবর নিয়ে এই বাড়াবাড়ি কেবল ছোট পত্র-পত্রিকাতেই সম্ভব। বিরক্ত হয়ে পত্রিকাটা রেখে দিয়ে আরেকটা তুলে নিলো সে। ওল্টাতেই ছোট বিজ্ঞাপনটা চোখে পড়লো। আকর্ষণীয় বিজ্ঞাপনঃ

কানা বেড়াল আবশ্যক
বাচ্চাদের খেলাঘরের জন্য স্টাফ করা
বেড়াল চাই। লাল-কালো ডোরাকাটা হতে হবে,
শরীরটা কিম্ভূত রকমের বাঁকা, এক চোখো, গলায় লাল
কলার। ওরকম প্রতিটি বেড়ালের জন্যে
১০০ (একশো) ডলার দেয়া হবে।
অতি-সত্বর যোগাযোগ করুনঃ
রকি বীচ, ৫-১২৩৪।

নাড়ির গতি বেড়ে গেল রবিনের। ঠিক এরকম একটা বেড়াল নিয়েই কারনিভলে গোলমাল করেছিলো চোর, পুরস্কার পেয়েও হারিয়েছে মুসা। বিজ্ঞাপন ছিঁড়ে নিয়ে গিয়ে সোজা ডেন্টিস্টের চেম্বারে ঢুকলো রবিন। চেঁচিয়ে বললো, 'ডাক্তার সাহেব, আজ আমার দাঁত দেখানোর দরকার নেই! আরেকদিন!' বলেই

বেরিয়ে এলো হতভম্ব ডেন্টিস্টের ঘর থেকে। সাইকেলের দিকে দৌড় দিলো।

আট

মেঘাচ্ছন্ন ধূসর বিকেল একদম ভালো লাগে না মুসার। উত্তেজনা আছে বলেই তেমন খেয়াল করছে না এখন। একটা ঘন্টা যে কোন দিক দিয়ে কেটে গেছে, বলতেই পারবে না। মাঠের এখানে ওখানে ঘুরছে । রিহারস্যাল দেখছে কর্মীদের।

নতুন একটা ভাঁড়ামি প্র্যাকটিস করছে দুই ভাঁড়। বেঁটে লোকটার হাতে একটা খাটো ঝাড়ু, লম্বার হাতে একটা ছোট বালতি। বেঁটে ভাঁড় ঝাড়ু দিয়ে ময়লা তুলে বালতিতে রাখছে, সেটা তুলে নিয়ে তার পেছন পেছন যাচ্ছে লম্বা। কিছু ময়লা জমলেই তার ভারে বালতির তলা খসে যাচ্ছে। বিশেষ কায়দায় আবার তলাটা লাগিয়ে ময়লাগুলো কুড়িয়ে রাখছে লম্বা। তোলার চেষ্টা করলেই আবার খসে পড়ছে। ক্রমেই বিষণ্ন হচ্ছে তার চেহারা, আর বেঁটে লোকটা হাসছে। লম্বার দুর্গতি দেখে যেন খুব মজা পাচ্ছে বেঁটে।

তলোয়ারের মাথায় আটকানো তুলোর দলায় আগুন লাগিয়ে নির্দ্বিধায় মুখে পুড়ছে আগুনখেকো। চোখ বড় বড় করে দিচ্ছে মুসার। প্রতিবারেই সে ভাবছে, এইবার লোকটার মুখ পুড়বেই। কিন্তু পোড়ে না।

ভার উত্তোলন, আর মোটা বই টেনে ছেঁড়ার প্র্যাকটিস করছে স্ট্রং ম্যান কোহেন। তাকে সন্দেহ, তাই তার কাছেই বেশি সময় ব্যয় করছে মুসা। সন্দেহজনক কিছুই করছে না লোকটা।

সিংহের খাঁচায় কিংকে নতুন একটা খেলা শেখাচ্ছে মারকাস দ্য হারকিউলিস।

দুটো উঁচু খুঁটিতে বাঁধা তারের ওপর ভারসাম্য বজায়ের রোমাঞ্চকর খেলা খেলছে দু'জন দড়াবাজ।

সবই দেখছে মুসা। এমন ভাব করছে, যেন শুধু ওসব দেখার জন্যেই এসেছে সে।

কিছুই ঘটলো না মাঠে।

বুদ আর তাঁবুগুলোতে ঘোরাঘুরি করছে কিশোর। রাফনেক আর বুদ অপারেটররা রাতের জন্যে সেট সাজাচ্ছে, নষ্ট জিনিস মেরামত করছে। কোনো বুদ কিংবা তাঁবুই বাদ দিলো না সে, কোনো কোনোটাতে কয়েকবার করে ঢুকলো। কিন্তু সন্দেহজনক কিছু চোখে পড়লো না। ঘূর্ণমান নাগরদোলা দেখার জন্যে থেমেছে, এই সময় সেখানে এলো রবি। শুটিং গ্যালারিতে কাজ শেষ করে এসেছে।

'নাগরদোলাটা টেস্ট করবে না, রবি?' স্তব্ধ বিশাল চাকাটা দেখালো কিশোর, কাঠের ঘোড়াগুলো ঢেকে রাখা হয়েছে ক্যানভাস দিয়ে।

'চালাতে অনেক খরচ। কারনিভল খোলার আগে চালু করি, একটা মাত্র টেস্ট

রান দিয়েই চড়ার জন্যে ছেড়ে দিই।'

'ওটার জন্যে নিশ্চয় মেকানিক আছে? কিংবা অপারেটর?'

'আছে। বাবা নিজেই।'

চিন্তিত দেখালো কিশোরকে। বিড়বিড় করে কি বললো সে-ই বুঝলো।

'কিশোর,' রবি বললো। 'রবিন এসে পড়েছে।'

সাইকেল চালিয়ে মুসার কাছে গেল প্রথমে রবিন, তারপর দু'জনে মিলে এলো কিশোরদের কাছে। এসেই বললো রবিন, 'কিশোর, কানা বেড়ালটা চাইছে!'

'কোনটা? আমরা যেটা হারিয়েছি?' রবিনের মতোই চেঁচিয়ে বললো মুসা।

'আমার মনে হয় না ওটা হারিয়েছে,' গলা আরও চড়ালো রবিন। পকেট থেকে ছেঁড়া বিজ্ঞাপনটা বের করলো। 'চুরি হয়েছে! কিশোর, দেখো।'

গোয়েন্দাপ্রধানকে ঘিরে দাঁড়ালো সবাই। পড়তে পড়তে চোখ উজ্জ্বল হলো কিশোরের। 'নিশ্চয় মুসার কানাটার মতো। রবি, ওরকম বেড়াল মোট কটা পেয়েছিলে?'

'পাঁচটা। রকি বীচেই ছেড়েছি ওগুলো। মুসাকে দিয়েছিলাম শেষটা।'

'হুঁমম্,' মাথা দোলালো কিশোর, 'প্রথমবারে চেষ্টা করেছিলো, নিতে পারেনি, দ্বিতীয়বারে সফল হয়েছে। হুঁ, মিলতে শুরু করেছে।'

'কী?' রবিন জিজ্ঞেস করলো।

'কানা বেড়ালটা কারও দরকার, নথি। হয়তো পাঁচটাই দরকার। কিংকে ছেড়ে দেয়ার কারণ বোঝা যাচ্ছে।'

'কি কারণ?' মুসা জানতে চাইলো।

'আমাদের নজর অন্যদিকে সরানোর জন্যে। প্রথমবার বেড়ালটা নিতে না পেরে পালিয়ে গিয়েছিলো লোকটা, সেই গোঁফ আর কালো চশমাঅলা। তারপর ঘুরে এসে আবার ঢুকেছে শুটিং গ্যালারিতে, মুসাকে পুরস্কার জিততে দেখেছে। বুদ্ধি করে ফেলেছে তখনই। গিয়ে কিংকে বের করেছে। তোমরা বেরোতেই ওকে নিয়ে গিয়ে ঠেলে দিয়েছে তোমাদের সামনে। উদ্দেশ্য সফল হয়েছে তার। দু'জন গেছে মারকাসকে খবর দিতে। মুসা বেড়াল ফেলে সিংহ সামলাতে ব্যস্ত। সেই সুযোগে ওটা তুলে নিয়ে চলে গেছে চোরটা।'

'খাইছে, কিশোর, নিশ্চয় দামি কিছু আছে বেড়ালটার ভেতর।'

'থাকার সম্ভাবনা বেশি,' একমত হলো কিশোর। 'রবি, বেড়ালটার কোনো বিশেষত্ব আছে?'

'জানি না।'

নিচের ঠোঁটে দু'বার চিমটি কাটলো কিশোর। ভাবছে। অধীর হয়ে আছে অন্যেরা। ঠোঁট কামড়ালো একবার সে, বললো, 'হতে পারে কোনো খেপাটে,

সংগ্রহ করে রাখতে চাইছে তার সংগ্রহশালার জন্যে, বিজ্ঞাপন সে-ই দিয়েছে। কিংবা হয়তো বিশেষ কিছু রয়েছে ওই বেড়ালগুলোর মধ্যে…'

'কাকাতুয়াগুলোর যেমন ছিলো?' বলে উঠলো রবিন। 'ওই যে, তোতলা কাকাতুয়া…'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝোঁকালো কিশোর। 'দামি কিছু থাকতে পারে।…রবি, কারনিভল নিয়ে মেকসিকোতে গিয়েছিলে তোমরা? কিংবা সীমান্তের কাছে?'

'না, কিশোর। শুধু ক্যালিফোর্নিয়া।'

'মেকসিকোতে গেলে কি হতো?' রবিন জানতে চাইলো।

'স্মাগলিঙের কথা ভাবছি আমি, নথি। ওরকম জিনিসের ভেতর মাল লুকায় চোরাচালানীরা, পুলিশের চোখ ফাঁকি দেয়ার জন্যে। রবি, বেড়ালগুলো কোত্থেকে কিনেছো?'

'শিকাগো। এক প্রাইজ সাপ্লাইয়ারের কাছ থেকে কিনেছে বাবা।'

গাল চুলকালো কিশোর। 'যা-ই হোক, বেড়ালগুলোর বিশেষত্ব আছে। রবি, কাল রকি বীচে তোমাদের তৃতীয় দিন ছিলো, না?'

'হ্যাঁ। মাত্র দুটো শো দিয়েছি। স্যান মেটিওতে দুই শো দেখিয়ে রাতারাতিই চলে এসেছি এখানে।'

'বেড়ালগুলো কবে থেকে দিতে শুরু করেছো?'

'এখানে এসে, পয়লা শো থেকেই। শেষটা দিয়েছি কাল রাতে, মুসাকে। সেটা পঞ্চম বেড়াল।'

'প্রথম রাতেই চারটে দিয়ে দিলে কেন? চারজনেই ফার্স্ট হলো?'

'কড়াকড়ি কম করেছিলাম সেরাতে। চারটে হাঁস ফেলতে পারলেই ফার্স্ট ধরেছিলাম। বিজ্ঞাপনের জন্যে করেছিলাম এটা। লোকে বাড়ি গিয়ে বলাবলি করবে, প্রাইজ দেখাবে। তাতে আরও বেশি লোক আসবে পরের শো-তে।'

'ফার্স্ট প্রাইজ কি শুধু বেড়ালই দিয়েছো?'

'এখানে এসে প্রথম শো-তে বেড়াল।'

'কাল দেখলাম, একটা ট্রেলারে রাখো প্রাইজগুলো। নিরাপদ?'

'সব সময় তালা দিয়ে রাখি। শো যখন বন্ধ থাকে, ট্রেলারটা এনে আমাদের ট্রাকের সঙ্গে আটকে রাখি। বার্গলার অ্যালার্ম আছে, চুরির চেষ্টা হলেই বেজে ওঠে। কতোবার যে ওটা চুরি ঠেকিয়েছে। বেশির ভাগই ছোট ছেলেমেয়ে। ট্রাকের কাছে এসে ঘুরঘুর করে, পুরস্কারের জিনিসগুলো খুব লোভনীয় ওদের কাছে। শো যখন চলে, ট্রেলারটা এনে বুদের পেছনে রাখি, তখনও তালা লাগিয়ে।'

'বোঝা যাচ্ছে, তোমাদের চোখ এড়িয়ে ট্রেলার থেকে বেড়াল চুরি করা খুব কঠিন।'

'হ্যাঁ। তালা ভাঙ্গা সহজ, কিন্তু জিনিস নিয়ে পালানো কঠিন। তালা ভেঙে

জিনিস বের করে নিয়ে দৌড় দিতে দিতে দেখে ফেলবো।'

'হ্যাঁ,' বললো গোয়েন্দাপ্রধান। দুই সহকারী যেন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে, তীব্র গতিতে ঘুরছে তার মগজের বুদ্ধির চাকাগুলো। 'তাহলে, পাঁচটা কানা বেড়াল নিয়ে স্যান মেটিও থেকে রওনা হয়েছিলে। সোজা এসেছো এখানে। স্যান মেটিও আর রকি বীচের মাঝে বেড়ালগুলো চুরি করা কঠিন ছিলো। এখানে এসেও ট্রেলার থেকে চুরি করতে পারেনি, কারণ, সেটাও কঠিন। চোখে পড়ার ভয়। এখানে শো করে প্রথমেই চারটে বেড়াল দিয়ে দিলে। বাকি থাকলো একটা। সেটা ছিনিয়ে নিতে চাইলো গোঁফওয়ালা, কালো চশমা পরা বুড়ো। ব্যর্থ হলো। মুসা পেয়ে গেল বেড়ালটা। কিং ছাড়া পেলো, মুসা বেড়াল হারালো। এখন পেপারে বিজ্ঞাপনঃ ওরকম বেড়াল চায়।'

'সবই বুঝলাম। কিন্তু কেন চায়? কি মানে এসবের?'

গোয়েন্দাপ্রধানের চোখে অদ্ভুত চাহনি। কিশোর পাশার এই চাহনির অর্থ জানা আছে তার দুই সহকারীর—রহস্যের সমাধান করে ফেলেছে সে, কিংবা জরুরী কোনো তথ্য আবিষ্কার করেছে।

তর্জনী নাচালো কিশোর। 'কাল রাতের আগে বেড়ালগুলো ছিনিয়ে নেয়ার চেষ্টা হয়নি। দুটো সম্ভাবনা স্পষ্ট হয়ে উঠছে তাতে।' চকচক করছে তার চোখ। 'হঠাৎ করে দামি হয়েছে ওগুলো। আর যার কাছে দামি, সে এই কারনিভলেরই কেউ।'

নয়

'কিন্তু, কিশোর,' প্রতিবাদ জানালো রবি, 'ওরকম চেহারার কেউ নেই কারনিভলে।'

'ছদ্মবেশ নেয়া সহজ ব্যাপার। পুরু গোঁফ, হ্যাট টেনে দিয়েছে, যাতে চেহারাটা ভালোমতো দেখা না যায়। তার ওপর কালো চশমা। আবছা আলোয় আসল চেহারা বোঝা মুশকিল।'

'কারনিভলের লোক হলে ওভাবে নিতে আসবে কেন?' প্রশ্ন তুললো মুসা। 'ট্রেলার থেকেই তো নিয়ে নিতে পারতো।'

'হ্যাঁ, তাই তো,' রবিনও মুসার সঙ্গে সুর মেলালো। 'এতো চালাকির দরকার কি ছিলো তার? কোনো এক ফাঁকে ট্রেলার থেকেই নিয়ে নিতে পারত। রবি খেয়ালই করতো না।'

'ট্রেলার থেকে নেয়ার চেষ্টা করেনি বলেই আমার সন্দেহ বেড়েছে,' কিশোর জবাব দিলো। 'বাইরের কেউ হলে সে-চেষ্টাই করতো প্রথমে। কঠিন বুঝলেও

করতো। আর চিনে ফেলবে, এই ভয়ও করতো না।'

'তাহলে?'

'ওই যে বললাম, কারনিভলেরই কেউ। তার জানা আছে, ট্রেলার থেকে নেয়া প্রায় অসম্ভব। দেখে ফেললে মুশকিলে পড়বে, জবাবদিহি করতে হবে রবির বাবার কাছে। সব চেয়ে বড় কথা, ওই বেড়ালসহ ধরা পড়লে অনেকেরই সন্দেহ হবে ওগুলোতে দামি কিছু আছে।'

'ঠিক তাই। কানা বেড়ালের ওপর কারো নজর পড়ুক এটাই চায়নি সে। ভেতরের লোক নিলে স্পষ্ট হবে, জিনিসটা দামি। বাইরের কেউ নিলে, কাল যেভাবে ছিনিয়ে নিতে চাইলো, মনে হবে লোকটা পাগল। কিংবা খেপাটে সংগ্রহকারী। আর যা-ই ভাবুক, চোর ভাববে না কেউ।'

'কি সাংঘাতিক!' উরুতে চাপড় মারলো রবি। 'হয়তো ঠিকই বলেছো।' সন্দেহ যাচ্ছে না তার। মেনে নিতে পারছে না।

'আমি জানি আমি ঠিক বলছি,' ঠোঁটের এক কোণ কুঁচকালো কিশোর। 'শিওর হচ্ছি লোকটার অপেক্ষার ধরন দেখে। কাল রাত পর্যন্ত অপেক্ষা করেছে সে, চুরি করার জন্যে। কারনিভলের লোক বলেই সাবধান হতে হয়েছে তাকে, আর কারনিভলের লোক বলেই সময় নষ্ট করার ঝুঁকি নিতে পেরেছে। ঠিক সময়টা বেছে নিয়েছে, যখন বেড়াল ছিনতাই করলে কারও সন্দেহ পড়বে না তার ওপর। কারনিভলের কারও পক্ষেই শুধু রবির ওপর সারাক্ষণ চোখ রাখা সম্ভব, ঝোপ বুঝে কোপ মারা সম্ভব। তবে কোপ মারতে বেশি দেরি করে ফেলেছে।'

'এই না বললে ঠিক সময়?' মুসা ধরলো কথাটা।

'কাজটা করেছে ঠিক সময়ই, তবে বেশি দেরি করেছে আরকি।'

'বুঝলাম না।'

'বুঝলে না? রকি বীচে আসার আগে বেড়ালগুলোকে ফার্স্ট প্রাইজ হিসেবে চালানোর কথা ভাবেনি রবি। আর কিছু না পেয়েই ওগুলোকে চালিয়েছে। পয়লা রাতেই পার করে দিয়েছে চারটে। তাতে চমকে গেছে চোরটা। সে ভাবেওনি এরকম কিছু একটা করে বসবে রবি। চারটে চলে যাওয়ার পর আর ঝুঁকি নিতে চায়নি চোর, তাড়াহুড়ো করেছে, যাতে পঞ্চমটাও হাতছাড়া না হয়ে যায়। দেরি করে করেছে বললাম এই জন্যে, আগের দিন চেষ্টা করলে চারটে না হোক, অন্তত আরও দু'একটা বেড়াল সে হাতাতে পারতো। পঞ্চমটাও ছুটে যাচ্ছে দেখে বেপরোয়া হয়ে ওঠে সে, সিংহ ছাড়তেও দ্বিধা করেনি।'

'মুসার কাছে কিংকে নিয়ে যেতে হয়েছে,' রবি বললো। 'যদি সত্যিই নিয়ে গিয়ে থাকে। আর তা করতে হলে করেছে এমন কেউ, যাকে কিং চেনে।'

'মারাত্মক ঝুঁকি নিয়েছে, সন্দেহ নেই,' কিশোর বললো। 'তবে সফল হয়েছে।

একটা বেড়াল অন্তত নিতে পেরেছে। এখন বিজ্ঞাপন দিয়েছে বাকিগুলোর জন্যে। 'হয় মুসার বেড়ালটা সঠিক বেড়াল নয়, যেটা সে খুঁজছে, নয়তো সবগুলোই তার দরকার।'

মাথা দোলালো রবিন। 'হ্যাঁ, মনে হচ্ছে তোমার কথাই ঠিক। হঠাৎ করে বেড়ালগুলো দামি হয়ে উঠেছে, একথা বললে কেন?'

'কারণ, স্যান মেটিওতে আগুন লাগার আগে ওগুলো নেয়ার চেষ্টা করা হয়নি। হতে পারে, আগুন লাগানোই হয়েছে বেড়ালগুলো নেয়ার জন্যে। পারেনি। রবি, স্যান মেটিওতে শুটিঙের সময় বের করেছিলে ওগুলো?'

'কয়েকটা। এমনি লোককে দেখানোর জন্যে। শো-কেসে সাজিয়ে রেখেছিলাম। প্রাইজ দেয়ার ইচ্ছে ছিলো না।'

'কিশোর,' রবিন বললো। 'তুমি বললে সুযোগের অপেক্ষায় ছিলো চোর। স্যান মেটিওতেই যদি নেয়ার চেষ্টা করে থাকে, তোমার যুক্তি গোলমাল হয়ে যাচ্ছে না?'

'মোটেই না। আমি বলেছি, ঠিক সময়ের অপেক্ষায় ছিলো সে। হয়তো স্যান মেটিওতে চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে আরেকটা ভালো সুযোগের জন্যে বসেছিলো। তবে আগুন লাগার অন্য কারণও থাকতে পারে। সেই কারণটাই জানার চেষ্টা করবো। জানতে হবে, কেন, কে চায় কানা বেড়ালগুলো?'

'কি করে সেটা জানবো?' মুসার প্রশ্ন।

ভাবলো কিশোর। 'তুমি থাকবে। এমন কোথাও, যেখানে বসে কারনিভল থেকে কে কে বেরোয় সব দেখতে পাবে। তোমাকে যেন না দেখে।'

'আমার ওপরই এই গুরুদায়িত্ব?'

'আবারও বলছি, চোর এই কারনিভলেরই লোক,' মুসার কথা কানে তুললো না কিশোর। 'একশো ডলার কম না, লোকে সাড়া দেবেই। বেড়াল আনার জন্যে বেরোতেই হবে চোরকে। অবশ্য তার কোনো সহকারী না থাকলে। নেই বলেই মনে হয় আমার। একাই করছে যা করার। সন্দেহজনক কিছু চোখে পড়তে পারে তোমার। রবিন, দিনিজসপ্রেটা দিয়ে দাও ওকে। আমারটা আমার কাছেই থাক।'

'যাচ্ছো নাকি কোথাও?' রবি জিজ্ঞেস করলো। 'আমি আসবো?'

'তা আসতে পারো। জলদি জলদি করতে হবে আমাদের।'

'কোথায় যাচ্ছো তোমরা? আমাকে একা ফেলে?' প্রায় চেঁচিয়ে উঠলো মুসা।

তার প্রশ্নের জবাব দেয়ার প্রয়োজন মনে করলো না কেউ। ছুটতে শুরু করেছে সাইকেলের দিকে। করুণ চোখে ওদের যাওয়া দেখলো মুসা। তারপর ঘুরলো। শেষ বিকেল। আরও মলিন হয়েছে ধূসর আলো। লুকানোর জায়গা খুঁজতে শুরু করলো সে। পরিত্যক্ত পার্কের একটা উঁচু বেড়ার ওপর চোখ পড়লো, কারনিভলের প্রবেশপথ থেকে বিশ গজমতো দূরে।

বেড়ার জায়গায় জায়গায় এখানে ফুটো, ফোকর। পুরনো, বিশাল নাগরদোলার ভারি স্তম্ভগুলোর মাথা বেড়া ছাড়িয়ে উঠে গেছে। ওখানে লুকানোই সব চেয়ে সুবিধেজনক মনে হলো মুসার। চট করে একবার চারপাশে চোখ বুলিয়ে নিলো সে। কেউ তাকিয়ে নেই তার দিকে, সবাই যার যার কাজে ব্যস্ত। আস্তে আস্তে বেড়ার কাছে সরে এলো সে।

কেউ দেখছে না তাকে, আরেকবার চেয়ে নিশ্চিত হয়ে নিয়ে বেড়ার একটা ফোকরে মাথা ঢুকিয়ে দিলো সে। অন্যপাশে চলে এলো। নাগরদোলার স্তম্ভের মাঝের ফ্রেম বেয়ে উঠতে শুরু করলো। এমন একখানে এসে থামলো, যেখান থেকে কারনিভলের প্রবেশ পথ পরিষ্কার দেখা যায়।

মোটা একটা লোহার ডাণ্ডার ওপর পা ঝুলিয়ে বসলো সে। গা ছমছমে অনুভূতি। চারপাশের বিষণ্নতা যেন হাঁ করে গিলতে আসছে তাকে। ঠাণ্ডা বাতাসে বিচিত্র ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজ করছে ভাঙা, পুরনো কাঠের কাঠামো, নীরব শূন্যতা সইতে না পেরে যেন গুঙিয়ে উঠছে মাঝে মাঝে, সেই সঙ্গে মিলিত হচ্ছে জোর বাতাসের দীর্ঘশ্বাস। মুসার মনে হলো, উঁচু ওই বেড়াটা ওপাশের জীবন্ত পৃথিবী থেকে আলাদা করে দিয়েছে তাকে।

মাথার অনেক ওপরে উঠে গেছে স্তম্ভগুলো, কালচে ধূসর আকাশ ফুঁড়ে বেরিয়ে যাওয়ার হুমকি দিচ্ছে যেন। স্তম্ভ আর বেড়ার মাঝের পোড়ো ফান হাউসটাকে কেমন ভূতুড়ে লাগছে। ওটার প্রবেশ পথ দেখে মনে হয়, মস্ত দৈত্যের হাঁ করা মুখে রঙ মাখিয়ে দিয়েছে। কেউ হাসছে নীরব হাসি। ডানে, সাগরের ধারে লাশ হয়ে পড়ে আছে বুঝি টানেল অভ লাভ। মানুষের তৈরি ওই সুড়ঙ্গের দেয়ালে অসংখ্য ফোকর। সরু মুখের কাছে গড়িয়ে যাচ্ছে ছোট ছোট ঢেউ, একসময় ওখানে বাঁধা থাকতো অনেক নৌকা, টিকেট কেটে লোকে চড়তো ওগুলোতে, ঘুরে আসতো সাগর থেকে।

বড় একা লাগছে মুসার। সতর্ক হয়ে উঠলো হঠাৎ। কারনিভলের গেট দিয়ে লম্বা লম্বা পায়ে বেরিয়ে যাচ্ছে একজন। রকি বীচের বাণিজ্যিক এলাকার দিকে চলে গেল লোকটা। চেনা চেনা লাগলো তাকে। পরনে ধোপদুরস্ত শহুরে পোশাক, দূর থেকে ম্লান আলোয় চিনতে পারলো না লোকটাকে মুসা।

কোহেন না তো? চওড়া কাঁধই তো, নাকি? দাড়িও আছে না মুখে? তবে এলোমেলো লম্বা চুল দেখা গেল না, হ্যাটের জন্যেই বোধহয়। পরনে কালো-সোনালি পাজামাও নেই, কাজেই শিওর হতে পারলো না মুসা।

খানিক পরেই আরেকজনকে বেরোতে দেখা গেল। লম্বা। ওকেও চেনা চেনা লাগলো, কিন্তু চিনতে পারলো না মুসা। সান্ধ্য পোশাক পরে মারকাস দ্য হারকিউলিস গেল না তো?

দমে গেল মুসা। পঞ্চাশ-ষাট গজ অনেক দূর। এতো দূরে বসা উচিত হয়নি। পোশাক বদলে বেরোলে এখান থেকে দেখে কারনিভলের একজন কর্মীকেও চিনতে পারবে না সে। স্থান নির্বাচন যে ভুল হয়ে গেছে, নিশ্চিত হলো আরও দু'জন বেরোনোর পর। তৃতীয়জনও লম্বা, মনে হলো বয়স্ক, ধূসর চুল। চতুর্থজনকে চিনতে পারলো শুধু মাথার টাকের জন্যে, আগুন খেকো। তবে চতুর্থ লোকটার ব্যাপারেও কিছুটা সন্দেহ রয়ে গেল। টাকমাথা আর কি কেউ থাকতে পারে না?

নেমে, জায়গা বদল করে বসবে কিনা ভাবতে ভাবতেই আরও অনেকে বেরিয়ে গেল। নিশ্চয় রিহারস্যালের সময় শেষ। বাইরে বেরোচ্ছে তাই কারনিভলের লোকেরা। ওদেরকে চিনতে পারলেও খুব একটা লাভ হতো না, বুঝতে পারলো মুসা। অনেকেই তো বেরোচ্ছে। ক'জনকে সন্দেহ করবে?

অবশেষে সত্যি সত্যি একজনকে চিনতে পারলো। মিস্টার কনর। দ্রুত হেঁটে গিয়ে একটা ছোট গাড়িতে উঠে চলে গেলেন।

নড়েচড়ে বসলো মুসা। ভাবছে। নামবে? গিয়ে খুঁজে বের করবে বন্ধুদের? নাকি যেখানে আছে, বসে থাকবে আরও কিছুক্ষণ?

সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না।

বাতাস বাড়ছে। সেই সঙ্গে বাড়ছে পুরনো নাগরদোলার ক্যাঁচকোঁচ আর গোঙানি।

দশ

আগে আগে চলেছে কিশোর। দুই সঙ্গীকে নিয়ে যাচ্ছে স্যালভিজ ইয়ার্ডে।

ইয়ার্ডে ঢুকে, ওদেরকে দাঁড়াতে বলে সাইকেল রেখে গিয়ে জঞ্জালের গাদায় ঢুকলো সে।

সাইকেলে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে জঞ্জালের ভেতর জিনিসপত্র ঘাঁটা আর ছুঁড়ে ফেলার আওয়াজ শুনতে লাগলো রবিন আর রবি।

'করছেটা কি?' রবি বুঝতে পারছে না।

'জানি না,' রবিনও পারছে না। 'আগে থেকে কিছু বলতে চায় না কিশোর, স্বভাব। কাজ শেষ করে তারপর বলে। কি করছে সে-ই জানে।'

দুড়ুম-দাড়ুম আওয়াজ হচ্ছে জঞ্জালের গাদায়। রেগে গিয়ে সব যেন ছুঁড়ে ফেলছে কিশোর। অবশেষে শোনা গেল উল্লসিত চিৎকার, হাসিমুখে বেরিয়ে এলো সে। হাতে একটা অদ্ভুত জিনিস। ওখান থেকেই চেঁচিয়ে বললো, 'জানতাম পাবো। পাশা স্যালভিজ ইয়ার্ডে সব মেলে।'

কিশোর কাছে এলে জিনিসটা চিনতে পারলো অন্য দুজন। স্টাফ করা একটা

বেড়াল। সাদার ওপর কালো ফোঁটা। তিনটে পা ছিঁড়ে ঝুলছে, একটা নেই-ই। একটা চোখ খসে পড়েছে। চামড়া ফেটে ভেতরের তুলা-ছোবড়া সব বেরিয়ে পড়েছে।

'এটা দিয়ে কি হবে?' রবি জিজ্ঞেস করলো।

'বিজ্ঞাপনের জবাব দেবো,' হাসি চওড়া হলো কিশোরের।

'কিন্তু ওটা তো কানা বেড়ালের মতো না!' হাত নাড়লো রবিন।

'না তো কি হয়েছে? হয়ে যাবে। এসো।'

দুই সুড়ঙ্গ দিয়ে হেডকোয়ার্টারে ঢুকলো ওরা। ছোট একটা ওয়ার্কবেঞ্চে বসলো কিশোর। ফিরে চেয়ে বললো, 'রবিন, ফোন করে জিজ্ঞেস করো তো, কোথায় যেতে হবে।'

রবিন রিসিভার তোলার আগেই কাজে হাত দিলো কিশোর। রঙ, ব্রাশ, সুই-সুতো, কাপড়, তুলা, তার, আর দ্রুত রঙ শুকানোর কেমিক্যাল বের করলো। তিনটে পা মেরামত করে সেলাই করলো জায়গামতো, নতুন আরেকটা পা বানিয়ে লাগালো, শরীরের ছেঁড়া জায়গা সেলাই করলো। টিপে, চেপে বাঁকা করলো বেড়ালটাকে। পা-গুলো বাঁকিয়ে দিলো। তারপর রঙ করতে শুরু করলো।

ফোন শেষ করে ফিরে এলো রবিন।

'কি বললো?' মুখ তুললো না কিশোর, বেড়ালের গায়ে ব্রাশ ঘষছে।

'একটা অ্যানসারিং সার্ভিসের নাম্বার ওটা,' রবিন জানালো। 'তেত্রিশ স্যান রোকুই ওয়েতে যেতে বললো। এখান থেকে মাত্র দশ ব্লক দূরে।'

'গুড। অনেক সময় আছে। অ্যানসারিং সার্ভিসের সাহায্য নিয়েছে, তার কারণ, বিজ্ঞাপন দেয়ার সময় লোকটার কোনো ঠিকানা ছিলো না।'

আধ ঘন্টা পর সন্তুষ্ট হয়ে ব্রাশ রাখলো কিশোর। একটা কলারে লাল রঙ করে পরিয়ে দিলো বেড়ালের গলায়। 'ব্যস, হয়েছে, লাল-কালো ডোরাকাটা কানা বেড়াল। পা ঠিকমতো বাঁকা হয়েছে তো? হয়েছে। তবু, চোখ থাকলে চিনে ফেলবে। কাজ চালানো যাবে আশা করি।'

'আমার কাছেও রবির বেড়ালের মতো লাগছে না,' রবিন বললো।

'না লাগুক। গিয়ে অন্তত দেখাতে পারবো, বেড়াল এনেছি।'

পনেরো মিনিট পর, ৩৩ স্যান রোকুই ওয়ে-র সীমানায় পাম গাছের একটা জটলায় ঢুকলো তিন কিশোর। ইঁটের তৈরি ছোট একটা বাড়ি, রাস্তা থেকে দূরে। রঙচটা একটা সাইনবোর্ড বুঝিয়ে দিলো, একসময় ওটা এক ঘড়ি মেরামতকারীর অফিস-কাম-বাড়ি ছিলো। মেঘলা বিকেলে অস্বাভাবিক নির্জন লাগছে বাড়িটা। জানালায় পর্দা নেই, ভেতরে আলো জ্বলছে না।

তবে রাস্তা নির্জন নয়। দলে দলে আসছে ছেলেমেয়েরা। হাতে, বগলের

তলায় স্টাফ করা বেড়াল। নানা জাতের, নানা রঙের, নানা ধরনের। যার কাছে যা আছে, নিয়ে এসেছে, বিজ্ঞাপনের সঙ্গে মিলুক না মিলুক। একশো ডলার অনেক টাকা, বিক্রির জন্যে সবাই উদ্বিগ্ন।

'বেশির ভাগই তো মেলে না,' রবিন বললো। 'তবু এনেছে।'

'লোকে কিছু না দিয়েই টাকা নিতে চায়,' তিক্তকণ্ঠে বললো রবি। 'শুটিং গ্যালারি চালাই তো, লোকের স্বভাব-চরিত্র আমার জানা।'

'ওরা ভাবছে,' কিশোর বললো। 'ওদেরটা পছন্দ হয়ে যেতেও পারে। হলেই কড়কড়া একশো ডলার। একটার দামও দশের বেশি হবে না, নব্বই ডলারই লাভ।'

এই সময় নীল একটা গাড়ি ঢুকলো বাড়ির আঙিনায়, ঘুরে চলে গেল ওপাশে। গাড়ি থেকে নেমে দ্রুত হেঁটে গিয়ে দরজার সামনে দাঁড়ালো একজন লোক। দূর থেকে তার চেহারা ভালোমতো দেখলো না ছেলেরা, চিনতে পারলো না।

দরজার তালা খুলে ভেতরে ঢুকলো লোকটা। হুড়মুড় করে ঢুকতে শুরু করলো ছেলেমেয়ের দল।

গাছের আড়ালে হুমড়ি খেয়ে থাকতে থাকতে উত্তেজিত হলো রবি। 'আমরা কি করবো, কিশোর?'

'নীল গাড়িটা চিনেছো?' জবাব না দিয়ে প্রশ্ন করলো কিশোর।

আরেকবার তীক্ষ্ণ চোখে দেখলো রবি। 'না। আগে দেখেছি বলে মনে পড়ে না। কারনিভলের সবার গাড়িই এরচে বড়, ট্রেলার টানতে হয় তো।'

'বেশ,' মাথা কাত করলো কিশোর। 'আমরা দু'জন এখানে থাকছি। বেড়াল নিয়ে রবিন যাক। কয়েক মিনিট পর আমরা একজন গিয়ে কাছে থেকে দেখবো গাড়িটা। হুঁশিয়ার থাকতে হবে আমাদের, যাতে দেখে না ফেলে। চোরটা যাতে বুঝতে না পারে কেউ তাকে সন্দেহ করেছে, পিছু নিয়েছে। কারনিভলের লোক হলে তোমাকে চিনবেই।'

'আমি গিয়ে কি কি করবো?' রবিন জিজ্ঞেস করলো।

'বেড়াল বিক্রির চেষ্টা করবে। হয়তো কিনবে না সে। না কিনুক। তোমার আসল কাজ হবে, তার চেহারা দেখে আসা। জেনে আসা, বেড়াল নিয়ে কি করে সে।'

'বেশ, যাচ্ছি,' আবার সাইকেলে চাপলো রবিন।

বেড়ালটা বগলে চেপে, সাইকেল চালিয়ে এসে বাড়ির দরজায় থামলো সে। সাইকেল স্ট্যাণ্ডে তুলে মিশে গেল ছেলেমেয়েদের স্রোতে।

বড় একটা হলঘরে ঢুকলো। বাচ্চারা গিজগিজ করছে ওখানে। আসবাব বলতে কয়েকটা কাঠের চেয়ার, আর একটা লম্বা টেবিল। টেবিলের ওপাশে বসে

আছে একজন মানুষ, চেয়ার-টেবিলের বেড়ার ওপাশে আত্মগোপন করতে চাইছে যেন। এক এক করে বেড়াল নিয়ে পরীক্ষা করছে।

'দুঃখিত,' বললো সে। 'এই তিনটে চলবে না।' খসখসে কণ্ঠস্বর। 'বিজ্ঞাপনেই বলেছি কেমন বেড়াল চাই।...না, তোমার ওটাও চলবে না, সরি।'

আরেকটা বেড়াল নিয়ে এগিয়ে গেল একটা ছেলে। হাত বাড়িয়ে বেড়ালটা প্রায় কেড়ে নিলো লোকটা। ওরকম জিনিসই পুরস্কার জিতে আবার হারিয়েছে মুসা। লোকটার বাহুতে একটা টাট্টু আঁকা দেখলো রবিন, পালতোলা একটা জাহাজের ছবি, স্পষ্ট।

'গুড,' লোকটা বললো। 'এই জিনিসই চাই। এই নাও তোমার একশো ডলার।'

রবিনের কানে ঢুকছে না যেন কথা। ভাবছে, ওই লোকটা কি কারনিভলের কেউ? তাহলে নিশ্চয় চিনতে পারবে রবি। ওই টাট্টু তার চোখে না পড়ার কথা নয়। বাদামী চামড়ার লোক, সোজা তাকালো রবিনের দিকে। 'এই, এই ছেলে, তুমি। দেখি এদিকে এসো তো।'

চমকে গেল রবিন। তাকে কি সন্দেহ করলো লোকটা? দুরুদুরু বুকে এগিয়ে গিয়ে বেড়ালটা রাখলো টেবিলে। ওটার দিকে একবার চেয়েই হাসলো লোকটা। 'হুঁ, মেরামত করা হয়েছে। মন্দ না। আমার বাচ্চারা পছন্দ করবে। এই নাও, তোমার টাকা।'

থ হয়ে গেল রবিন। হাত বাড়িয়ে নিলো একশো ডলার, বিশ্বাস করতে পারছে না। চেয়ে আছে লোকটার দিকে। কিন্তু লোকটা গুরুত্ব দিলো না তাকে। আরেকটা ছেলের দিকে তাকালো।

টেবিলের কাছ থেকে সরে এলো রবিন। দেখলো, টেবিলের ধারে মেঝেতে বেড়ালের স্তূপ। তারটা সরিয়ে রাখা হয়েছে একপাশে। ওটার সঙ্গে ওরকম আরও একটা। খানিক দূরে রাখা আরও দুটো, মুসা যেটা পুরস্কার পেয়েছিলো অবিকল সেরকম।

ধীরে ধীরে পাতলা হয়ে আসছে ভিড়। অস্বস্তি লাগছে রবিনের। বেরিয়ে যাবে, না থাকবে? কিছুই তো জানা হলো না এখনও, যায় কি করে? আবার থাকলেও যদি সন্দেহ করে লোকটা? ঝুঁকি নেয়াই ঠিক করলো সে। থাকবে আরও কিছুক্ষণ।

'দেখো, খোকা, ওরকম বেড়াল চাইনি আমি,' নাছোড়বান্দা একটা ছেলেকে বোঝাচ্ছে লোকটা। 'দেখতে পাচ্ছি তোমারটা ভালো, কিন্তু আমি অন্য জিনিস চাই। বাচ্চাকে বড়দিনের উপহার দেবো। আমার পছন্দ না হলে দিই কি করে, তুমিই বলো?' ছেলেটাকে চওড়া হাসি উপহার দিলো সে। হাত নাড়তে আবার

পাল-তোলা-জাহাজটা চোখে পড়লো রবিনের।

'কি জিনিস চান, বুঝতে পারছি,' ছেলেটা বললো। 'ওই দুটোর মতো তো? একটার খবর আপনাকে দিতে পারি। আমার বন্ধু ডিক ট্যানারের কাছে আছে। কারনিভলে পুরস্কার পেয়েছে।'

'তাই?' ভুরু কুঁচকে গেল লোকটার, ঠোঁট সামান্য ফাঁক। 'নিশ্চয় আমার বিজ্ঞাপন দেখেনি। আমার হাতেও আর সময় নেই, শুধু আজকের দিনটাই।'

'গিয়ে তাহলে কথা বলুন ওর সাথে,' ছেলেটা বললো। 'আমাদের বাড়ির কাছেই থাকে। টোয়েন্টি ফোর কেলহ্যাম স্ট্রীট।'

'এহ্‌হে, দেরি হয়ে গেল,' হঠাৎ যেন তাড়াহুড়া বেড়ে গেল লোকটার। ক্ষণিকের জন্যে তাকালো রবিনের দিকে। জ্বলে উঠলো না? নাকি চোখের ভুল? ঠিক বুঝতে পারলো না রবিন। অল্প কয়েকটা ছেলে রয়েছে আর ঘরে। ওরা যতোক্ষণ থাকে, সে-ও থাকবে, সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললো।

আরেকটা ছেলের কাছে একটা লাল-কালো ডোরাকাটা কানা বেড়াল কিনলো লোকটা। আর কারও কাছে নেই ওরকম বেড়াল। হাত নেড়ে সবাইকে বেরিয়ে যেতে বললো লোকটা। বাধ্য হয়ে বেরিয়ে আসতে হলো রবিনকে। সাইকেল নিয়ে তাড়াতাড়ি চললো পাম গাছগুলোর কাছে।

'অনেকক্ষণ থাকলে,' রবি বললো।

'জানার চেষ্টা করলাম,' হাত দিয়ে কপালের ঘাম মুছলো রবিন। 'লোকটা লম্বা, বাদামী চামড়া, বাহুতে একটা পাল-তোলা-জাহাজের টাট্টু। কারনিভলের কেউ?'

'পাল-তোলা-জাহাজ?' চিবুক ডললো রবি। 'না, ওরকম কেউ তো নেই। কয়েকজন রাফনেকের হাতে টাট্টু আছে, তবে জাহাজ নয়। আর চেহারাও…নাহ্‌, মেলে না কারও সাথে।'

চিন্তিত লাগছে কিশোরকে। 'কারনিভলে হয়তো লুকিয়ে রাখে,' বললো সে। 'আর মেকআপ নিয়ে মুখের রঙ বদলানোও কিছু না। রবিন, রবি গিয়ে ওর গাড়িটা দেখে এসেছে। কোনো সূত্র পায়নি। লাইসেন্স নম্বর লিখে নিয়েছি।'

'আসল কথাটাই বলিনি এখনও, কিশোর। ও আমাদের বেড়াল কিনেছে।'

বাড়ি পড়লো যেন কিশোরের মাথায়। 'কিনেছে! নকলটা!'

পকেট থেকে একশো ডলার বের করে দেখালো রবিন। 'এই যে, টাকা। ওরকম দেখতে আরও চারটে কিনেছে। তারমধ্যে তিনটে আসল মনে হলো।'

'তোমাকে চিনেছে?'

'কি করে? আগে কখনও দেখা হয়নি তো।'

'কাল রাতের চোরটাই না তো?' নিজেকেই করলো প্রশ্নটা। 'যদি সে হয়,

আর তোমাকে চিনে থাকে, তাহলে আমাদের বোকা বানানোর জন্যেই কিনেছে বেড়ালটা।'

'আসল তাহলে তিনটে পেয়েছে?' রবি বললো।

আরও একটার খোঁজ দিলো একটা ছেলে। কারনিভলে নাকি পুরস্কার পেয়েছে। থাকে চব্বিশ নম্বর কেলহ্যাম স্ট্রীটে। নাম ডিক ট্যানার।'

'এটাই আসল খবর, রবিন!' চুটকি বাজালো কিশোর। 'তিনটে কিনেছে, আমার ধারণা, চার নম্বরটাও কিনতে যাবে। আমরাও যাবো ডিকের বাড়িতে। তার আগে দেখি বেড়াল তিনটে নিয়ে লোকটা কি করে…'

'কিশোর,' বলে উঠলো রবি। 'শেষে যে ছেলেটা ঢুকেছিলো, সে-ও বেরোচ্ছে।'

ছেলেটার বগলে একটা সাদা বেড়াল। বিক্রি করতে পারেনি। লোকটাকেও দেখা গেল দরজায়। আর কেউ আসছে কিনা বোধহয় দেখতে বেরিয়েছে। নির্জন পথে চোখ বোলালো, তারপর ঢুকে গেল আবার ভেতরে।

'এসো,' বলে, উঠে দাঁড়ালো কিশোর।

কালচে হয়ে আসছে ধূসর গোধূলি। পা টিপে টিপে বাড়িটার কাছে চলে এলো ওরা। সাবধানে মাথা তুলে লিভিং রুমের জানালা দিয়ে সাবধানে ভেতরে তাকালো।

আগের জায়গাতেই বসা লোকটা। সামনে টেবিলে রেখেছে এখন তিনটে কানা বেড়াল, যেগুলো মুসারটার মতো দেখতে। একটা বেড়াল হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখতে শুরু করলো।

'হ্যাঁ, ওগুলোই পুরস্কার দিয়েছি,' ফিসফিসিয়ে বললো রবি।

'ওই যে, দুটো ফেলে রেখেছে,' কিশোর বললো। 'কোণের দিকে দেখো।'

রবি আর রবিনও দেখলো। দুটোই নকল। তার একটা রবিন নিয়ে গিয়েছিল।

'ফেলে দিয়েছে,' আবার বললো কিশোর। 'তারমানে তোমারগুলোই চায়, রবি।'

'শ্‌শ্‌শ্‌!' হুঁশিয়ার করলো রবিন।

তৃতীয় বেড়ালটাও দেখা শেষ করেছে লোকটা। রেখে দিয়েছে টেবিলে। হাতে বেরিয়ে এসেছে ইয়া বড় এক ছুরি।

এগারো

নড়তে ভুলে গেছে যেন ছেলেরা। ছুরিহাতে উঠে দাঁড়িয়েছে লোকটা। আচমকা, একটা বেড়াল টেনে নিয়ে পোঁচ মারলো। চিরে ফেললো পেট। দ্বিতীয়টার

চিরলো। তৃতীয়টারও। তারপর টেনে টেনে বের করতে লাগলো ভেতরের তুলা, ছোবরা, কাঠের গুঁড়ো। সমস্ত কিছু ছড়াতে লাগলো টেবিলে। ছোবড়া আর তুলার ভেতর খুঁজতে লাগলো কি যেন!

জোরে জোরে নিঃশ্বাস পড়ছে। ছুরিটা টেবিলে ফেলে হতাশ ভঙ্গিতে বসে পড়লো চেয়ারে। কঠোর দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ছেঁড়া বেড়ালগুলোর দিকে, পারলে চোখের আগুনেই ভস্ম করে ফেলে।

'পায়নি,' ফিসফিস করে বললো রবিন।

'না,' কিশোর বললো। 'ডিকেরটার ভেতরে থাকতে পারে। চলো, চলো, ও বেরোবে! কুইক!'

ল্যফিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে লোকটা। হাত বাড়ালো চেয়ারে রাখা হ্যাটের দিকে।

কাছেই হিবিসকাসের গোটা তিনেক ঘন ঝোপ। ওগুলোর ভেতরে এসে প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়লো তিনজনে। বেরিয়ে, দরজা লাগিয়ে দ্রুত পায়ে এগিয়ে এলো লোকটা। ঝোপের দিকে চোখ তুলেও তাকালো না। লম্বা পা ফেলে হারিয়ে গেলে বাড়ির আড়ালে। গাড়ির দরজা বন্ধ করার শব্দ হলো। স্টার্ট নিলো ইঞ্জিন। শাঁ করে ছুটে বেরিয়ে গেল নীল গাড়িটা।

'বেড়াল নিতে যাচ্ছে!' রবিন বললো।

'চলো, আমরাও যাই,' বললো রবি।

'আমাদের সাইকেল, ওর গাড়ি। আর কেলহ্যাম স্ট্রীট এখান থেকে পাঁচ মাইল। তোমাদের কারনিভলের কাছাকাছি।'

হতাশ দৃষ্টিতে পরস্পরের দিকে তাকালো ওরা।

'কিছুই করতে পারছি না আমরা!' গুঙিয়ে উঠলো রবিন। 'কিশোর, কিছু একটা করো!'

'কি করবো?' ঝোপ থেকে বেরোলো কিশোর। থমথমে চেহারা। বাড়িটার দিকে চেয়ে হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। 'পারবো হয়তো! দেখো দেখো, টেলিফোনের তার!' বলতে বলতেই দৌড় দিলো সে। দরজা দিয়ে ঢুকতে পারলো না। তালা লাগানো।

'জানালা!' চেঁচিয়ে উঠলো রবি।

লিভিং রুমের জানালার পাল্লায় ঠেলা দিতেই খুলে গেল। এক এক করে চৌকাঠে উঠে টপাটপ ভেতরে লাফিয়ে পড়লো তিনজনে।

'ফোনটা কোথায় দেখো!' তাগাদা দিলো কিশোর। 'সবখানে খোঁজো!'

'ওই যে, কিশোর,' হাত তুলে দেখালো রবি। 'ওই যে, ঘরের কোণে মেঝেতে রেখে দিয়েছে।'

ছুটে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসলো কিশোর। ছোঁ মেরে রিসিভার তুলে কানে

ঠেকালো। আস্তে করে আবার ক্রেডলে রেখে দিয়ে মাথা নাড়লো। 'নষ্টহ্!' ফোঁস করে ছাড়লো ফুসফুসে চেপে রাখা বাতাস।

'হলো না তাহলে?' রবিন বললো।

'জানি না,' নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটলো কিশোর। 'সাইকেল নিয়ে যেতে পারি…লাভ হবে বলে মনে হয় না। বাড়িতে লোক না থাকলে অবশ্য…'

'না থাকলে কি বসে থাকবে মনে করেছো? তালা ভেঙে ঢুকে নিয়ে যাবে।'

'কাছেপিঠে পাবলিক টেলিফোন নেই?' রবি জিজ্ঞেস করলো।

গুঙিয়ে উঠলো কিশোর। 'তাই তো! আমার মগজ ভোঁতা…,' কথা শেষ না করেই থেমে গেল।

বাইরে পায়ের শব্দ, এগিয়ে আসছে। তাড়াতাড়ি গিয়ে জানালা দিয়ে উঁকি দিলো রবিন। ঝট করে মাথা নুইয়ে ফেললো আবার। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ফিরে এসে জানালো, 'লোকটা ফিরে এসেছে!'

'চলো বেরিয়ে যাই,' উদ্বিগ্ন হয়ে বললো রবি।

'সময় নেই,' মৃদু কাঁপছে রবিনের কণ্ঠ ।

আঙুল তুলে দরজা দেখালো কিশোর, পেছনের ঘরে ঢোকার। দৌড়ে গিয়ে ঢোকার সময় ধাক্কাধাক্কি লাগিয়ে দিলো ওরা। আগে ঢুকলো রবি, পেছনে রবিন, সবার শেষে কিশোর। ছোট ঘর। আসবাবপত্র কিছু নেই। জানালায় খড়খড়ির জন্যে আলো আসতে পারছে না। তাড়াতাড়ি দরজাটা লাগিয়ে দিয়ে ওটা ঘেঁষে দাঁড়ালো ওরা।

লিভিং রুমের দরজা খোলার শব্দ হলো, বন্ধ হলো।

দীর্ঘ নীরবতা।

তারপর ছেলেদের চমকে দিয়ে খলখল করে হেসে উঠলো লোকটা। খসখসে গলায় বললো, 'খুব চালাক, না? অতি চালাকের গলায় দড়ি, ভুলে গেছো!'

একে অন্যের দিকে তাকালো ওরা।

আবার শোনা গেল হাসি। 'তিন-তিনটে মাথা জানালায়, ভেবেছো দেখিনি? আরও সাবধানে উঁকি দেয়া উচিত ছিলো। তোমাদের অনেক আগে দুনিয়ায় এসেছি, বাছারা, চোখ পেকেছে, কান পেকেছে। তিন বুদ্ধু, বোকামির শাস্তি পাবে এখন।'

দরজায় তালা লাগানোর শব্দ হলো। তারপর আরেকটা ভারি ধাতব শব্দ, লোহার দণ্ড আড়াআড়ি ফেলে পাল্লা আটকানো হয়েছে, যাতে তালা ভাঙলেও দরজা খুলতে না পারে। 'নাও, থাকো এখন,' বললো খসখসে কণ্ঠ। 'একটা কথা মনে রেখো। আর আমার ধারেকাছে আসবে না।' হাসলো না আর। দূরে সরে গেল পদশব্দ। দড়াম করে বন্ধ হলো সামনের দরজা। ভারি নীরবতা যেন চেপে বসলো

ছোট্ট বাড়িটার ওপর।

'জানালা,' বললো কিশোর। গিয়ে খড়খড়ি তুলেই থমকে গেল। শিক লাগানো। বিড়বিড় করলো, 'নিশ্চয় এটা ঘড়ি মেকারের স্টোররুম ছিলো!'

'জানালা খুলে চেঁচাই,' রবিন বললো।

গলা ফাটিয়ে চেঁচালো ওরা। কেউ শুনলো না। কেউ এলো না। রাস্তা অনেক দূরে, বাড়িঘর আরও দূরে। ওদের চিৎকার কারও কানে গেল না। কয়েক মিনিট পর পা ছড়িয়ে মেঝেতেই বসে পড়লো রবি। জানালা খোলায় ঘরে আলো এসেছে। এই প্রথম চোখে পড়লো আরেকটা দরজা।

ছুটে গেল কিশোর। লাভ হলো না। ওটাও শক্ত করে আটকানো, তালা দেয়া।

'আমাদের দৌড় এখানেই শেষ,' হতাশ কণ্ঠে বললো রবি। 'বেড়ালটা নিয়ে যাবে সে। আটকাতে পারবে না।'

'এখনও আশা আছে,' বলে উঠলো কিশোর। 'দিনিজসপ্রে! মুসা আমাদের বিপদ সঙ্কেত পাবে।'

পকেট থেকে খুদে হোমারটা বের করলো গোয়েন্দাপ্রধান। মুখের কাছে এনে জোরে জোরে বললো, 'সাহায্য! সাহায্য!'

খুব মৃদু গুঞ্জন শুরু করলো যন্ত্রটা।

'লাল আলো জ্বলবে এখন মুসার হোমারে,' বললো কিশোর। সত্যিই শুনবে তো—তিনজনে একই কথা ভাবছে। সাহায্য করতে আসবে ওদেরকে?

ডাণ্ডার ওপরই বসে আছে মুসা। পর্বত থেকে আসা কনকনে ঠাণ্ডা বাতাস সুচের মতো বিঁধছে চামড়ায়। কাঁপ তুলে দিচ্ছে গায়ে। আকাশ মেঘলা থাকায় সন্ধ্যার আগেই সন্ধ্যা নামছে। প্রবেশ পথের লোকজন এখন শুধু ছায়া।

যারা যারা বেরিয়েছে, তাদের একজনকেও ফিরতে দেখেনি। অথচ কারনিভলে শো শুরু হতে আর মাত্র ঘন্টাখানেক বাকি। গেল কোথায় সবাই? কিশোর, রবিন আর রবিই বা কোথায় গেল? কারনিভল খোলার আগেই তো রবির ফেরার কথা। কিশোর বা রবিনেরও এতো দেরি করার কথা নয়, অন্তত একটা মেসেজ তো পাঠানো উচিত ছিলো।

উদ্বিগ্ন হলো মুসা।

মাঝে মাঝে কিশোর এমন আচরণ করে না, রাগ লাগে তার। কোথায় যাচ্ছে, বলে গেলে কি ক্ষতি হতো বাবা? না, সব কাজ শেষ করে, সফল হয়ে এসে তারপর বলা! যত্তোসব! তার এসব নাটকীয়তার কারণে আগে অনেকবার বিপদে পড়েছে তিন গোয়েন্দা, তা-ও স্বভাব বদলাতে পারে না। গিয়ে খোঁজ করবে?

করাই উচিত। মাটিতে নামলো মুসা। ফান হাউসের বিশাল মুখটা তার দিকে চেয়ে যেন ব্যঙ্গ করে হাসছে এই ভর সন্ধেবেলা। দ্রুত ওটার পাশ কাটিয়ে এসে মাথা গলিয়ে দিলো বেড়ার ফোকরে।

কারনিভলে নাগরদোলার ঘোড়াগুলোর ক্যানভাস সরানো হয়েছে। বাজনা বাজছে। খুঁজে পাওয়া গেল না রবিকে। ঠোঁট কামড়ালো মুসা। কোথায় গেছে? কানা বেড়াল কেনার বিজ্ঞাপন দিয়েছে যে, তার বাড়িতে দু'জনকে নিয়ে যায়নি তো কিশোর? কিন্তু তাহলেও কি এতো দেরি করার কথা?

হয়তো জরুরী কোনো কাজে আটকে গেছে, মনকে বোঝালো মুসা। আসবে। কারনিভল খোলার আগেই চলে আসবে। আর এসেই প্রথমে মুসাকে খুঁজবে, তার রিপোর্ট শুনতে চাইবে। তাকে না পেলে চিন্তা করবে...

এই সময় মনে পড়লো হোমারটার কথা। পকেটেই তো রয়েছে। বিপদে পড়লে জরুরী সঙ্কেত পাঠাবে কিশোর।

তাড়াতাড়ি পকেট থেকে যন্ত্রটা বের করলো মুসা। নাহ, নীরব। লাল আলোও জ্বলছে না।

বারো

মেঝেতে বসে মুখ তুলে গোয়েন্দাপ্রধানের দিকে তাকালো রবি। 'সিগন্যাল কতদূর যাবে, কিশোর?'

'তিন মাইল,' বলেই আরেকবার গুঙিয়ে উঠলো কিশোর। 'উঁহুঁহুঁ, কারনিভল এখান থেকে পাঁচ মাইল। মুসা আমাদের সঙ্কেত পাবে না।'

আবার একে অন্যের দিকে তাকালো ওরা।

'আবার চেঁচালে কেমন হয়?' রবিন পরামর্শ দিলো। 'কেউ না কেউ, একসময় না একসময় আমাদের চিৎকার শুনতে পাবেই।'

'যদি ততোক্ষণ গলায় জোর থাকে আমাদের,' বললো কিশোর। 'শোনো, বেরোনোর উপায় আমাদেরকেই করতে হবে। বিশেষজ্ঞরা বলেন, এমন কোনো ঘর নেই, চেষ্টা করলে যেটা থেকে বেরোনো যায় না। কোথাও না কোথাও দুর্বলতা থাকেই। সেটা পাই কিনা, খুঁজে দেখি।'

'কিন্তু কোথায় খুঁজবো?' রবি বললো।

'হয়তো কিছু একটা মিস্ করেছি আমরা। রবিন, দেয়ালগুলো দেখো তুমি। পাইপ গেছে যেখান দিয়ে, সেসব জায়গা ভালোমতো দেখবে। আমি জানালাগুলো দেখছি। রবি, তুমি দরজা দেখো। কোণের আলমারিটাও বাদ দেবে না।'

নতুন উদ্যমে কাজে লাগলো ওরা।

কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই আবার দমে গেল রবি। দরজাগুলো আগের মতোই লাগলো তার কাছে, কোথাও দুর্বলতা পেলো না। দেয়ালে কিছু পেলো না রবিন।

'থামলে কেন? চালিয়ে যাও,' উৎসাহ দিলো কিশোর। 'চালিয়ে যাও। কিছু না কিছু পাওয়া যাবেই।'

জানালার প্রতিটি ইঞ্চি পরখ করছে গোয়েন্দাপ্রধান। চার হাতপায়ে ভর দিয়ে এখন দেয়ালের নিচের অংশ দেখছে রবিন।

আলমারির ভেতরে খুঁজছে রবি। হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলো, 'দেখে যাও! দেখে যাও!' হাতে একপাতা টাইপ করা কাগজ, আলমারিতে পেয়েছে। 'কারনিভলের ইটিনর‍্যারি। কোথায় কোথায় যাবে, কোনখান থেকে কোনখানে, সেই তালিকা। আমাদেরটার। ক্যালিফোর্নিয়ার পুরো শিডিউল রয়েছে।'

'তাহলে এই লোকটা তোমাদের কারনিভলেরই কেউ,' নিজের যুক্তির স্বপক্ষে প্রমাণ পেয়ে খুশি হলো কিশোর।

'কিংবা ওদের কারনিভলকে অনুসরণ করছে,' অন্য যুক্তি দেখালো রবিন।

'রবি,' জিজ্ঞেস করলো কিশোর। 'লোকটার গলা চিনেছো? কথা যে বললো, চেনা চেনা লাগলো?'

'না কখনও শুনিনি।'

মিনিটখানেক চুপ করে রইলো কিশোর, ভাবলো। 'গলাও হয়তো নকল করেছে। খসখসে ভাবটা কেমন যেন মেকি।'

রবি আর রবিন দু'জনেই গিয়ে আলমারিতে খুঁজতে লাগলো আবার। কয়েকটা তাকে মলাটের বাক্স আর পুরনো হার্ডবোর্ড বোঝাই। এক তাকে অদ্ভুত একটা পোশাক পেয়ে টেনে বের করলো রবিন। 'দেখো তো, এটা কি? আমি চিনতে পারলাম না।'

কালো কাপড়ে তৈরি, আলখেল্লার মতো একটা পোশাক, তবে ঢোলা নয়, আঁটো। কাঁধের সঙ্গে জোড়া দেয়া হুড—তাতে মাথা, কান, গাল সব ঢেকে যায়, শুধু মুখের সামনের দিকটা খোলা থাকে।

ভুরু কোঁচকালো কিশোর। 'কারনিভলের পোশাক-টোশাক না তো? রবি?'

অবাক হয়ে পোশাকটা দেখছে রবি। নীরবে এগিয়ে এসে হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগলো। ইতিমধ্যে তাক থেকে একজোড়া জুতো বের করলো রবিন। ওগুলো অদ্ভুত। কালো ক্যানভাসে তৈরি, রবারের সোল। তলাটা বিচিত্র, অনেকটা সাকশন কাপের মতো দেখতে।

দেখে আরও অবাক হলো রবি।

'কি, চিনেছো?' কিশোর জিজ্ঞেস করলো।

মাথা নাড়লো রবি। 'আমাদের কারনিভলে কেউ পরে না. কিন্তু… ' আবার

মাথা নাড়লো সে। বলতে দ্বিধা করছে। 'ঠিক শিওর না, তবে যদ্দূর মনে পড়ে, মাছিমানব টিটানভ পরতো ওরকম পোশাক।'

'কী মানব?' রবিন অবাক।

'মাছিমানব। আমি তখন ছোট, নানীর কাছে থাকি। শিকাগোর এক ছোট সার্কাসে পার্টটাইম-কাজ করতো বাবা। টিটানভ শো দেখাতো তখন ওই সার্কাসে। তার শো আমি দেখেছি। বেশিদিন থাকতে পারেনি ওখানে। চুরির দায়ে চাকরি যায়। পরে শুনেছি, জেলে গেছে। হয়তো আবারও চুরি করে ধরা পড়েছিলো পুলিশের হাতে।'

'জেল!' কিশোর বললো। 'ট্যাটু আঁকা লোকটার সঙ্গে তার চেহারার মিল আছে?'

'চেহারা মনে নেই। তবে বয়েসের মিল আছে। মাছিমানবের পোশাক ছাড়া দেখিনি তো কখনও...'

'এই পোশাকটা কি ঠিক ওরকম?'

'হ্যাঁ। জুতোগুলোও। এরকম জুতো ছাড়া খেলা দেখাতে পারে না মাছিমানবেরা। তলায় সাকশন কাপ দেখছো না, উঁচু দেয়াল বেয়ে উঠতে কাজে লাগে। প্রায় যে-কোনো দেয়াল...'

কিন্তু রবির কথাই কানে ঢুকছে না কিশোরের। আনমনে বিড়বিড় করলো, 'সেদিনের সেই বুড়ো চোর...পার্ক থেকে গায়েব হয়ে গেল...উঁচু বেড়া ডিঙিয়ে...,' তুড়ি বাজালো। 'ঠিক! মাছিমানবের পক্ষেই সম্ভব!'

'জন্তুজানোয়ারও সামলাতে পারতো টিটানভ,' আরেকটা জরুরী তথ্য জানালো রবি। 'সিংহও।'

'জলদি বেরোতে হবে এখান থেকে!' মাথা ঝাড়া দিলো কিশোর। 'নইলে বেড়ালটা হাতিয়ে নিয়ে যাবে চলে। আর ধরা যাবে না। চেঁচাও, চেঁচাও! ফাটিয়ে ফেলো গলা!'

জানালার কাছে সমবেত হয়ে আবার চিৎকার শুরু করলো ওরা।

ইস্, এখনও আসছে না কেন কিশোররা? উৎকণ্ঠা বাড়ছে মুসার। শেষে আর থাকতে না পেরে মনস্থির করে ফেললো, খুঁজতেই বেরোবে।

আধঘন্টা পর সাইকেল চালিয়ে স্যালভিজ ইয়ার্ডে ঢুকলো সে। সন্ধ্যা ঘনিয়েছে। বোরিসকে দেখা গেল, ছোট ট্রাকটা থেকে মাল নামাচ্ছে। নামানো প্রায় শেষ।

সাইকেল থেকে না নেমেই জিজ্ঞেস করলো মুসা, 'বোরিসভাই, কিশোর আর রবিনকে দেখেছেন?'

'না তো। সারাদিনই দেখিনি। কিছু হয়েছে?'

'বুঝতে পারছি না। আমি...'

'মুসা,' হাত তুললো বোরিস। 'কিসের আওয়াজ? ভোমরা ঢুকেছে নাকি তোমার পকেটে?'

উত্তেজিত না থাকলে আগেই খেয়াল করতো মুসা। বোলতায় কামড়ালো যেন তাকে। ঝট করে পকেটে হাত ঢুকিয়ে বের করে আনলো যন্ত্রটা। 'সিগন্যাল!' চেঁচিয়ে উঠলো সে, 'বোরিসভাই, বিপদে পড়েছে ওরা! জলদি চলুন।'

একটাও প্রশ্ন করলো না আর বোরিস। প্রায় লাফিয়ে গিয়ে উঠলো ট্রাকের ড্রাইভিং সীটে। সাইকেল রেখে মুসা গিয়ে বসলো তার পাশে। ইয়ার্ডের গেট দিয়ে ছুটে বেরোলো ট্রাক।

মুসার হাতে হোমার। দিকনির্দেশ করছে কাঁটা। পথ বাতলে দিতে লাগলো বোরিসকে, 'বাঁয়ে, বোরিসভাই...আবার বাঁয়ে...এবার সোজা...'

পথের ওপর বোরিসের দৃষ্টি, মুসার নজর যন্ত্রের ডায়ালে। উড়ে যেতে পারলে যন্ত্রের কাঁটা একদিকেই নির্দেশ করতো। যেহেতু মাটি দিয়ে যেতে হচ্ছে, পথ সরাসরি যায়নি, ঘোরাঘুরি হচ্ছে, ফলে কাঁটাও একবার ডানে, একবার বাঁয়ে সরছে।

বলে যাচ্ছে মুসা, 'ডানে, বোরিসভাই...বাঁয়ে...আবার বাঁয়ে...এবার ডানে!'

ধীরে ধীরে বাড়ছে যন্ত্রের শব্দ।

'এখানেই!' মুসা বললো। 'কাছাকাছিই হবে কোথাও!'

নির্জন একটা পথে এসে পড়েছে ট্রাক। এই সন্ধেবেলা একটা লোককেও দেখা গেল না রাস্তায়। ধীরে চালাচ্ছে এখন বোরিস। মুসার নজর পথের দু'পাশে। কাউকে দেখলো না, কোনো নড়াচড়া নেই। আবার তাকালো কাঁটার দিকে।

'ডানে, বোরিসভাই। এখানেই আছে কোথাও।'

'কিছু তো দেখছি না, মুসা!' উদ্বেগে ভরা বোরিসের কণ্ঠ।

'দাঁড়ান, দাঁড়ান!' চেঁচিয়ে উঠলো মুসা। 'পিছে, পেছনে যান! বেশি এগিয়ে গেছি!'

ঘ্যাচ করে ব্রেক কষলো বোরিস। ট্রাকটা পুরোপুরি নিশ্চল হওয়ার আগেই ব্যাক-গীয়ার দিলো। বিকট শব্দে প্রতিবাদ জানালো ইঞ্জিন, পিছাতে শুরু করলো গাড়ি।

পথ থেকে দূরে ছোট ইঁটের বাড়িটা দেখালো মুসা। 'বোরিসভাই, আমার মনে হয় ওখানে।'

গাড়ি পার্ক করে লাফ দিয়ে নামলো বোরিস। মুসাও নামলো। বাড়িটার দিকে দৌড় দিলো দু'জনে।

কয়েক মিনিট পর, হাসিমুখে বেরিয়ে এলো কিশোর, রবিন আর রবি। দরজা ভেঙে ফেলেছে বোরিস আর মুসা মিলে।

'খাইছে!' হেসে বললো মুসা। 'কিশোর, তোমার দিনি...দিনি...'

'দিনিজসপ্রে।'

'হ্যাঁ। দিনি...দিনি...' বাংলা শব্দটা কিছুতেই উচ্চারণ করতে না পেরে রেগে গেল মুসা।

'ধ্যাত্তোর, নিকুচি করি দিনিফিনির! সহজ নাম রাখো।...হ্যাঁ, যা বলছিলাম, হোমারটা সত্যি কাজে লাগলো। এতো তাড়াতাড়ি...'

'এই, কে তোমরা!' ধমকের সুরে বলে উঠলো কেউ।

ফিরে তাকালো ওরা। রাস্তার দিক থেকে আসছে ছোটখাটো একজন মানুষ। কাছে এসে আবার ধমক দিলো, 'এখানে কি? ...হায় হায়রে,আমার দরজা-টরজা সব ভেঙে ফেলেছে! আদালতে পাঠাবো আমি তোমাদেরকে। জেলের ভাত খাওয়াবো!'

লোকটার মুখোমুখি হলো কিশোর। শান্তকণ্ঠে বললো, 'সরি স্যার, ইচ্ছে করে ভাঙিনি। একটা বাজে লোক আমাদের এখানে এনে বন্দি করেছিলো। বাইরে থেকে তালা লাগিয়ে চলে গেল। বহুত চিল্লাচিল্লি করেছি, কেউ শোনেনি। লোকটার হাতে টাট্টু আঁকা, পাল-তোলা-জাহাজের ছবি, কালো চামড়া। কোন দেশী, বলতে পারবো না। চেনেন? আপনার ভাড়াটে?'

'আটকে রেখেছে? টাট্টু? কি বলছো তুমি, ছেলে?' বৃদ্ধ বললো। 'আজ সকালে এক ভদ্রলোককে ভাড়া দিয়েছি। দেখে তো সহজ-সরল মানী লোক মনে হলো। বুড়ো মানুষ। কোথায় নাকি সেলসম্যানের চাকরি করে। টাট্টু তো দেখিনি! যা-ই হোক, ব্যাপারটা রহস্যময় মনে হচ্ছে। পুলিশে রিপোর্ট করবো আমি।'

'হ্যাঁ, তাই করুন, স্যার। পুলিশকেই জানানো দরকার। দেরি না করে এখুনি যান, প্লীজ।'

মাথা ঝাঁকালো লোকটা। দ্বিধা করলো, ঘুরে আবার ফিরে চাইলো, তারপর আবার ঘুরে হাঁটতে শুরু করলো রাস্তার দিকে।

লোকটা কিছুদূর এগিয়ে গেলে কিশোর বললো, 'চলো, আমরাও যাই। তাড়াতাড়ি করলে এখনও হয়তো ধরা যায় ব্যাটাকে। বোরিসভাই, চব্বিশ নম্বর কেলহ্যাম স্ট্রীট। কুইক!'

তেরো

সাগরের ধারে পুরনো, বড় বড় সব বাড়ি। পথের দু'ধারে গাছপালা, কড়া রোদেও নিশ্চয় ছায়া থাকে। নীল গাড়িটা দেখলো না ছেলেরা।

'জানতাম, ব্যাটাকে ধরা যাবে না,' নিরাশ কণ্ঠে বললো মুসা।

'হ্যাঁ, অনেক দেরি করিয়ে দিলো,' সুর মেলালো মুসা।

'কোনো কারণে ওর দেরি হলেই বাঁচি,' আশা করলো কিশোর। 'পথের মাথায়, ওই বাড়িটাই বোধহয় চব্বিশ নম্বর। ইস্, অন্ধকারও হয়ে যাচ্ছে। যান। এগোন।'

তিনতলা সাদা একটা বাড়ি। চারপাশে বড় বড় গাছ। বাগানে ফুলের বেড। ড্রাইভওয়েতে একটা গাড়ি, সেই নীল গাড়িটা নয়। মোড় নিয়ে সেদিকে চললো বোরিস, এই সময় আলো জ্বললো বাড়ির ভেতরে।

'এইমাত্র এলো?' কিশোর তাকিয়ে আছে সেদিকে, লোকজন কে আছে দেখতে চায়।

বাড়ির সামনে এনে গাড়ি রাখলো বোরিস।

মহিলাকণ্ঠের চিৎকার শোনা গেল বাড়ির ভেতর থেকে, 'চোর! চোর! ধরো! ধরো!'

এক ঝটকায় ট্রাকের দরজা খুলে লাফিয়ে নামলো বোরিস।

ছেলেরাও নামলো হুড়াহুড়ি করে। মুসা চেঁচিয়ে বললো, 'নিশ্চয় টাট্টুওলা!'

দৌড় দিয়েছে বোরিস। পেছনে ছেলেরা ছুটলো।

একনাগাড়ে চেঁচিয়ে চলেছেন মহিলা।

দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে যেন দাঁড়িয়ে গেল মুসা। হাত তুলে দেখালো বাড়ির একপাশে। আবছা অন্ধকারে সবাই দেখলো, খাড়া দেয়াল বেয়ে নেমে আসছে একজন মানুষ। কি ধরে নামছে, সে-ই জানে। কয়েক ফুট বাকি থাকতে লাফিয়ে পড়লো মাটিতে, জানালা দিয়ে আসা আলোর মাঝে। কোনো ভুল নেই, সেই লোকটা। বগলে লাল-কালো ডোরাকাটা কানা বেড়াল।

'ও-ব্যাটাই!' চেঁচালো রবিন। 'বেড়ালটা পেয়ে গেছে।'

'ধরো, ধরো চোরটাকে!' রাগে চিৎকার করে উঠলো রবি।

রবির গলা শুনে ফিরে তাকালো লোকটা। ছেলেদের দেখলো, বোরিসকে দেখলো, তারপর ঘুরে দিলো দৌড়। একদৌড়ে গিয়ে ঢুকে গেল বাড়ির পেছনে গাছপালার ভেতরে।

খেপা ষাঁড়ের মতো গোঁ গোঁ করতে করতে পিছু নিলো বোরিস। কিন্তু

বিশালদেহী ব্যাভারিয়ানের তুলনায় লোকটা অনেক দ্রুতগতি। বোরিস আর ছেলেরা গাছের জটলার ভেতরে থাকতেই রাস্তায় উঠে গেল সে।

বোরিসকে ছাড়িয়ে গেল মুসা, রাস্তায় উঠলো। পেছনে হাঁপাতে হাঁপাতে আসছে অন্যেরা। সবাই দেখলো, রাস্তার পাশে রাখা নীল গাড়িটাতে উঠলো চোর। ইঞ্জিন স্টার্ট নিলো, শাঁ করে বেরিয়ে গেল গাড়ি।

'নাহ্, পারলাম না!' দাঁড়িয়ে পড়লো মুসা।

'গেল!' পাশে এসে দাঁড়ালো রবি।

'যাবে কোথায়?' আশা ছাড়তে পারছে না রবিন। 'লাইসেন্স নম্বর আছে, পুলিশ খুঁজে বের করে ফেলবে।'

'তাতে সময় লাগবে, নথি,' গোয়েন্দাপ্রধানের কণ্ঠে হতাশার সুর। 'তবে তাড়াতাড়িতে কোনো সূত্র ফেলে গিয়ে থাকতে পারে। চলো, বাড়ির ভেতরে চলো। দেখি খুঁজে।'

বাড়ির কাছে এসে দেখলো, সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে আছেন একজন সুন্দরী মহিলা, পেছনে একটা ছেলে। দলটাকে দেখে সতর্ক হলেন তিনি, চোখে সন্দেহ। 'চোরটাকে চেনো তোমরা?'

'চিনি, ম্যাডাম,' কিশোর বললো। 'পাজী লোক। এ-বাড়িতে আসবে, জানতাম। তাই পিছে পিছে এসেছি। দেরি না হলে…'

'তোমরা চোর ধরতে এসেছো?' বিশ্বাস করতে পারছেন না মহিলা। 'ওরকম একটা ক্রিমিন্যালকে? তোমরা তো ছেলেমানুষ।'

কালো হয়ে গেল কিশোরের চেহারা। এই 'ছেলেমানুষ' কথাটা শুনলে মেজাজ খারাপ হয়ে যায় তার। বয়েস কম হলেই যেন বুদ্ধিশুদ্ধি থাকতে নেই, ক্ষমতা থাকতে পারে না, অবহেলার যোগ্য। 'আমরা ছেলেমানুষ সন্দেহ নেই, ম্যাডাম,' ইচ্ছে থাকলেও কণ্ঠের ঝাঁঝ পুরোপুরি চাপতে পারলো না সে।' কিন্তু অনেক বুড়ো মানুষের চেয়ে আমরা অভিজ্ঞ, অন্তত চোর ধরার ব্যাপারে। শুধু চোর নয়, ঝানু ঝানু ডাকাত ধরেছি। …আপনি নিশ্চয় মিসেস ট্যানার?'

'তুমি কি করে নাম জানলে?' মহিলা অবাক।

'চোরটা যে এখানেই আসবে, জানতাম,' মহিলার প্রশ্নের জবাব দেয়ার প্রয়োজন মনে করলো না কিশোর। 'তার কপাল ভালো, আটকে ফেলেছিলো আমাদেরকে। এখানে এসে ওকে পাবো, তা-ই আশা করিনি। তা আপনি বোধহয় এই এলেন?'

'হ্যাঁ, ডিককে নিয়ে বাইরে বেরিয়েছিলাম। কয়েক মিনিট আগে এসেছি। এসেই ওপরে চলে গেল সে। গিয়েই চিৎকার শুরু করলো।'

দশ-এগারোর বেশি না ছেলেটার বয়েস। বললো, 'চিৎকার করবো না তো

কি। সিঁড়িতে দেখি চোরটা, ঘাপটি মেরে ছিলো। আমাকে দেখেই নেমে এসে আমার হাত থেকে বেড়ালটা কেড়ে নিলো!'

'ওটা নিয়েই বেরিয়েছিলে নাকি?' জিজ্ঞেস করলো কিশোর।

'হ্যাঁ। পুরস্কার পেয়েছি তো, বন্ধুদের দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলাম।'

'এই জন্যেই। বোঝা গেল,' মাথা দোলালো কিশোর। 'এজন্যেই এতো দেরি করেছে। খুঁজেছে, বেড়ালটা পায়নি। বসেছিলো। যেই তোমার হাতে দেখেছে, খাবলা মেরে নিয়ে পালিয়েছে।'

'ডিকের হাত থেকে নিয়ে নামছিলো, আমাকে দেখে আবার উঠে গেছে,' মিসেস ট্যানার বললেন। 'বোধহয় দোতলার জানালা দিয়ে বেরিয়েছে।'

'বেরিয়ে দেয়াল বেয়ে নেমেছে,' মুসা বললো।

'মাছিমানবের মতো,' যোগ করলো রবিন।

'ডিক,' জিজ্ঞেস করলো কিশোর। 'বেড়ালটার ভেতরে কিছু পেয়েছো? ছিলো?'

'কি করে জানবো? আমি কি খুলেছি নাকি?'

কথাটা ঠিক। কেন খুলতে যাবে ডিক?

'যা দরকার, নিয়ে পালিয়েছে,' আফসোস করলো রবিন। 'আর শয়তানটাকে খুঁজে পাবো না।'

'লাইসেন্স নম্বর তো আছে,' মুসা বললো। 'পাবো না কেন?'

'পেতে সময় লাগবে, মুসা,' একই কথা আরেকবার বললো কিশোর।' এখন…'

'এখন আর আমাদের কিছু করার নেই,' বাধা দিয়ে বললো বোরিস। 'পুলিশকে ফোন করো।'

'পুলিশকে?' কিশোরের ইচ্ছে নেই। 'কিন্তু বোরিসভাই…'

'কোনো কিন্তু নয়। এখুনি যাও, ফোন করো। লোকটা আস্ত বদমাশ। কখন যে কি করে বসে ঠিক নেই। পুলিশকে অবশ্যই জানানো দরকার।'

রবিনও বোরিসের সঙ্গে একমত হয়ে বললো, 'ঠিকই, কিশোর, এখন আর আমাদের কিছু করার নেই।'

'করো না,' মুসাও বললো। 'মিস্টার ফ্লেচারকেই ফোন করে সব কথা বলো।'

দীর্ঘশ্বাস ফেললো কিশোর। ঝুলে পড়লো কাঁধ। 'বেশ,' হাতের তালু চুলকালো সে। 'মিসেস ট্যানার, আপনার ফোনটা ব্যবহার করা যাবে?'

'নিশ্চয়। করো।'

দল বেঁধে ঘরে ঢুকলো সবাই। কিশোরই ফোন করলো থানায়। পুলিশ চীফ ইয়ান ফ্লেচারকে পাওয়া গেল। শুনে বললেন, আসছেন। লাইন কেটে রিসিভার হাতে রেখেই রবিনকে বললো কিশোর, 'এক কাজ করো না। তোমার বাবাকে

ফোন করে জিজ্ঞেস করো, কারনিভলের কোনো কর্মচারী অনুপস্থিত কিনা।'

'অনুপস্থিত? কি সাংঘাতিক, কিশোর, তোমাকে আগেই বলেছি, ওরকম টাট্টু-ওলা কেউ নেই আমাদের কারনিভলে।'

'ছদ্মবেশ নেয়া কঠিন কিছু না। হাতের টাট্টু ঢেকে রাখাও সহজ।'

'হুঁ। ঠিক আছে, করছি। বাবাকে পাওয়া মুশকিল হবে। শো-এর সময় এখন, নিশ্চয় খুব ব্যস্ত। তবু, দেখি।'

'হ্যাঁ, দেখো,' রবিন বললো।

ডায়াল করে রিসিভার কানে ধরে রইলো রবি। ওপাশে রিঙ হয়েই চলেছে, ধরছে না কেউ। 'বললাম না পাওয়া যাবে না। অফিসে নেই। বক্স অফিসে বলে দেখি, ডেকে আনতে পারে কিনা।'

পুলিশের সাইরেন শোনা গেল। রিসিভার তখনও কানেই ঠেকিয়ে রেখেছে রবি। বাড়ির বাইরে এসে থামলো গাড়ি। কয়েকজন পুলিশ নিয়ে ঢুকলেন ইয়ান ফ্লেচার।

সংক্ষেপে তাঁকে সব জানালো ছেলেরা।

'যাক, নম্বর রেখে কাজের কাজ করেছো,' চীফ বললেন। 'পাওয়া যাবে। তা, বেড়ালগুলো কেন চায়, বুঝেছো?'

'না, স্যার,' রবিন বললো।

'ভেতরে দামি কিছু থাকতে পারে,' বললো মুসা। 'কিশোরের ধারণা, স্মাগলিং কেস।'

মাথা ঝোঁকালেন চীফ। 'অসম্ভব না। ঠিক আছে, সীমান্ত রক্ষীদের হুঁশিয়ার করে দিচ্ছি, নীল গাড়িটা আর কানা বেড়াল দেখলেই যেন আটকায়,' বলেই বেরিয়ে গেলেন তিনি।

তখনও চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে রবি।

কিশোর চুপ করে আছে। বেড়ালের ভেতর কি আছে, জানার আগেই পুলিশ ডাকতে হলো বলে তার মন খারাপ। পুলিশকে সব জানিয়ে চমকে দেয়া আর হলো না। 'এতো দেরি লাগছে? ...রেখো না, চেষ্টা করো।'

আবার ডায়াল করলো রবি।

কিছুক্ষণ পর ফিরে এলেন ফ্লেচার। আগের চেয়ে গম্ভীর। 'কিসে হাত দিয়েছো, জানো না তোমরা। খবর নিতে গিয়ে জানলাম, ওরকম একটা লোক, হাতে টাট্টু আঁকা, গত হপ্তায় ব্যাংক ডাকাতি করে পালিয়েছে। সাত লাখ ডলার নিয়ে গেছে।'

'নিশ্চয় স্যান মেটিওতে, তাই না, স্যার?' ইয়ান ফ্লেচার বলার আগেই বলে ফেললো কিশোর।

'তুমি কি করে জানলে?' কিশোরের দিকে তাকিয়ে রইলেন চীফ।

'কারনিভলে আগুন, স্যার। স্যান পেড্রিওতে লেগেছিলো। আমার স্থির বিশ্বাস, ওই বেড়াল-চোর রবিদের কারনিভলের কেউ। ডাকাতির পর আগুন লাগার জন্যে সে-ই দায়ী।'

'তুমি শিওর?'

'শিওর। কাকতালীয় ঘটনা এতো বেশি ঘটতে পারে না। আপনি কারনিভলে গিয়ে...'

'পেয়েছি, কিশোর,' বলে উঠলো রবি। 'বাবাকে পেয়েছি।'

বাবার সঙ্গে কথা বলছে রবি, চুপ করে শুনছে সবাই। কি জবাব আসে শোনার জন্যে অধীর। একজন পুলিশ এসে ডাকতে আবার বেরিয়ে গেলেন চীফ।

'হ্যাঁ, বাবা, কি সাংঘাতিক,' রবি বলছে। 'আমি দুঃখিত, বাবা। সবাই আছে? হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি এখুনি আসছি,' রিসিভার রেখে দিয়ে কিশোরের দিকে ফিরলো সে। 'বাবা বলছে আমি ছাড়া সবাই আছে এখন। শো শুরু হয়েছে। এক্ষুণি যেতে হচ্ছে আমাকে। গিয়ে খাওয়ার সময়ও পাবো না, গ্যালারিতে ঢুকতে হবে।'

খাওয়ার কথায় চমকে উঠলো মুসা। 'খাইছে রে খাইছে! এতোক্ষণ না খেয়ে আছি! মনেই ছিলো না। হায় হায় হায়, নাড়ি তো সব হজম।'

কিশোর ছাড়া সবাই হাসলো। সে গভীর চিন্তায় নিমগ্ন।

ফিরে এলেন চীফ। জানালেন, 'গাড়িটা পাওয়া গেছে। এখান থেকে মাত্র চার ব্লক দূরে, রাস্তার পাশে বেড়ালটাও ছিলো গাড়িতে। পেট কাটা, ভেতরে কিছু নেই। ঘাসের ওপর চাকার দাগ। হয় চোরটা আরেকটা গাড়ি রেখে এসেছিলো ওখানে, নয়তো অন্য কোনো গাড়ি এসে নিয়ে গেছে। মনে হচ্ছে, যা দরকার, পেয়ে গেছে। যতো তাড়াতাড়ি পারে রকি বীচ থেকে পালানোর চেষ্টা করবে এখন। তবে পুলিশও সতর্ক, পালাতে দেবে না। ধরা পড়বেই। সময় লাগবে আরকি,' কিশোরের দিকে তাকালেন। 'তোমাদের আর কিছু করার নেই। বাড়ি চলে যাও।'

চোদ্দ

পরদিন রবিন বা মুসা, দু'জনের কেউই বেরোতে পারলো না। বাড়িতে জরুরী কাজ, ব্যস্ত থাকতে হলো। কাজ করলো বটে, কিন্তু মন পড়ে রইলো ইয়ার্ডে। চোরটাকে ধরতে পারেনি, সেটা একটা ব্যাপার। তার ওপর কয়েকবার ফোন করেও কিশোরকে পায়নি। সে নেই।

ডিনারের সময় অন্যমনস্ক হয়ে রইলো রবিন।

হেসে বললেন তার বাবা, 'চীফের কাছে শুনলাম, একটা ডাকাতকে ধরতে

ধরতেও নাকি ধরতে পারোনি।'

'জানতামই না যে ও ডাকাত, বাবা। কারনিভলের একটা ছেলেকে সাহায্য করতে গিয়েছিলাম। কেঁচো খুঁড়তে বেরোলো সাপ।'

'পারলে মানুষকে সাহায্য করা উচিত। ঠিকই করেছো।'

'ডাকাতটার আর কোনো খোঁজ পাওয়া গেছে, বাবা? চীফ কিছু বললেন?'

'ধরতে পারেনি এখনও। পুলিশ সতর্ক রয়েছে।'

এই খবরে খুশি হতে পারলো না রবিন। খাওয়া শেষ করে বেরিয়ে পড়লো, ইয়ার্ডে যাবে। ভাবছে, এই প্রথম একটা কেসে সফল হতে পারলো না তিন গোয়েন্দা।

হেডকোয়ার্টারে পাওয়া গেল কিশোরকে। সামনে একগাদা খবরের কাগজ, পড়ছে, মাঝে মাঝে নোট নিচ্ছে।

'কি করছো?' রবিন জিজ্ঞেস করলো।

মাথা নাড়লো গোয়েন্দাপ্রধান, বোঝালো এখন কথা বলতে চায় না। কিছুটা বিরক্ত হয়েই কয়েকটা শামুক আর ঝিনুক দেখতে লাগলো রবিন, স্কিন ডাইভিঙের সময় ওগুলো তুলে এনেছে ওরাই। সময় কাটে না। শেষে গিয়ে চোখ রাখলো সর্ব-দর্শনে। ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে স্যালভিজ ইয়ার্ডটাই দেখতে শুরু করলো। রোদেলা দিন ছিলো, গোধূলি তাই যেতে দেরি করছে এখনও।

ট্রাক বোঝাই করে মাল এনেছেন রাশেদ আঙ্কেল,' রবিন জানালো।

আনমনে ঘোঁৎ করলো একবার কিশোর। পড়া বাদ দিয়ে চোখ বন্ধ করে ভাবনায় ডুবে গেল।

আবার সর্ব-দর্শনে চোখ রাখলো রবিন। কিছুক্ষণ পর বললো, 'মুসা আসছে।'

এবার ঘোঁৎও করলো না কিশোর।

ট্র্যাপডোর দিয়ে উঠে এসে দীর্ঘ এক মুহূর্ত কিশোরের দিকে তাকিয়ে রইলো মুসা। রবিনের দিকে চেয়ে ভুরু নাচালো, 'কি করছে?'

'আমাকে জিজ্ঞেস করছো কেন? দেখছো না?'

'এতো খবরের কাগজ কেন?' আবারও রবিনকেই জিজ্ঞেস করলো মুসা। 'টাট্টুওলার জন্যে বিজ্ঞাপন দেবে নাকি পেপারে?' একটা টুলে বসলো।

চোখ মেললো কিশোর, হাসলো। 'তার আর দরকার হবে না, সেকেণ্ড। লোকটা কোথায় আছে, জানি।'

'জানো?' চেঁচিয়ে উঠলো রবিন। 'কোথায়?'

'যেখানে ছিলো, সেখানেই। রকি বীচে। কারনিভলে।'

'বাবা বললো, লোকটাকে নাকি ছয় জায়গায় দেখা গেছে? চীফ নাকি বলেছেন তাকে।'

'আসলে সাত জায়গায় হবে।'

'তারমানে তুমি ভুল করছো। এখানে নেই সে।'

'পত্রিকাগুলো ভালোমতো দেখে, তবেই বলছি। সাতজন লোক সাত জায়গায় দেখেছে লোকটাকে, দু'শো মাইলের ব্যবধানে। সে-কারণেই বলা যায়, কেউই দেখেনি তাকে। ওরা মিথ্যে বলেছে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে রবিন বললো, 'তোমার কথা বুঝতে পারছি। কিন্তু সে যে এখানেই আছে, এ-ব্যাপারে শিওর হলে কি করে?'

উঠে ছোট ঘরটায় পায়চারি শুরু করলো কিশোর। 'ওই ব্যাংক ডাকাতির ওপর লেখা যত্তোগুলো খবর বেরিয়েছে, সব পড়লাম। তিনটে কাগজে লিখেছে, স্যান মেটিওর দুটোয়, আর লস অ্যাঞ্জেলেসের একটাতে। আজ সকালে স্যান মেটিওতে গিয়েছিলাম।'

'কোথায় গিয়েছিলে?' লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালো মুসা।

'স্যান মেটিওতে,' হাসলো কিশোর। 'তোমরা তখন ব্যস্ত। একজন ঘর পরিষ্কার করছিলে, আরেকজন বাগান সাফ...আমারটাও কাজই, তবে অন্যরকম। পুরনো মাল কিনতে পাঠালো চাচা, বোরিস আর রোভারকে সঙ্গে দিয়ে...'

দীর্ঘশ্বাস ফেললো মুসা। ধপ করে বসে পড়লো আবার টুলে। 'কিছু মানুষের কপালই থাকে ভালো। কাজের মাঝেও আনন্দ। আর আমি শালার কপালপোড়া, সেদিন করলাম বাগান সাফ, আজ করতে হলো ঘরবাড়ি পরিষ্কার...,' নাক দিয়ে বিচিত্র শব্দ করে ক্ষোভ প্রকাশ করলো সে। 'ওই করে করেই মরবো।'

'ডাকাতির ব্যাপারে কি জানলে, কিশোর?' রবিন জিজ্ঞেস করলো।

'অনেক কিছু। কারনিভলে শুক্রবার রাতে আগুন লেগেছে। সেদিন, স্যান মেটিওতে ব্যাংক খোলা ছিলো বিকেল ছটা পর্যন্ত। আর যেহেতু উইকএণ্ড, কারনিভল শুরু হয়েছিলো নির্দিষ্ট সময়ের আগেই। তাছাড়া সেদিন ওখানে কারনিভলের শেষ দিন। রাতেই স্যান মেটিও ছাড়ার কথা, রকি বীচে এসে খোলার কথা শনিবারে।'

'খাইছে! ডাকাতটা কারনিভলের লোক হলে মহা সুযোগ।'

'হ্যাঁ, সুযোগটা নিয়েছিলো সে। আগাগোড়া কালো পোশাক, মাথায় কালো হুড, পায়ে কালো টেনিস শু পরে ডাকাতি করতে গিয়েছিলো।'

'মাছিমানব টিটানভ!' রবিন বললো।

মাথা নেড়ে সায় জানালো কিশোর। 'অনেকেই তার হাত দেখতে পেয়েছে। শার্টের হাতা গুটিয়ে কনুইর ওপর তুলে রেখেছিলো।'

'নিশ্চয় টাট্টুও দেখেছে লোকে।'

'হ্যাঁ। ছটা বাজার পাঁচ মিনিট আগে ব্যাংকে ঢুকলো সে। একজন গার্ডকে

ধরে নিয়ে ভল্টে ঢুকলো। ওকে জিম্মি করেই বেরিয়ে এলো টাকা নিয়ে। তারপর মাথায় বাড়ি মেরে লোকটাকে বেহুঁশ করে ব্যাংকের পেছনের গলি দিয়ে দিলো দৌড়। সে দৌড় দিতেই ব্যাংকের ঘন্টি বাজিয়ে দেয়া হলো। কয়েক মিনিটেই পৌঁছে গেল পুলিশ।'

'ডাকাতটাকে নিশ্চয় ধরতে পারেনি?' মুসা বললো।

'না, পারেনি। কি করে যে পালালো, সেটাই বুঝতে পারেনি কেউ। গলিটায় তন্ন তন্ন করে খুঁজেছে পুলিশ। অন্ধগলি ওটা, একদিক খোলা। তিনদিকে তিনটা বিরাট উঁচু বাড়ি, সব জানালা বন্ধ। গলি থেকে যে বাড়িতে ঢুকবে সে উপায়ও ছিলো না। খোলা মুখ দিয়ে ঢুকেছে পুলিশ। সেদিক দিয়েও যেতে পারেনি ডাকাতটা। অথচ, গায়েব।'

'পার্ক থেকে যেভাবে গায়েব হয়েছিলো,' বিড়বিড় করলো রবিন।

'দেয়াল বেয়ে উঠেছে,' বললো মুসা। 'মাছিমানব।'

'আমার তাই ধারণা,' নিচের ঠোঁটে টান দিয়ে ছেড়ে দিলো কিশোর। 'দেখতে দেখতে ছড়িয়ে পড়লো খবর। কারনিভলের বাইরে তখন পাহারায় ছিলো একজন পুলিশ। ডাকাতির খবর সে-ও শুনেছে। কারনিভলে ঢোকার জন্যে হুড়োহুড়ি করছে লোকে, ওদেরকে শান্ত করার জন্যে এগিয়ে গেল সে। লোকের ধাক্কায় পড়ে গেল একজন, কোট গেল উল্টে। তার কালো শার্ট দেখে ফেললো পুলিশ। সন্দেহ হলো। গিয়ে লোকটার হাত ধরে হ্যাঁচকা টানে কোটের হাতা নামিয়ে দিলো। দেখে ফেললো টাট্টু...'

'কাকতালীয় হয়ে গেল না?' মুসা বললো। 'লোকটার পড়ে যাওয়া। আর পড়বি তো পড় একেবারে পুলিশের সামনে।'

'হ্যাঁ, হয়েছে। তবে এটা নতুন কিছু না। অনেক বড় বড় রহস্য সমাধান হয়েছে এরকম কাকতালীয় ঘটনা থেকে। বলা যায়, অপরাধীদের দুর্ভাগ্যই এসব। যেখানে বাঘের ভয়, সেখানেই রাত হয়, প্রবাদটা তো আর খামোকা হয়নি। যাই হোক, ভিড়ের মধ্যে লোকটাকে আটকাতে পারলো না পুলিশ। এক ঝাড়া মেরে হাত ছাড়িয়ে দৌড় দিলো। কাছেই আরেকজন পুলিশ ছিলো, চেঁচিয়ে সাহায্যের জন্যে তাকে ডাকলো প্রথমজন। খবর পেয়ে আরও পুলিশ ছুটে এলো। ঘিরে ফেলা হলো পুরো এলাকা। নিশ্চিত হলো, ডাকাতটাকে ধরে ফেলবেই। কিন্তু...'

'আগুন লেগে গেল!' বলে উঠলো রবিন।

'হ্যাঁ। ডাকাত ধরার চেয়ে আগুন নেভানো জরুরী। সেদিকে নজর দিলো পুলিশ। আগুন নেভার পর আবার ডাকাত খুঁজতে লাগলো। কিন্তু পেলো না। না ডাকাত, না টাকা।'

'কোথায় গেল?' রবিনের প্রশ্ন।

'যাবে আবার কোথায়? কারনিভলেই ছিলো। ভালো করেই জানে সে, পুলিশের চোখ ফাঁকি দেয়ার জন্যে ওটাই সব চেয়ে নিরাপদ জায়গা। স্যান মেটিও থেকে বেরিয়ে আসার জন্যেও। সেসব বুঝে, ভেবেচিন্তেই প্ল্যান করেছে সে। কখন ডাকাতি করবে, কোনদিক দিয়ে পালিয়ে এসে কোথায় লুকোবে, সব। সহজ, নিরাপদ পরিকল্পনা।'

'কিন্তু পুলিশ দেখে ফেলায়,' বললো রবিন। 'অসুবিধায় পড়লো ডাকাতটা। আগুন লাগিয়ে দিলো, সবার নজর সেদিকে ঘুরিয়ে দেয়ার জন্যে। এই সুযোগে ছদ্মবেশ খুলে বেরিয়ে এলো সে।'

'তারমানে,' মুসা বললো। 'আমরাও সেদিন ওকে ছদ্মবেশেই দেখেছি?'

'তাই তো মনে হয়,' বললো কিশোর। 'মুখে রঙ লাগিয়েছিলো, কিংবা প্লাস্টিকের মুখোশ। চুলেও রঙ করেছিলো নিশ্চয়। হয়তো নাকটাও আলগা। হাতে নকল টাট্টু।'

'হুঁ,' মাথা দোলালো মুসা। 'ওরকম একটা ছবি সবার চোখেই পড়ে।'

'সবাইকে দেখানোর জন্যেই লাগিয়েছে। আসল হলে কিছুতেই দেখাতো না, বরং লুকানোর আপ্রাণ চেষ্টা করতো। আমার বিশ্বাস, লোকটার বয়েস বেশি না, টাট্টুও নেই। নিশ্চয় মাছিমানব টিটানভ। কারনিভলের অভিজ্ঞ কর্মী বলেই মিস্টার কনরকে বোকা বানাতে পেরেছে।'

'কিন্তু মাছিমানবের খেলা তো দেখায় না।'

'অন্য খেলা দেখাচ্ছে।'

'কিন্তু তাকে চিনতে পারছেন না কেন, মিস্টার কনর?'

'হয়তো কাছে থেকে দেখেননি আগে। তাছাড়া অনেক দিন জেলে ছিলো টিটানভ। এতোদিনেও চেহারা বদলায়নি, এটা জোর করে বলা যায় না। তার ওপর হয়তো এমন কোনো সাজ নিয়েছে, যাতে চেহারার আরও পরিবর্তন হয়। এসব করতে কোনো অসুবিধে হয় না তার। কারনিভলে প্রত্যেক কর্মীরই আলাদা ট্রেলার আছে।'

'বুঝলাম,' হাত তুললো মুসা। 'আচ্ছা, বেড়ালগুলো কেন দরকার তার? ভেতরে টাকা রেখেছিলো?'

'সেটা তো সম্ভবই না। এতো টাকা, জায়গাই হবে না। তবে, টাকাগুলো কোথায় লুকিয়েছে, সেই নির্দেশ রয়েছে হয়তো। কিংবা লকার-টকারের চাবি।'

'হুঁ,' রবিন বললো। 'তা-ই করেছে। আগুন লাগানোর পরই কাজটা করেছে। যাতে তাকে সার্চ করা হলেও পুলিশ কিছু না পায়।'

'আমারও তাই মনে হচ্ছে,' একমত হলো মুসা।

'বেড়াল নিয়ে তো যথেষ্ট হাঙ্গামা করলো। টাকাগুলো বের করবে কখন?

এখনি বের করে নিয়ে পালাবে, নাকি আরও কিছুদিন থাকবে কারনিভলে?'

'থাকাটাই তো স্বাভাবিক,' কিশোর বললো। 'ওখানেই নিরাপদ। আমি হলে তা-ই ভাবতাম—যদি বুঝতাম আমার চেহারা চিনছে না কেউ, আমাকে ডাকাত বলে সন্দেহ করছে না। পুলিশ কড়া নজর রেখেছে। হুট করে কেউ এখন কারনিভল ছাড়লেই তাকে সন্দেহ করবে। নাহ্, সে বেরোবে না। রকি বীচে থাকতে কিছুতেই নয়।'

'তো, আমাদের এখন কি করা?' মুসা জিজ্ঞেস করলো। 'কারনিভলে আর যাবো-টাবো?'

'হ্যাঁ, যাবো। চলো।'

দুই সুড়ঙ্গ দিয়ে বেরোলো ওরা। সাইকেল নিয়ে রওনা হলো কারনিভলে। সাঁঝ হয়েছে তখন। পর্বতের দিক থেকে আসা বাতাসের বেগ বাড়ছে।

কারনিভলের কাছে এসে গেটের বাইরে সাইকেল পার্ক করলো তিন গোয়েন্দা। লোক ঢুকতে আরম্ভ করেছে। তাদের সঙ্গে মিশে গেল ওরাও।

হঠাৎ শোনা গেল চিৎকার। এদিক ওদিক দৌড় দিলো কেউ, কেউ ছুটে গেল সামনে।

'কারনিভলে কিছু হয়েছে!' চেঁচিয়ে বললো মুসা।

'অ্যাকসিডেন্ট!' বলে উঠলো রবিন।

দৌড়াতে শুরু করেছে ততোক্ষণে কিশোর।

পনেরো

ভিড় ঠেলে বেরিয়ে এলো তিন গোয়েন্দা। কাত হয়ে মাটিতে পড়ে আছে নাগরদোলাটা। চেঁচিয়ে রাফনেকদের আদেশ নির্দেশ দিচ্ছেন মিস্টার কনর।

রবিকেও পাওয়া গেল সেখানে।

'কি হয়েছে, রবি?' মুসা জিজ্ঞেস করলো।

'জানি না,' ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললো রবি। 'ঘুরছিলো। সওয়ারি নিতে তৈরি, হঠাৎ ইঞ্জিন থেকে ধোঁয়া বেরোতে শুরু করলো। কাত হয়ে পড়ে গেল দোলাটা। তিনটে ঘোড়া ভেঙেছে, দেখো।'

নাগরদোলাটা আবার খাড়া করার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছে রাফনেকরা। ভাঙা ঘোড়াগুলো মেরামতে ব্যস্ত কয়েকজন। ইঞ্জিন পরীক্ষা করছেন মিস্টার কনর।

কয়েকজন কর্মী এসে ঘিরে দাঁড়ালো তাঁকে। উঠে দাঁড়িয়ে কপালের ঘাম মুছলেন তিনি।

'আর কতো অ্যাকসিডেন্ট দেখবো, কনর?' কড়া গলায় জিজ্ঞেস করলো

কোহেন।

'আপনার যন্ত্রপাতিই খারাপ হয়ে গেছে,' বললো মারকাস দ্য হারকিউলিস। 'আমরা ভয় পেতে শুরু করেছি।'

'যন্ত্রপাতি যে খারাপ হয়নি,' কনর বললেন। 'ভালো করেই জানো।'

'নাগরদোলা অতো সহজে ভাঙে না,' বিষণ্ন কণ্ঠে বললো সদাবিষণ্ন লম্বা ভাঁড়। 'এটা আগাম হুঁশিয়ারি! আনলাকি শো। অবশ্যই বন্ধ করে দেয়া উচিত।'

'হ্যাঁ, আনলাকি শো!' আগুনখেকোও একমত। 'হয়তো কিঙের ছাড়া পাওয়াটাও দুর্ঘটনাই ছিলো। তাহলে আরও তিনটে দুর্ঘটনার শুরু হলো।'

গুঞ্জন উঠলো কর্মীদের মাঝে। কেউ মাথা ঝাঁকালো, কেউ দোলালো।

'বন্ধই করে দেয়া উচিত, মিস্টার কনর,' বললো এক দড়াবাজ।

'বড় জোর আজকের রাতটা চালাতে পারেন,' লম্বা ভাঁড় বললো। 'তারপর আর একটা শো-ও নয়।'

'চালাবেন কি করে?' কোহেন জানতে চাইলো। 'নাগরদোলা না চললে তো আমাদের বেতনই দিতে পারবেন না...'

অসহায় ভঙ্গিতে হাত নাড়লেন কনর। কাজ করতে করতে উঠে এসে জরুরী গলায় তাঁকে কি বললো একজন রাফনেক। কনরের উদ্বিগ্ন চেহারায় হাসি ফুটলো। 'আধঘন্টার মধ্যেই ঠিক হয়ে যাবে নাগরদোলা। একটা বিয়ারিং ভেঙেছে, আর কিছু না। যাও, যার যার কাজে যাও।'

'আরও খারাপ অ্যাকসিডেন্ট হবে, আমি জানি,' বিড়বিড় করলো লম্বা ভাঁড়।

তবে বেশির ভাগ কর্মীর মুখেই হাসি ফুটলো আবার। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে চলে গেল যার যার বুদের দিকে, কোহেন ছাড়া।

'শো দেখানো বিপজ্জনক হয়ে উঠছে, কনর,' বললো স্ট্রংম্যান। 'এতো অ্যাকসিডেন্ট! শো বন্ধ করে দেয়া উচিত,' বলে আর দাঁড়ালো না।

চেয়ে রইলেন কনর। চোখ ফেরালেন ছেলেদের দিকে। উৎকণ্ঠা ঢাকতে পারছেন না, ঢাকার চেষ্টাও করলেন না। তাঁর ভবিষ্যৎ, তাঁর ছেলের ভবিষ্যৎ, সব নির্ভর করছে এই কারনিভলের ওপর।

'কাজ করবে ওরা, বাবা?' রবি জিজ্ঞেস করলো।

'করবে। বেশি আশা করে না কারনিভলের লোকে। গণ্ডগোলের কথা সহজে ভুলে যায়। আর কোনো দুর্ঘটনা না ঘটলেই হলো।'

'নাগরদোলাটা ঠিক হবে?'

'হবে,' গম্ভীর হয়ে গেলেন। 'সে-জন্যে ভাবি না আমি। ভয় পাচ্ছি অন্য কারণে। মেকানিক বললো, বিয়ারিঙে শক্ত কিছু ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছিলো। কয়েকটা বল্টু আলগা করে দিয়েছিলো। ঘোরার সময় বিয়ারিঙ আটকে যাওয়ায়

প্রচণ্ড চাপে ছিঁড়ে গেছে বল্টুগুলো।'

'স্যাবোটাজ!' রবিন বলে উঠলো।

'হ্যাঁ। ঠিকই আন্দাজ করেছিলে তোমরা, গোলমাল চলছে এই কারনিভলে। কেউ ধ্বংস করে দিতে চাইছে।'

'না, স্যার,' কিশোর বললো। 'কারনিভলের ক্ষতি করার জন্যে করছে না ডাকাতটা।'

'ডাকাত? মানে ব্যাংক ডাকাত?' কিশোরের দিকে অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে কনর। 'স্যান মেটিওতে যে ডাকাতি হয়েছিলো?'

'হ্যাঁ। আপনার কারনিভলেরই লোক সে।'

জ্বলে উঠলেন মিস্টার কনর। 'বুঝে শুনে কথা বলো, ছেলে! পুলিশ অনেক খোঁজাখুঁজি করেছে, পায়নি।'

'আপনার কারনিভলের লোক বলেই তো পায়নি। আগুন লাগিয়ে সবার নজর অন্যদিকে সরিয়ে দিয়েছে। পুলিশকে তো ফাঁকি দিয়েছেই, সেই সুযোগে ছদ্মবেশ খুলেছে, কানা বেড়ালের ভেতরেও কিছু লুকিয়েছে।'

'তুমি ভুল করছো, কিশোর। ওই চেহারার কেউ নেই এখানে। ওরকম টাট্টু কারও হাতে নেই।'

'কি করে বুঝবেন?' বলে ফেললো মুসা। 'ছদ্মবেশে থাকে। হাতের টাট্টুটাও নকল।'

নীরবে তিন গোয়েন্দার ওপর চোখ বোলালেন কনর। 'হ্যাঁ, সেটা সম্ভব। কিন্তু কে...'

'আমি জানি,' বাধা দিয়ে বললো কিশোর। 'আমি শিওর, ডাকাতটা মাছিমানব টিটানভ।'

'টিটানভ? কি বলছো!'

'ঠিকই বলছি। ওর পালানোর ধরন, আলমারিতে পাওয়া কাপড়, সবই প্রমাণ করে লোকটা ওই মাছিমানব...'

'না, কিশোর,' হাত তুলে তাকে থামালেন কনর। 'টিটানভ নয়। তোমার কথায় যুক্তি আছে, স্বীকার করছি। কিন্তু পুলিশের মুখে সব শোনার পর আমার প্রথমেই মনে হয়েছিলো ওর কথা। আমিও ভেবেছি, এই কারনিভলে লুকিয়ে আছে সে, আমি চিনতে পারছি না। কারনিভলের পোশাক পরা থাকলে, সাজ ধরে থাকলে চেনা কঠিন। তাই সবাইকে পোশাক ছাড়া দেখেছি। টিটানভের মতো লাগেনি কাউকে।'

'দে-দেখেছেন...,' তোতলাতে শুরু করলো কিশোর।

'দেখেছি। বেশির ভাগই ওরা বয়স্ক। আরেকটা কথা। কারনিভলে ডাকাত

থাকলে আগুন লাগা আর কিঙের ছাড়া পাওয়ার ব্যাপারটা নাহয় বোঝা গেল, কিন্তু পনি রাইডের কথা কি বলবে? আর এখন এই নাগরদোলা নষ্ট করা?'

দমে গেছে কিশোর। 'মনে তো হচ্ছে গোলমাল পাকানোর জন্যে।'

'ঠিক তাই। গোলমাল পাকিয়ে কারনিভলের সর্বনাশ করে দিতে চায়,' বলতে দ্বিধা করছেন কনর। শেষে বলেই ফেললেন, 'হয়তো এর মূলে রবির নানী। ডাকাতটাই কানা বেড়ালের পেছনে লেগেছে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তবে সে বাইরের লোক। যা চাইছিলো, পেয়ে গেছে, আর এখানে আসার দরকার নেই তার। নাগরদোলা নষ্ট করায় তার হাত নেই।'

'হতে পারে,' মুসা বললো।

'তবু, চোখ খোলা রাখতে বলবো তোমাদের। আর কোনো দুর্ঘটনা যাতে ঘটাতে না পারে কেউ। আমার কাজ আছে। যাও, তোমরা গিয়ে কারনিভল দেখো, নজরও রাখো। খুব সাবধানে থাকবে।'

'থাকবো,' কথা দিলো রবি।

হাসলেন কনর।

সরে এলো ছেলেরা। নিচের ঠোঁট কামড়ালো কিশোর। বললো, 'আমি এখনও বিশ্বাস করি, আমার অনুমানই ঠিক।'

'কিন্তু মিস্টার কনরের কথায়ও যুক্তি আছে,' রবিন বললো। 'নাগরদোলা নষ্ট করার কোনো কারণই নেই ডাকাতটার।'

'এতোক্ষণে হয়তো বহুদূরে পালিয়েছে সে,' বললো রবি।

'আমার মনে হয় না,' জোর দিয়ে বললো কিশোর। 'এখানেই আছে এখনও। কারনিভল বন্ধ করে দেয়ার চেষ্টা চালাচ্ছে, যাতে অন্য কর্মীদের ভিড়ে মিশে যেতে পারে সে, যাওয়ার সময় কারো সন্দেহ না হয়।'

'পরিস্থিতি শান্ত হওয়ার জন্যে অপেক্ষা করবে না?' প্রশ্ন তুললো রবি।

'হয়তো করবে। আচ্ছা, ঠিক করে বলো তো পাঁচটাই বেড়াল ছিলো তো? না আরও বেশি?'

'পাঁচটাই।'

'বুঝতে পারছি না...,' আনমনে নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটলো কিশোর। 'বেড়ালের ভেতর থেকে পড়ে-টড়ে যায়নি তো? হয়তো বেড়ালের ভেতরে পায়নি। তাহলে নিশ্চয় গিয়ে ট্রেলারটায় খুঁজবে, যেটাতে বেড়ালগুলো রাখা ছিলো! রবি, কোথায় ট্রেলারটা?'

'যেখানে এখন থাকার কথা। শুটিং গ্যালারির কাছে। সারাক্ষণ যাতে চোখ রাখতে পারি।'

'কিন্তু এখন রাখছো না!' চেঁচিয়ে উঠলো কিশোর। 'রাখতে পারোনি, কারণ,

নাগরদোলাটা পড়ে যাওয়ায় দেখতে চলে এসেছো।'

'খাইছে!' চমকে উঠলো মুসা। 'আরেকবার!'

'কেন নয়?' এরকম করে দু'বার সফল হয়েছে আগে। দোলাটার ক্ষতি সামান্য। কারনিভল বন্ধের চেষ্টায় থাকলে ওটা একেবারে বিকল করে দিতো। জলদি, শুটিং গ্যালারিতে। কুইক।' বলতে বলতেই দৌড় দিলো সে।

দর্শকের ভিড় বেড়েছে।

তাদের পাশ কাটিয়ে গ্যালারির পেছনে চলে এলো ছেলেরা। আলো এখানে কম, ছায়া বেশি। কিন্তু দেখতে অসুবিধে হলো না, মাটিতে ছড়িয়ে আছে পুতুল, খেলনা, পুরস্কারের নানা জিনিস।

'আরি, ভেঙে ফেলেছে?' আঁতকে উঠলো রবি।

'দেখো দেখো!' হাত তুললো রবিন।

চারজনেই দেখলো, ট্রেলারের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো একটা মূর্তি। দৌড় দিলো অন্ধকারের দিকে। খোলা জায়গার পরে একসারি তাঁবু পেরিয়ে, বেড়ার ফোকর গলে পার্কে ঢুকে যাওয়ার ইচ্ছে।

'ধরো ব্যাটাকে!' বলেই পেছনে ছুটলো মুসা।

ষোলো

বেড়ার ওপাশে চলে গেল চোরটা।

এক এক করে ফোকর গলে ছেলেরাও চলে এলো। ছায়ায় ঢাকা নীরব পার্ক। চাঁদ উঠছে। পর্বতের দিক থেকে আসা বাতাসের জোর বেড়েছে আরও। ঝাঁকি দিয়ে কাঁপিয়ে দিচ্ছে পুরনো, নড়বড়ে নাগরদোলার স্তম্ভগুলোকে, ক্যাঁচকোঁচ করছে ওগুলো, নিষ্প্রাণ গোঙানি।

'কই?' নিচু কণ্ঠে বললো রবিন। 'গেল কই!'

'চুপ,' ফিসফিসিয়ে বললো কিশোর। 'শোনো।'

বেড়ার ছায়ায় গা ঢেকে দাঁড়িয়ে আছে ওরা। মেরামত করা নাগরদোলার শব্দ হচ্ছে ভীষণ, বহুদূর থেকে শোনা যাবে। পার্কের অন্ধকার ছায়া থেকে কাউকে বেরোতে দেখা গেল না, কেউ নড়লো না। বাঁয়ে, টানেল অভ লাভ-এ ছলাত-ছল করে আছড়ে পড়ছে পানি। মাঝে মাঝে মৃদু হুটোপুটির শব্দ, নিশ্চয় ইঁদুর। এছাড়া আর কোনো আওয়াজ নেই।

'বেশিদূর যেতে পারেনি,' কিশোর বললো। 'ভাগ হয়ে খুঁজবো আমরা। নাগরদোলা ঘুরে আমি আর মুসা যাবো ডানে। রবিন, তুমি আর রবি যাও বাঁয়ে।'

'এই লোকটাই ডাকাত?' রবি প্রশ্ন করলো।

'মনে হয়। বেড়ালের ভেতর পায়নি, তাই ট্রেলারে খুঁজছিলো। পেয়ে গিয়ে থাকলে ও এখন মহাবিপজ্জনক। সাবধান, ধরার চেষ্টা করবে না। পিছে পিছে গিয়ে শুধু দেখবে, কোথায় যায়।'

বাঁয়ে সুড়ঙ্গের দিকে চলে গেল রবি আর রবিন। মুসা আর কিশোর এগোলো ফান হাউসের হাসিমুখের দিকে।

হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেল মুসা। 'কিশোর, শব্দ শুনলাম!'

স্তম্ভগুলোর নিচে অন্ধকার। সেখান থেকেই এলো শব্দটা। আবার। কাঠের ওপর ভারি জুতোর ঘষা লাগার মতো। তারপর, দ্রুত দূরে সরে গেল চাপা পদশব্দ।

'দেখেছি,' ফিসফিসিয়ে বললো মুসা। 'ফান হাউসে ঢুকলো।'

'কে, চিনেছো?'

'না।'

'জলদি চলো। বেরোনোর আরও পথ থাকতে পারে।'

মুসা দেখেছে, ছায়ায় ছায়ায় ঘুরে গিয়ে ঢুকছে লোকটা। ওরা যেখানে রয়েছে, সেখান থেকে ফান হাউসের মুখ পর্যন্ত একটুকরো খোলা জায়গা, চাঁদের আলোয় আলোকিত। একছুটে জায়গাটা পেরোলো ওরা। ভেতরে ঢুকে কান পাতলো। সরু বারান্দার মতো একটা জায়গা। ছাতের ফুটো দিয়ে আলো আসছে, অন্ধকার কাটেনি তাতে।

'সামনে ছাড়া পথ নেই, কিশোর।'

মুসার কথার সমর্থনেই যেন মচমচ শোনা গেল। তার পরেই ধুপ, সবশেষে তীক্ষ্ণ চিৎকার। গড়িয়ে পড়ে কাঠের দেয়ালে ধাক্কা খেয়েছে যেন ময়দার বস্তা। আবার শোনা গেল মচমচ, আবার ধুপ, তারপর নীরবতা।

অস্বস্তিতে পড়েছে দুই গোয়েন্দা। পা টিপে টিপে এগোলো আবছা অন্ধকারের ভেতর দিয়ে। একটা দরজার সামনে এসে দাঁড়ালো।

'সাবধানে খুলবে...,' কথা শেষ করতে পারলো না গোয়েন্দাপ্রধান। মচমচ করে সামনে ঝুঁকে গেল বারান্দাটা। কাত হয়ে গেছে মেঝে। চিত হয়ে পড়লো দু'জনে, গড়াতে শুরু করলো।

পাগলের মতো হাত বাড়াচ্ছে ওরা, ধরার মতো যদি কিছু মেলে। কিছুই নেই।

ধুপ করে কাঠের দেয়ালে বাড়ি খেলো মুসা। আঁউক করে উঠলো। পরক্ষণেই তার গায়ের ওপর এসে পড়লো কিশোর।

হাত-পা ছুঁড়ে কোনোমতে উঠে বসলো দু'জনেই। হতবাক হয়ে দেখলো, কাত হয়ে যাওয়া মেঝে উঠে যাচ্ছে আবার। জায়গামতো লেগে ছাত হয়ে গেল মাথার ওপর।

'পুরো মেঝেটা কাত হয়ে গিয়েছিলো!' বিশ্বাস করতে পারছে না মুসা।

'নিশ্চয় কোনো কিছুর ওপর ব্যালান্স করা। একটা বিশেষ জায়গায় এসে কেউ দাঁড়ালেই কাত হয়ে যায়।'

'হ্যাঁ, অনেকটা ঢেঁকির মতো। ফান হাউসের মজার কৌশল। ডাকাতটাও নিশ্চয় আমাদের মতোই পড়েছে। গেল কোথায়?'

'পথ একটাই।'

ঘরের দেয়ালে একটা বড় ফোকর দেখা যাচ্ছে। পাইপের মুখের মতো।

হামাগুড়ি দিয়ে ওটার দিকে এগোলো মুসা।

'খেয়াল রেখো,' পেছন থেকে কিশোর বললো। 'ওর মধ্যেও কৌশল থাকতে পারে।'

ছোট সুড়ঙ্গ। আরেকটা ঘরে বেরিয়ে এলো ওরা। ছাতের ফাটল দিয়ে আলো আসছে।

ছাতই তো! নাকি মেঝে? অবাক হয়ে ভাবলো মুসা। 'কিশোওওওর!' কেঁপে উঠলো গলা।

আবছা আলোয় মনে হলো ওদের, একটা উল্টে থাকা ঘরে রয়েছে। ছাত নিচে, মেঝে ওপরে। মেঝেতে রাখা চেয়ার, টেবিল, কার্পেট, সব উল্টো হয়ে আছে মাথার ওপরে। ওদের পায়ের কাছ থেকে সামান্য দূরে উল্টো হয়ে রয়েছে একটা ঝাড়বাতি, বাল্ব নেই। দেয়ালে ঝুলছে ছবি, উল্টো।

ফিসফিস করলো বিস্মিত কিশোর, 'আরেকটা কৌশল, মুসা। আলো থাকলে আরও ভালোমতো দেখা যেতো।'

'আমরা সত্যি উল্টো হয়ে নেই তো?' মুসার সন্দেহ যাচ্ছে না।

'না।...ওই যে, আরেকটা সুড়ঙ্গমুখ। এসো।'

প্রথমটার চেয়ে এটা লম্বা। নড়েচড়ে, দোল খায়। ওরা বুঝলো, একসময় ওটাকে ঘোরানোর ব্যবস্থা ছিলো। এখন ঘোরে না যদিও, স্থিরও থাকে না একজায়গায়। আরেক মাথায় বেরিয়ে, নামার সময় আরেকটু হলেই পড়ে গিয়েছিলো কিশোর। সোজা হয়েই বললো, 'শুনছো?'

সামনে কোনোখান থেকে আসছে শব্দটা, হালকা পা ফেলছে কেউ। 'ওদিকে!' ফিসফিসিয়ে বললো মুসা, পর মুহূর্তেই চেঁচিয়ে উঠলো, 'ওরিবাবারে...!'

লম্বা-চওড়ায় আগেরটার চেয়ে বড় এই ঘর। ছাতে অসংখ্য গর্ত, ফাটল, বেশ ভালো আলো আসছে। মুসার মনে হলো গভীর সব ছায়া নড়ছে। কিন্তু ছায়ার কারণে ভয় পায়নি সে। যা দেখালো, সেটা দেখে কিশোরও ঢোক গিললো।

ডানে দেয়ালের কাছে নড়ছে একটা অদ্ভুত মূর্তি। সোজা তাকিয়ে আছে ছেলেদের দিকে। লম্বা, প্যাঁকাটির মতো শরীর, তার ওপর বিশাল এক মাথা। হাত দুটো সরু সরু, যেন মাকড়সার শুঁড়। কিম্ভূত এক মানব-সর্প যেন, ভাসছে রুপালি

চাঁদের আলোয় ।

'কী-ক্কী ওটা, কি-কিশোর!' কাছে ঘেঁষে এলো মুসা। 'ভূউত না তো?'

আরেকবার ঢোক গিললো কিশোর। 'আ-আমি জানি না···আমি···,' হঠাৎ হাসতে শুরু করলো সে। 'মুসা, ও কিছু না। আয়না। আয়না ঘরে ঢুকেছি আমরা। বিভিন্ন ভঙ্গিতে সাজিয়ে রাখা হয়েছে বাঁকা আয়নাগুলো।'

'আয়না? তাহলে পায়ের আওয়াজ শুনলাম কেন?'

'আমি···,' শুরু করেই বাধা পেলো কিশোর।

'ও-ওটাও কি আয়না?' জোরে বলতে ভয় পাচ্ছে মুসা

নাক বরাবর সামনে, আয়না থেকে দূরে দাঁড়িয়ে আছে একটা মূর্তি। কান পেতে রয়েছে যেন। চওড়া কাঁধ কোমর পর্যন্ত নগ্ন, লম্বা অগোছালো কালো চুল, কালো দাড়ি, চাঁদের আলোয় বেশ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

'কোহেন!' যথাসাধ্য চেষ্টা করেও কণ্ঠস্বর স্বাভাবিক রাখতে পারলো না মুসা ।

শুনে ফেললো কোহেন। পাঁই করে ঘুরলো। 'এই, এই, বেরিয়ে এসো।'

মুসার বাহু আঁকড়ে ধরলো কিশোর। ফিসফিস করে বললো, 'কথা বলবে না। আমাদের দেখেনি।'

গর্জে উঠলো আবার কোহেন। 'এই, কথা শুনছি। বেরোও। বেরিয়ে এসো।'

'ওই যে, দরজা!' দেখালো মুসা।

অনেকগুলো আয়নার মাঝে দরজাটা। কিশোরের হাত ধরে ওটা দিয়ে ঢুকে পড়লো মুসা। সরু একটা গলিপথে ঢুকলো ওরা, ছাত নেই। দশ কদম মতো গিয়ে দু'ভাগ হয়ে গেছে পথ। পেছনে কোহেনের কণ্ঠ আর পায়ের আওয়াজ শোনা গেল, দরজাটা দেখে ফেলেছে সে।

'বাঁয়েরটা দিয়ে, কিশোর,' তাড়া দিলো মুসা। 'জলদি !'

আগে আগে চলেছে গোয়েন্দা-সহকারী। প্রতি দশ কদম পর পরই দু'ভাগ হয়ে যাচ্ছে পথ। প্রতিবারেই বাঁয়ের পথ ধরছে সে। পেছনে লেগে রয়েছে কোহেন, পায়ের শব্দেই বোঝা যায়।

অবশেষে আরেকটা দরজা পাওয়া গেল। ধাক্কা দিয়ে পাল্লা খুলে একটা ঘরে ঢুকলো ছেলেরা। তাজ্জব হয়ে গেল। আবার সেই আয়না ঘরে ফিরে এসেছে।

'মরীচিকা!' বিমূঢ়ের মতো বললো কিশোর। 'ফান হাউসের আরেক মজা! ছাগল বানিয়ে ছেড়েছে আমাদের, গলায় রশি দিয়ে একই জায়গায় ঘুরিয়েছে!'

'কোহেনও তো এসে পড়লো!' গুঙিয়ে উঠলো মুসা।

ঠোঁট কামড়ালো কিশোর। 'উপায় একটা নিশ্চয় আছে। আবার ওই দরজা দিয়ে ঢুকবো। এবার আর বাঁয়ে যাবো না। ডানে।'

আয়নাগুলোর মাঝের দরজা দিয়ে আবার সরু গলিতে ঢুকলো দু'জনে। দশ

কদম এগিয়ে সরে গেল ডানের পথটায়। পদশব্দ এখনও অনুসরণ করছে ওদের। পেছনে তাকানোর সময় নেই। ছুটছে তো ছুটছেই ওরা। ধীরে ধীরে কমে এলো পেছনের আওয়াজ, মিলিয়ে গেল একসময়। সামনে দেখা গেল একটা ডাবল ডোর। দ্বিধার সময় নেই। ঠেলে পাল্লা খুলে ফেললো মুসা।

দরজার অন্যপাশে বেরিয়ে এলো দু'জনে। খোলা আকাশের নিচে বেরিয়ে এসেছে। একপাশে ফান হাউস, আরেক পাশে টানেল অভ লাভ-এর প্রবেশ পথ।

'আহ্, বাঁচলাম!' জোরে নিঃশ্বাস ফেললো মুসা।

'হ্যাঁ,' হাঁপাতে হাঁপাতে বললো কিশোর। 'কাজও হয়েছে। লোকটাকে চিনতে পেরেছি। গিয়ে এখন মিস্টার কনরকে বলতে পারবো, কোহেন...'

মড়মড় করে ভেঙে গেল পুরনো পচা কাঠ। ফান হাউসের দেয়াল ফুঁড়ে বেরোলো ব্যায়ামপুষ্ট শক্তিশালী বলিষ্ঠ দেহটা। চাঁদের আলোয় বন্য হয়ে উঠেছে চোখজোড়া, জ্বলছে। কোহেন!

সতেরো

ছায়ার ভেতরে হুমড়ি খেয়ে আছে দুই গোয়েন্দা। শ্বাস ফেলতে ভয় পাচ্ছে। তাকিয়ে আছে কোহেনের দিকে।

'এখনও দেখেনি,' কণ্ঠস্বর যথাসম্ভব খাদে নামিয়ে বললো কিশোর। 'তবে দেখে ফেলবে।'

'বেড়ার কাছেও যেতে পারবো না,' মুসা বললো। 'পথ আগলে রয়েছে। কিন্তু যেতে না পারলে...'

'টানেল অভ লাভ। চলো।'

হামাগুড়ি দিয়ে এগোলো ওরা। ছায়ার অভাব নেই। লম্বা হয়ে পড়েছে নাগরদোলার স্তম্ভগুলোর ছায়া। ওগুলোর মধ্যে রইলো ওরা, কোনো অবস্থাতেই আলোয় বেরোলো না। কোহেনের অলক্ষ্যে সুড়ঙ্গে ঢুকে পড়লো।

'আর আসছে না,' মুসা বললো।

'আসবে। ও জানে, আমরা ওকে দেখে ফেলেছি। আমাদের মুখ বন্ধ করার চেষ্টা করবেই। টানেল থেকে বেরোনোর আরেকটা পথ বের করতে হবে আমাদের।'

সরু খাল কেটে সুড়ঙ্গের ভেতরে পানি ঢোকানোর ব্যবস্থা হয়েছে। তরল সীসার মতো লাগছে ওই পানিকে। কিনার দিয়ে গেছে পথ। সেই পথ ধরে হেঁটে চললো দু'জনে। অনেকখানি ভেতরে ঢুকে সরু একটা কাঠের পুল পাওয়া গেল। শেষ মাথায় কাঠের জেটি। একসময় অনেক নৌকা থাকতো ওখানে, এখন আছে

শুধু একটা পুরনো দাঁড়টানা নৌকা।

'কিশোর, মুখে বাতাস লাগছে।'

'লাগবেই। সামনে বোধহয় খোলা। নিশ্চয় সাগর।'

কাঠের ওপর চাপ পড়ার মচমচ শব্দ হলো। নরম সোলের জুতো পরা পায়ের চাপ। কেউ আসছে।

'নড়ো না!' হুঁশিয়ার করলো কিশোর। 'একদম চুপ।'

সরু পুলের ওপর স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো দু'জনে। অনেক ওপরে ছাতের একটা ফোকর দিয়ে চুঁইয়ে আসছে চাঁদের আলো; নড়াচড়া ওখানেই দেখা গেল।

'উল্টোদিক দিয়ে নেমে আসবে!' মুসা বললো।

'ফিরে যাবো?' নিজেকেই প্রশ্ন করলো কিশোর।

ওপরে ছায়ামূর্তিটাকে নড়তে দেখা গেল। পিস্তল কক করার নির্ভুল শব্দ কানে এলো দু'জনের। আস্তে কিশোরের কাঁধে হাত রাখলো মুসা।

'ফিরে গিয়ে বাঁচতে পারবো না,' কিশোর বললো। 'যেদিক দিয়েই বেরোই, চাঁদের আলোয় দেখে ফেলবেই।'

ওদের কাছাকাছিই রয়েছে নৌকাটা, জেটির সঙ্গে বাঁধা। সামনের দিকে ছড়িয়ে ফেলে রাখা হয়েছে মোটা ক্যানভাস। নিঃশব্দে পা টিপে টিপে এগোলো ওরা। নৌকায় উঠলো। গায়ের ওপর টেনে দিলো ক্যানভাসটা। অন্ধকারে পড়ে রইলো চুপচাপ, নিঃশ্বাস ফেলতেও ভয়।

সময় যাচ্ছে। মিনিটের পর মিনিট।

পুলে হালকা পায়ের আওয়াজ হলো। কাঠের সঙ্গে ধাতব কিছুর ঘসা লাগলো যেন, দেয়ালে লেগেছে বোধহয় লোকটার হাতের পিস্তল।

তারপর অনেক্ষণ আর কোনো শব্দ নেই।

পূর্ণ নীরবতা।

খালের পানিতে দুলছে নৌকা। ঘষা খাচ্ছে জেটির সঙ্গে।

আবার নড়লো লোকটা। ছেলেদের প্রায় মাথার ওপর চলে এলো জুতোর চাপা শব্দ। জোরে জোরে কয়েকবার নাড়া খেলো নৌকা, যেন ধরে ঝাঁকিয়ে দেয়া হচ্ছে। থেমে গেল একসময়। তারপর শুধুই দুলুনি।

ক্যানভাসের নিচে গুটিসুটি হয়ে থাকা ছাড়া আর কিছু করার নেই।

আরও কয়েক মিনিট পেরোলো। নৌকার গায়ে ঢেউয়ের ছলাত-ছল ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই।

'চলে গেছে!' ফিসফিসিয়ে বললো মুসা।

জবাব দিলো না কিশোর।

আরও কিছুক্ষণ পর আচমকা চেঁচিয়ে উঠলো, 'মুসা, জলদি কারনিভলে ফিরে

যেতে হবে। রহস্যের সমাধান হয়ে গেছে!'

'কোহেন?'

'হ্যাঁ, সে তাড়া করাতেই···ডাকাতটা কি খুঁজেছে, এবং সেটা কোথায় আছে, জানি এখন।'

'ও পায়নি?'

'না, সবাই আমরা ভুল জায়গায়···'

ভীষণ দুলে উঠলো নৌকা। ধার খামচে ধরলো কিশোর। ক্যানভাসের তলায় ঝট করে উঠে বসলো মুসা। কান পেতে শুনছে। বললো, 'কিশোর, বড় বেশি দুলছে না? ঘষার শব্দও পাচ্ছি না আর। কি হয়েছে? ক্যানভাস তোলো তো।'

দু'জনে ঠেলে সরালো ক্যানভাসের চাদর। মুখে আঘাত হানলো বাতাস। উঠে দাঁড়াতে গিয়ে চিত হয়ে পড়লো কিশোর, নৌকার দুলুনিতে।

'খোলা সাগরে চলে এসেছি!' চেঁচিয়ে উঠলো মুসা। চারপাশে দেখছে।

পরিত্যক্ত পার্কের কালো ছায়াগুলো এখন অনেক পেছনে, ছোট হয়ে আসছে কারনিভলের আলোকসজ্জা।

নৌকা বাঁধার দড়িটা দেখলো কিশোর। 'কেটে দিয়েছে! পুলে উঠে দড়ি কেটে দিয়ে চলে গেছে ব্যাটা।'

'এখন ভাটা,' পানির দিকে তাকিয়ে আছে মুসা। 'স্রোতে পড়েছে নৌকা। দেখছো, কি জোরে ভেসে যাচ্ছি?'

'জলদি ফেরাও, মুসা!'

'কি করে? দাঁড় নেই, মোটর নেই। সাঁতরে যে যাবো, তারও উপায় নেই। যা স্রোত আর ঢেউ, সাহস হচ্ছে না।'

'হুঁ। তুমি না পারলে আমি পারবো?' নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটলো কিশোর। 'এক কাজ করা যায়। সিগন্যাল।'

পকেট থেকে হোমারটা বের করলো কিশোর। কয়েকবার চেষ্টা করে হাল ছেড়ে দিলো। নৌকার তলায় পানি জমে আছে, তাতে ভিজে গেছে পকেট, পকেটে রাখা যন্ত্রটা। 'হবে না,' হতাশ ভঙ্গিতে হাত নাড়লো কিশোর। 'নষ্ট হয়ে গেছে।'

সাহায্যের জন্যে চিৎকার শুরু করলো দু'জনে। কিন্তু বাতাসের শব্দে হারিয়ে গেল চিৎকার। তীর থেকে অনেক সরে এসেছে। চারপাশে থৈ থৈ করছে সাগরের কালো পানি। একটা নৌকা চোখে পড়লো না। তীরের আলো এখন দূরে। বড় বড় ঢেউ ভাঙছে নৌকার গায়ে, কিনার দিয়ে ভেতরে ঢুকছে, ছিটে লেগে ভিজছে শরীর।

নৌকার তলায় ঝনঝন করছে দুটো টিনের পাত্র, গায়ে গায়ে বাড়ি লেগে। পানি সেঁচার জন্যে রাখা হয়েছে ওগুলো। একটা তুলে নিলো মুসা। আরেকটা

কিশোরকে নিতে বলে সেঁচতে শুরু করলো নৌকায় জমা পানি।

'যে ভাবেই হোক,' কিশোরকে বললো। 'ফিরে যেতেই হবে আমাদের।'

'পারবো না। যা স্রোত। বাতাস অবশ্য বিপরীত দিক থেকে বইছে, অনেক-খানি ঠেকিয়ে রাখছে নৌকাটাকে। স্রোতের টানে নইলে এতোক্ষণে আরও দূরে ভেসে যেতো।' বার দুই পাত্র বোঝাই করে ছপাত্ ছপাত করে পানি ফেললো মুসা। 'দাঁড় ছাড়া হবে না…,' থেমে গেল সে। কিশোরের দিকে তাকালো।

মুসার কাঁধের ওপর দিয়ে সামনে তাকিয়ে আছে গোয়েন্দাপ্রধান। 'মুসা! ওটা কি…!'

ঝট করে ঘুরে চাইলো মুসা।

সামনে বিশাল এক কালো ছায়া। সাগরের নিচ থেকে উঠছে যেন, মাথা তুলেছে ওদের মাথা ছাড়িয়ে অনেক ওপরে।

আঠারো

ঘুরে, যেখান থেকে শুরু করেছিলো, সেখানে এসে দাঁড়ালো আবার রবি আর রবিন। কিশোর বা মুসাকে দেখলো না।

'রবি, কিছু হয়েছে,' চারপাশে দেখতে দেখতে বললো রবিন। 'এখানেই তো ওদের আসার কথা।'

'দেখো!' ফান হাউসের দেয়ালে বড় একটা ফোকর দেখালো রবি। 'নতুন হয়েছে গর্তটা। আমি শিওর।'

জ্যোৎস্নায় আরও বিষণ্ণ লাগছে পরিত্যক্ত পার্কটা।

চেঁচিয়ে ডাকলো রবিন, 'কিশোওর! মুসাআ!'

'কে জানি আসছে!' বলে উঠলো রবি।

ছুটন্ত পায়ের আওয়াজ এসে থামলো বেড়ার ওপাশে, ফোকর গলে ভেতরে ঢুকলো দু'জন লোক।

'তোমার বাবা, রবি।'

কাছে এসে জিজ্ঞেস করলেন মিস্টার কনর, 'কি ব্যাপার?'

'আমাদের কিছু হয়নি, বাবা, আমরা ঠিকই আছি। মুসা আর কিশোরকে পাচ্ছি না। আমার ট্রেলারে কি জানি খুঁজছিলো একটা লোক। তাকে তাড়া করে এলাম এখানে। দু'ভাগ হয়ে খুঁজতে গেলাম। আমি আর রবিন একদিকে, কিশোর আর মুসা আরেকদিকে। তারপর আর ওদের খবর নেই।'

'কোহেন তাহলে ঠিকই বলেছে!'

মিস্টার কনরের পেছনে এসে দাঁড়ালো দাড়িওয়ালা স্ট্রংম্যান। চাঁদের আলোয়

চকচক্ করছে তার ঘামে ভেজা নগ্ন কাঁধ, আর কালো বুট। বললো, 'আমিও দেখেছি, রবির ট্রেলারে খুঁজছে। পিছে পিছে ছুটে এলাম এখানে। ফান হাউসে ঢুকে গায়েব হয়ে গেল ব্যাটা।'

'মুসা আর কিশোরকে দেখেননি?' রবিন জিজ্ঞেস করলো।

'না তো।'

'রবি,' কনর বললেন। 'দৌড়ে যাও তো। বাতি নিয়ে এসো। কয়েকজন রাফনেককে আসতে বলবে।'

ছুটে চলে গেল রবি।

রবিন আর কোহেনকে নিয়ে পরিত্যক্ত পার্কে খুঁজতে শুরু করলেন কনর। মুসা আর কিশোরকে পাওয়া গেল না।

বাতি আর রাফনেকদের নিয়ে এলো রবি। শক্তিশালী বৈদ্যুতিক লণ্ঠন নিয়ে খুঁজতে বেরোলেন কনর। কোহেন আর রাফনেকদের সঙ্গে নিলেন। ফান হাউসের বাইরে দাঁড়াতে বলে গেলেন রবিন আর রবিকে।

'রবি,' রবিন বললো। 'কোহেনও নাকি ট্রেলারের কাছে লোকটাকে দেখেছে। আমরা তাহলে দু'জনকে না দেখে একজনকে দেখলাম কেন?'

'বুঝতে পারছি না, রবিন। দেখা তো উচিত ছিলো।'

'আমার মনে হয় না দু'জন। কোহেনকেই তাড়া করেছি।'

'কোহেনই ডাকাত?'

মাথা ঝাঁকালো রবিন। 'প্রথম থেকেই ওকে কিশোরের সন্দেহ। তোমরা ওর আসল নাম জানো না। আড়িপাতা স্বভাব। আমাদের ওপর চোখ রাখে। কারনিভল বন্ধ করার জন্যে বোঝায় তোমার বাবাকে। কিশোর আর মুসাকে সে-ই আটকে রেখে এখন ধোঁকা দিতে চাইছে আমাদের। চলো, দেখি তোমার বাবা কি করছেন?'

দ্রুত ফান হাউসের দিকে চললো ওরা। ফাঁকফোকর দিয়ে বেরোচ্ছে লণ্ঠনের আলো। ঢোকার মুখেই দেখা হয়ে গেল কনরের সঙ্গে, বেরিয়ে আসছেন।

'নাহ্, কোনো চিহ্নই নেই,' কপালের ঘাম মুছতে মুছতে বললেন তিনি। 'যেন বাতাসে মিলিয়ে গেছে!'

'কোহেন আমাদের বোকা বানিয়েছে, স্যার,' ঝাঁঝালো কণ্ঠে বললো রবিন। 'ও-ই ডাকাত। মুসা আর কিশোর কোথায়, জানে।'

'কোহেন? কি বলছো? কী প্রমাণ আছে?'

'আমি শিওর, রবির ট্রেলারের কাছে সে একাই ছিলো। তাকেই তাড়া করেছিলাম আমরা।'

দ্বিধা করলেন কনর। 'এটা তো প্রমাণ হলো না। ভুলে যেও না, কোহেন

আমাদের সিকিউরিটি ইনচার্জ। সবখানে চোখ রাখা তার দায়িত্ব। কিন্তু তোমাকেও অবিশ্বাস করতে পারছি না। দাঁড়াও, কোহেনকে জিজ্ঞেস করি।'

আবার গিয়ে ফান হাউসে ঢুকলেন তিনি।

বাইরে অপেক্ষা করছে ছেলেরা। অস্বস্তি বোধ করছে। এক এক করে দশ মিনিট পেরোলো। অন্ধকারে পায়চারি শুরু করলো রবিন। সে কি ভুল করেছে?

ফিরে এলেন কনর। থমথমে চেহারা। 'ফান হাউসে নেই কোহেন! রাফনেকদের নাকি বলে গেছে, কারনিভলে যাচ্ছে। কই, আমাকে তো বললো না! বলতে পারতো। চলো, দেখি।'

তাড়াতাড়ি কারনিভলে ফিরে এলো ওরা। কোহেনকে তার তাঁবুতে পাওয়া গেল না, ট্রেলারেও নেই। কেউ তাকে দেখেনি। মুসা আর কিশোরকেও না।

'এবার তো আর পুলিশের কাছে না গিয়ে উপায় নেই,' শঙ্কিত হয়ে বললেন মিস্টার কনর।

কালো ছায়াটার দিকে হাত তুলে চেঁচিয়ে উঠলো মুসা, 'কিশোর, ওটা অ্যানাপামু আইল্যাণ্ড! আশেপাশের সবচেয়ে ছোট দ্বীপ। তীর থেকে মাইলখানেকও হবে না। ওটাতে উঠতে পারলেও হয়।'

'পারবো। ওদিকেই তো ভেসে যাচ্ছি।'

নৌকার ধার খামচে ধরে বসে রইলো দু'জনে। কাছে আসছে দ্বীপটা। খাড়া পাড়, গাছপালা আর পাথর চোখে পড়ছে এখন। পাড়ের নিচে সাদা ফেনার রেখা।

'ওইই, ওখানে সৈকত,' বাঁয়ে দেখালো মুসা। 'মনে হয়…,' কথা শেষ না করেই ডাইভ দিয়ে পানিতে পড়লো সে। নৌকার পেছনে ধরে ঠেলে, সাঁতরে নিয়ে চললো তীরের দিকে। অসংখ্য ছোট-বড় পাথর মাথা তুলে রেখেছে এখানে সেখানে। সেগুলোর ফাঁক দিয়ে নৌকাটাকে ঠেলে নিয়ে এলো তীরের কাছে।

অল্প পানিতে নেমে পড়লো কিশোর। দু'জনে মিলে টেনেহিঁচড়ে এনে শুকনোয় তুললো নৌকা।

'যাক, বাঁচলাম!' বালিতে বসে পড়লো মুসা।

কিশোর বসলো তার পাশে। 'বাঁচলাম আর কই? দ্বীপান্তরে পাঠানো হয়েছে আমাদের। মুসা, এখুনি ফিরে যেতে হবে, নইলে ডাকাতটাকে আটকাতে পারবো না।'

'বেশি বড় না, দেখছো?' কিশোরের কথায় কান নেই মুসার, দ্বীপ দেখছে। 'ছোট। মানুষজন কিচ্ছু নেই। খালি গাছ আর পাথর। কালকের আগে যেতে পারবো না এই দ্বীপ থেকে, তা-ও কপাল ভালো হলে। যদি ধার দিয়ে কোনো নৌকা-টৌকা যায়।'

'কাল অনেক দেরি হয়ে যাবে। এখানকার প্রায় সব দ্বীপেই ইমারজেন্সি শেল্টার আছে শুনেছি। এটাতেও থাকতে পারে। চলো তো দেখি, কোথায়?'

আগে আগে চললো মুসা। বেশি খুঁজতে হলো না। ছোট একটা কেবিন পাওয়া গেল। ভেতরে একটা কাঠের টেবিল, কয়েকটা চেয়ার আর বাঙ্ক। একটা স্টোভ আর টিনজাত কিছু খাবারও সংরক্ষিত আছে। কেবিনের পেছনে একটা ছাউনি। তাতে রয়েছে দুটো ছোট নৌকার মাস্তুল, হাতলশুদ্ধ একটা ছোট হাল, দড়ির বাণ্ডিল, বোর্ড, আর নৌকার জন্যে দরকার আরও কিছু টুকিটাকি জিনিস। হাতুড়ি আর পেরেকও আছে।

'রেডিও নিই, কিশোর,' মুসা বললো। 'যে-আশায় এসেছো। কাল সকাল পর্যন্ত থাকতেই হচ্ছে আমাদের। যদি তার আগে কেউ উদ্ধার না করে।'

জবাব দিলো না কিশোর। ছাউনির জিনিসগুলোর দিকে তাকিয়ে কি ভাবছে।

'মুসা,' হঠাৎ বললো সে। 'পাল হলে তো আমাদের নৌকাটাকে চালানো যায়, তাই না?'

'যায়। পাল আর হাল থাকলে।'

'মাস্তুল আর হাল তো এখানেই আছে। নৌকায় আছে ক্যানভাস। পাল তৈরি করা যায়।'

'বেশি বড় মাস্তুল,' বিশেষ ভরসা করতে পারছে না মুসা। 'স্টেপিং থাকলেও লাগানো যাবে কিনা সন্দেহ।'

'স্টেপিং?'

'কিশোর পাশাও তাহলে অনেক কিছু জানে না,' হাসলো মুসা। বিদ্যে ঝাড়ার দুর্লভ একটা সুযোগ পেলো। 'সকেট আর সাপোর্টিং ফ্রেমে মাস্তুল আটকানোর ব্যবস্থাকে নাবিকরা বলে স্টেপিং। মাস্তুলের গোড়া তো কোথাও আটকাতে হয়, নাকি?'

'এখানে দুটো বুম দেখতে পাচ্ছি। ওগুলোর একটা দিয়ে স্টেপ বানানো যায় না?'

নাক চুলকালো মুসা। 'হয়তো যায়। সীটের মধ্যে গর্ত করে ঢুকিয়ে দিতে পারলে…বোর্ড তো আছেই। টুলবক্সে করাত আর বাটালি থাকলে বানিয়ে ফেলা যাবে। না না, কিশোর, হবে না, ভুলে গিয়েছিলাম!'

'কেন হবে না?'

'কীলই নেই নৌকাটার,' তিক্তকণ্ঠে বললো মুসা। 'সেন্টারবোর্ড, সাইডবোর্ড, কিচ্ছু নেই। পালে বাতাস ধাক্কা দিলেই নৌকা উল্টে যাবে। আর যদি নেহায়েত কপালগুণে না-ও ওল্টায়, চালানো যাবে না। কিছুতেই সোজা চালানো যাবে না নৌকা।'

ধপ করে বসে পড়লো কিশোর। আঙুল কামড়াতে শুরু করলো। তাকিয়ে আছে মাস্তুল আর বুমগুলোর দিকে। খানিক পরে বললো, 'মুসা, মাস্তুলগুলো ভাসবে?'

'ভাসতে পারে। কেন, মাস্তুলে চড়ে বাড়ি যাবার কথা ভাবছো নাকি?'

মুসার রসিকতায় কান দিলো না কিশোর। 'মাস্তুলের সঙ্গে যদি পেরেক মেরে বোর্ড লাগিয়ে দিই? বোর্ডের আরেক ধারে পেরেক মেরে লাগিয়ে দিই নৌকার সঙ্গে, তাহলে...'

'খাইছে, কিশোর, খাইছে!' চটাস করে নিজের উরুতে চাটি মারলো মুসা। 'বাজিমাত করে ফেলেছো! হবে, কাজ হবে এতে! আর যেতে তো হবে মাত্র এক মাইল। বাতাসের গতি ঠিক থাকলে ভারসাম্য বজায় থাকবে নৌকার। চমৎকার!'

'তাহলে আর দেরি কেন?' উঠে পড়লো কিশোর। 'এসো, চটপট সেরে ফেলি।'

উনিশ

চীফ ইয়ান ফ্লেচারকে সব কথা যে বলেছে রবিন, সে-ও প্রায় দুই ঘন্টা হয়ে গেছে। খুঁজতে বেরিয়েছে পুলিশ। কিন্তু এখনও কিশোর, মুসা কিংবা কোহেনের হদিস করতে পারেনি। কারনিভলের ভেতরে-বাইরে অস্থিরভাবে পায়চারি করছেন চীফ। শো চলছে। উপভোগ করছে দর্শকরা। বুঝতেই পারছে না, সাংঘাতিক ব্যাপার ঘটে গেছে ভেতরে ভেতরে। উৎকণ্ঠিত হয়ে আছেন মিস্টার কনর, রবি আর রবিন।

'তোমার ধারণা কোহেনই ব্যাংক ডাকাত?' আরেকবার রবিনকে জিজ্ঞেস করলেন চীফ।

'হ্যাঁ।'

'রকি বীচ থেকে পালালো কিনা বুঝতে পারছি না। অনেকেই দেখেছে বলেছে, অথচ কেউ দেখেনি।'

'কিশোরও তাই মনে করে।'

'ওর মনে করার যথেষ্ট কারণ নিশ্চয় আছে। ফালতু কথা বলে না কিশোর।'

'ওর অনুমান, ডাকাতটা এখনও তার জিনিস খুঁজে পায়নি। আর আমার অনুমান, কোহেনই রবির ট্রেলার ঘেঁটেছে তখন। তারমানে সে-ই ডাকাত। লুকানো জিনিস খুঁজছিলো।'

'হ্যাঁ, হতে পারে।'

'লোকটা অদ্ভুত,' মিস্টার কনর বললেন। 'সব সময় আলাদা আলাদা থেকেছে আমাদের কাছ থেকে। কারও সঙ্গে মিশতে পারেনি।'

'হুঁ,' চোয়াল শক্ত করে ফেললেন চীফ। 'খুঁজে বের করবোই তাকে।'

দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েছে পুলিশ, আর কনরের রাফনেকরা। চষে ফেলছে পুরো এলাকা। খোলা অঞ্চল, কারনিভলের তাঁবু, বুদ, ট্রেলার, ট্রাক, কিচ্ছু বাদ রাখছে না। সব ক'টা গাড়ি আর ট্রাক যথাস্থানে দাঁড়িয়ে আছে, কোনোটা নিখোঁজ হয়নি।

কয়েকবার করে পরিত্যক্ত পার্কটায় খুঁজতে গেল ওরা, সাগরের ধারে খুঁজলো। এমনকি কারনিভলের কাছাকাছি পথ, অলি-গলি-ঘুঁপচি, বাড়িঘরেও খুঁজে দেখলো।

পেরোলো আরও এক ঘন্টা। তিনজনের একজনকেও পাওয়া গেল না।

'এবার সত্যি চিন্তা লাগছে!' চীফ বললেন। 'গেল কোথায়? ওই পার্কটাতেই সূত্র মিলবে। আমিও একবার গিয়ে দেখি।'

রাফনেকদের নিয়ে কয়েকজন পুলিশ তখনও পার্কে খুঁজছে। চীফ কাছে যেতে না যেতেই চিৎকার শোনা গেল।

'ওই যে,' প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন ফ্লেচার। 'নিশ্চয় কিছু পেয়েছে!' বেড়ার ফোকর গলে দ্রুত পার্কে ঢুকলেন তিনি। পেছনে ঢুকলেন কনর আর দুই কিশোর। পানির কিনারে জটলা করছে পুলিশ আর রাফনেকরা। কাকে যেন ধরেছে।

ছুটে গেলেন চীফ। জিজ্ঞেস করলেন, 'ছেলেদের পাওয়া গেছে?'

'না, চীফ,' একজন পুলিশ বললো। 'একে পেয়েছি।'

ঝাড়া দিয়ে হাত ছাড়িয়ে এগিয়ে এলো কোহেন। 'আমাকে এভাবে ধরেছে কেন, জিজ্ঞেস করুন তো? আমি কি চোর নাকি?'

'আগে বলো তুমি এখানে কি করছো?' কঠিন কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন কনর।

'সেটা আমার ব্যাপার।'

আর চুপ থাকতে পারলো না রবিন। 'ও-ই ডাকাত ! ওকে জিজ্ঞেস করুন, মুসা আর কিশোরকে কি করেছে!'

'ডাকাত?' গর্জে উঠলো কোহেন। 'আমি ডাকাত নই, গাধা কোথাকার। ডাকাতটাকে তাড়া করেছিলাম। বলেছিই তো।'

'গত তিন ঘন্টা তাহলে কি করছিলেন?' প্রশ্ন করলেন চীফ। 'আমরা খুঁজতে খুঁজতে হয়রান। কোথায় ছিলেন?'

'ডাকাতটাকে খুঁজতে এসেছি। আমার সন্দেহ…'

'মিথ্যে বলছে ও!' রাগে চেঁচিয়ে উঠলো রবিন। 'ওর দাড়িও নকল।'

কোহেন সরে যাওয়ার আগেই হাত বাড়িয়ে তার দাড়ি চেপে ধরলেন চীফ। হ্যাঁচকা টান দিতেই খুলে চলে এলো আলগা দাড়ি। সবাই তাকিয়ে রইলো লোকটার দিকে।

'বেশ,' কোহেন বললো। 'নাহয় নকলই হলো। তাতে কি?' নিজে নিজেই টেনে খুলে ফেলতে লাগলো আলগা চুল, গালের জড়ুল। বেরিয়ে এলো খাটো করে ছাটা চুল, চেহারার বুনো ভাব দূর হয়ে গেল, ভদ্র চেহারার এক তরুণে পরিণত হলো স্ট্রংম্যান। 'কারনিভলে সবাই চোখে পড়ার মতো পোশাক পরে। মেকাপ নেয়। চুল-দাড়ি আর জড়ুল ছাড়া স্ট্রংম্যানকে লোকে পছন্দ করবে কেন!'

'কিন্তু আমাকেও তুমি ধোঁকা দিয়েছো, কোহেন,' কনর বললেন। 'ওসব পরেই চাকরি নিতে এসেছিলে। বুঝিয়েছো, ওগুলো আসল।'

মস্ত থাবা নাড়লো স্ট্রংম্যান। 'আগে সার্কাসে কাজ করেছি, বলেছি আপনাকে। সার্কাস থেকে কারনিভলে আসে না কেউ। কারনিভল থেকেই সার্কাসে যায়, ভালো করেই জানেন। সম্মান খোয়াতে চায় কে? তাই চেহারা লুকিয়ে রেখেছি।'

'ও স্ট্রংম্যানই নয়,' বলে উঠলো রবি। 'তাই না, বাবা? নিশ্চয় মাছিমানব টিটানভ।'

'না, ও টিটানভ নয়।'

'কিন্তু মিথ্যে বলছে, সন্দেহ নেই!' রবিন বললো।

কাঁধ ঝাঁকালো স্ট্রংম্যান, ফুলে উঠলো কাঁধের পেশী। 'তাই নাকি, খোকা? তাহলে...' সাগরের দিকে চোখ পড়তে থেমে গেল সে। 'আরে...?'

'চীফ, দেখুন, দেখুন,' চিৎকার করে বললো একজন পুলিশ।

সাগরের দিকে তাকালো সবাই। কালো পানি চিকচিক করছে চাঁদের আলোয়। এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখলো ওরা। বিচিত্র একটা নৌকা এগিয়ে আসছে পাল তুলে। একপাশে কাত হয়ে আছে নৌকাটা, চ্যাপ্টা কি যেন একটা আটকে রয়েছে একধারে, বোঝা যায় না। আরও কাছে এলে চেনা গেল আরোহীদের, মুসা আর কিশোর।

'ওরাই!' বলে দৌড় দিলো রবিন।

'কিশোওর! মুসাআ!' চেঁচিয়ে উঠে রবিও দৌড়ালো।

নৌকা তীরে ভিড়তেই লাফিয়ে নেমে ছুটে এলো দুই গোয়েন্দা। কয়েক মিনিটেই অন্যদের জানা হয়ে গেল, দু'জনের সাগর-অভিযানের কাহিনী।

'ওটায় চড়ে এসেছো?' বিশ্বাস করতে পারছেন না যেন চীফ।

'দেখলেনই তো,' হেসে বললো কিশোর। 'মুসা খুব বড় নাবিক। চলুন, কারনিভলে। ডাকাতটা কি খুঁজছিলো, জানি। আমার ধারণা, এখনও পায়নি ওটা।'

'আর পাবেও না,' রবিন বললো। 'ডাকাতটা ধরা পড়েছে।' কোহেনকে দেখালো সে।

'না, কোহেন ডাকাত নয়।'

গোঁ গোঁ করে বললো কোহেন, 'সেকথাই তো বলছি ওদের এতোক্ষণ। বিশ্বাসই করে না।'

'ছদ্মবেশে ঢুকেছে ও, কিশোর,' কনর বললেন। 'রবির ট্রেলার ঘাঁটতে দেখেছো ওকেই।'

'না, স্যার,' শান্ত, দৃঢ়কণ্ঠে বললো গোয়েন্দাপ্রধান। 'নৌকার ক্যানভাসের নিচে লুকিয়ে থাকার সময় বুঝেছি লোক একজন নয়, দু'জন। ডাকাতকে তাড়া করেছে কোহেন। ফান হাউসে পালিয়ে বেড়াচ্ছিলাম আমরা, মনে করেছে আমরাই বুঝি ডাকাত।'

'কি করে বুঝলে?' চীফ জিজ্ঞেস করলেন।

'আমাদের দেখেছে বলে চিৎকার করছিলো। যে তাড়া করে সে-ই ওভাবে চেঁচায়, যাকে তাড়া করা হয়, সে নয়। আসল ডাকাতটা বরং লুকিয়েই থেকেছে আমাদের কাছ থেকে।'

'হ্যাঁ, যুক্তি আছে। কিন্তু...'

'তাছাড়া,' চীফকে কথা শেষ করতে দিলো না কিশোর, কোহেনের কোমর পর্যন্ত নগ্ন, কোনো কাপড় ছিলো না। শুধু আঁটো পাজামা। হাত খালি। পিস্তল আর ছুরি লুকিয়ে রাখার জায়গাই নেই। অথচ, নৌকার দড়ি কেটে আমাদের ভাসিয়ে দিয়েছিলো, যে লোকটা, তার কাছে ছুরিও ছিলো, পিস্তলও।'

'ছেলেটা আপনাদের চেয়ে অনেক চালাক,' আন্তরিক প্রশংসা করলো স্ট্রংম্যান।

'আরও একটা ব্যাপার,' কিশোর বললো। 'দু'রকম পায়ের আওয়াজ শুনেছি। ভারি বুট আর রাবার সোল নরম জুতো। কোহেনের পায়ে বুট, তারমানে ডাকাতটার নরম জুতো ছিলো।'

হেসে উঠলো কোহেন। 'নিন, এবার হলো তো। আমি যে ডাকাত নই, দিলো প্রমাণ করে।'

'তবে আপনিও দুধে ধোয়া নন, মিস্টার কোহেন,' তাকে ধরলো এবার কিশোর। 'ছদ্মবেশে ছিলেন, এটা তো ঠিক। কিছু একটা গোপন করে রেখেছেন সবার কাছ থেকে। নিশ্চয় কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে ঢুকেছেন কারনিভলে। আশা করি, চীফের কাছে বলবেন কারণটা।' স্ট্রংম্যানের দিকে চেয়ে ঠাণ্ডা হাসি হাসলো সে।

ভুরু কুঁচকে কোহেনের দিকে তাকালেন চীফ।

জোরে নিঃশ্বাস ফেলে হাল ছেড়ে দেয়ার ভঙ্গি করলো কোহেন। 'তুমি সাংঘাতিক চালাক, কিশোর পাশা। দেখে কিন্তু মনেই হয় না। ধরা যখন পড়েছি, না বলে আর উপায় কি? সত্যিই স্ট্রংম্যান ছিলাম আমি, সার্কাসে, কয়েক বছর আগে ছেড়ে দিয়েছি। গোয়েন্দাগিরিতে বেজায় শখ, তাই শখের গোয়েন্দা হয়েছি

চাকরি ছাড়ার পর। আমার আসল নাম ডেনমার বোলার। রবির নানী ভাড়া করেছে আমাকে নাতির ওপর চোখ রাখার জন্যে। মহিলা জানতে চান, কারনিভল সত্যি সত্যি পছন্দ করে কিনা রবি। আর তার কাজে বিপদের সম্ভাবনা কতোটা।'

'দুর্ঘটনাগুলো তাহলে তুমি ঘটাওনি?' কঠোর হয়ে উঠেছে কনরের দৃষ্টি।

'না। তবে ঘটাতে উদ্বিগ্ন হয়েছি। আপনাকে বার বার কারনিভল বন্ধ করতে অনুরোধ করেছি সে-জন্যেই। রবির জন্যে ভয় হচ্ছিলো। ওর কোনো ক্ষতি হলে ওর নানী আমাকে আস্ত রাখতো না। তাছাড়া, এটাও বুঝতে চাইছিলাম ওগুলো আসলেই দুর্ঘটনা কিনা?'

'রবিকে নিরাপদে রাখতে চাইছিলে?'

'হ্যাঁ, কনর। সেই দায়িত্বই দেয়া হয়েছে আমাকে।'

ভ্রুকুটি করলো কিশোর। 'চমৎকার, মিস্টার কোহেন। নাকি, মিস্টার বোলার? যা-ই হোক, সব কথা বলেননি। আরও কিছু আছে। রবিকে দেখা আপনার দায়িত্ব, তার ট্রেলার দেখা নয়। ওখানে গিয়েছিলেন কেন? নিশ্চয় সন্দেহ করেছিলেন, ডাকাতটা ওখানে খুঁজতে যাবে। ডাকাতের পেছনে কেন লেগেছেন?'

দীর্ঘ এক মুহূর্ত চুপ করে রইলো কোহেন, ওরফে বোলার। তারপর মাথা ঝাঁকালো। 'নাহ্, তোমাকে ফাঁকি দেয়া মুশকিল। ঠিকই ধরেছো, স্যান মেটিওতেই বুঝেছি, ডাকাতটা কারনিভলেরই লোক। আমি গোয়েন্দা। পেশাদারী একটা মনোভাব রয়েছে। আশা করেছি, ডাকাতটাকে ধরতে পারলে আমার সুনাম বেড়ে যাবে রাতারাতি। কাজেই তদন্ত শুরু করলাম। কিন্তু অনেক খুঁজেও পেলাম না, ডাকাতটার চেহারার সঙ্গে কারনিভলের কারও চেহারা মেলে না। তারপর কানা বেড়াল চুরি গেল। বুঝলাম, ওগুলোর ভেতরেই জরুরী কিছু লুকিয়েছে ডাকাতটা।' থেমে হাত নাড়লো সে। 'কিন্তু বেড়ালের ভেতরে সে নিজেই খুঁজে পেলো না।'

'কি সাংঘাতিক!' বলে উঠলো রবি। 'নিশ্চয় ভেতর থেকে পড়ে গেছে।'

তার কথায় সায় জানাতে পারলো না কিশোর। 'আমার তা মনে হয় না,' বললো সে। 'বেড়ালের ভেতরেই রয়েছে এখনও।'

বিশ

'কিন্তু কিশোর,' প্রতিবাদ করলো রবি। 'আমার পাঁচটা বেড়ালই ছিলো। ডাকাতটা সবগুলো নিয়ে গেছে।'

'না, রবি, তুমিও ভুল করছো। আসলে বেড়াল ছিলো ছ'টা। আমরা দেখেছি।'

'দেখেছি?' হাঁ হয়ে গেছে মুসা। 'কোথায়?'

'কোথায়, কিশোর?' রবিন জানতে চাইলো।

'ধরতে গেলে আমাদের নাকের নিচে। সে-জন্যেই দেখেও দেখিনি। রবিদের ট্রেলারে উঠেছিলাম, মনে আছে? ভাঙা, নষ্ট...'

'পুরস্কার!' চেঁচিয়ে উঠলো রবি। 'মেরামত করার জন্যে রেখেছি ঝুড়িতে। আরেকটা কানা বেড়াল আছে ওখানে! স্যান মেটিওয় পুড়ে গিয়েছিলো।'

'তারমানে আগুন লাগার সময় শুটিং গ্যালারিতে ছিলো ওটা,' বললো কিশোর। 'ওটাতেই জিনিসটা লুকিয়েছিলো ডাকাত। আগুনে বেড়ালটা নষ্ট হয়ে যাওয়ায় রবি নিয়ে গিয়ে ঝুড়িতে ফেলে রেখেছে। সেকথা ভাবেইনি ডাকাতটা, তার নিশ্চয় জানা ছিলো না, বেড়াল ছ'টা আছে। নৌকায় সময় পেয়েছি ভাবার। আমাদের ভাসিয়ে দেয়াটা একটা কথাই প্রমাণ করে, যা খুঁজছে তখনও পায়নি সে। আমরা তার কাজে বাগড়া দেবো বলেই সরিয়ে দিতে চেয়েছে। অনেক ভাবলাম, কোথায় থাকতে পারে জরুরী জিনিস? হঠাৎ মনে পড়লো, ঝুড়িতে ফেলে রাখা বেড়ালটার কথা।'

'খাইছে! কিশোর, একবারও ভাবিনি আমরা।'

'আমিও না,' তিক্তকণ্ঠে বললো রবি। 'অথচ আমার হাতের কাছেই রয়েছে।'

'ডাকাতটাও ভাবেনি,' হেসে বললেন চীফ। 'খুব ভালো কাজ দেখিয়েছো, কিশোর। তোমাকে আমার জুনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে পেলে খুশিই হবো। করবে চাকরিটা? অনারারি পোস্ট।'

মৃদু হেসে প্রশ্ন এড়িয়ে গেল কিশোর। বললো, 'যখন বুঝলাম...!' থেমে গেল সে। সতর্ক হয়ে উঠেছে। তাড়াতাড়ি চারপাশে দেখলো। 'চীফ! কে যেন গেল?'

অন্ধকার ছায়ার দিকে তাকিয়ে আছে মুসা। 'আমিও শুনলাম!'

'কে গেল?' এদিক ওদিক তাকালেন চীফ।

'কি জানি, স্যার!' বললো একজন পুলিশ। 'আমরা তো সবাই আছি।'

'কে যেন দাঁড়িয়েছিলো আমার পেছনে,' একজন রাফনেক বললো, 'মনে করতে পারছি না।'

চেঁচিয়ে উঠলো রবিন, 'কোহেন কোথায়?'

আশেপাশে কোথাও নেই কোহেন।

'জলদি চলুন,' কিশোর বললো। 'কুইক। ছয় নম্বর বেড়ালটার কথা জেনে গেছে!'

ছুটতে ছুটতে বেড়ার কাছে চলে এলো সবাই। ফোকর গলে ঢুকলো কারনিভলের সীমানায়। কিছু দর্শক রয়েছে এখনও। কৌতূহলী হয়ে তাকালো ওরা ছুটন্ত দলটার দিকে।

ছুটে ট্রেলারে ঢুকলো রবি। পরক্ষণেই বেরিয়ে এসে হাত ঝাড়া দিলো। 'নেই! বেড়ালটা নেই!'

'সব পথ বন্ধ করে দাও!' আদেশ দিলেন চীফ।
'খোঁজো, খোঁজো!' কনর বললেন। 'সমস্ত কারনিভল চষে ফেলো!'
তাড়াহুড়া করে চলে গেল পুলিশ আর রাফনেকরা।
'আর পালাতে-পারবে না,' চীফ বললেন।
'চীফ, কোহেনই নিয়েছে?' মুসা জিজ্ঞেস করলো।
'বুঝতে পারছি না। একের পর এক মিথ্যে বলে যাচ্ছিলো!'
'নানী গোয়েন্দা ভাড়া করেনি,' রবি বললো। 'করেছে একটা ডাকাতকে।'
'অনেক শখের গোয়েন্দাকেই নষ্ট হতে দেখেছি আমি,' চীফ বললেন। 'ক্রিমিন্যালদের সঙ্গে মেশার সুযোগ বেশি ওদের। খারাপ হতে সময় লাগে না। হতে পারে, ডাকাতটার সঙ্গে হাত মিলিয়েছে কোহেনও।'
'কোহেন না হলে আর কে, স্যার?' মুসার প্রশ্ন। 'তাকে তো আমরা চিনি না। ধরবো কিভাবে? বেড়ালটা জাস্ট লুকিয়ে ফেলবে। ব্যস, আর চেনা যাবে না তাকে।'
'বেড়ালটা নিয়ে প্রমাণ করে দিলো, সে আছে। পালাতে আর দেবো না। যেভাবেই হোক, ধরবোই। কিশোর···আরে, কিশোর গেল কোথায়?'
কোন ফাঁকে চলে গেছে কিশোর, কেউ খেয়াল করেনি।
'কিশোর?' মুসা ডাকলো।
'কিশোর? কোথায় তুমি?' জোরে ডাকলেন চীফ।
জবাব নেই।
'আমাদের সঙ্গে কি এসেছিলো এখানে?' মনে করতে পারছে না রবিন।
'পার্ক থেকে বেরোনোর আগে পর্যন্ত ছিলো,' কনর বললেন।
'বেশিদূরে যেতে পারেনি,' চীফ বললেন। 'কাছাকাছিই থাকবে।'
'যদি ডাকাতটার পিছু নেয়?' মুসার গলা কাঁপছে।
'শান্ত হও, মুসা,' কনর বললেন। 'চলো, খুঁজি।'
এক এক করে সমস্ত ট্রাক আর ট্রেলার খুঁজলো ওরা। তারপর চলে এলো যেখানে শো চলছে সেখানে। পনেরো মিনিট খোঁজাখুঁজি করে না পেয়ে এলো শুটিং গ্যালারির পাশের চওড়া পথটায়। সেখানেও নেই কিশোর।
'শো শেষ,' কনর বললেন। 'দেখি ওদেরকে জিজ্ঞেস করে, কিশোরকে দেখেছে কিনা।'
'বেরোনোর সব পথ বন্ধ,' চীফ বললেন। 'বেড়ার কাছেও লোক আছে। ওদের ফাঁকি দিয়ে পার্কে ঢুকতে পারবে না। ভেতরেই আছে কিশোর।'
মারকাস দ্য হারকিউলিসের তাঁবুর কাছে কর্মীদের ডেকে জড়ো করালেন কনর। পুলিশ দেখে অস্বস্তি বোধ করছে অনেকেই। কিশোরকে দেখেছে কিনা

জিজ্ঞেস করা হলো।

'আমি দেখিনি,' অস্বস্তিতে নাক কুঁচকালো লায়ন ট্রেনার।

আগুনখেকো আর দড়াবাজরা মাথা নাড়লো। বিচিত্র ভঙ্গিতে দুই লাফ দিলো খাটো ভাঁড়; এখনও অভিনয় করছে। হাত তুলে দেখালো বিষণ্ন লম্বা ভাঁড়কে। ভাঙা ঝাড়ু দিয়ে তলাহীন বালতিতে ময়লা তোলার অভিনয় করলো লম্বা। কিন্তু হাসাতে পারলো না কাউকে। হাসার সময় নয় এটা।

'মনে হয় আমি দেখেছি,' কেঁদে ফেলবে যেন লম্বা। 'তাঁবুর পেছনে।'

'দেখেছো?' কাটা কাটা শোনালো চীফের কথা। 'কার সঙ্গে? কোন তাঁবুর পেছনে?'

'জানি না,' বিষণ্ন ভঙ্গিতে মাথা নাড়লো লম্বা। মনে করতে না পারায় বড় দুঃখ পেয়েছে যেন।

হাতে ভর দিয়ে উল্টো হয়ে দাঁড়ানোর চেষ্টা করে পড়ে গেল বেঁটে। তিড়িং তিড়িং করে আবার দুই লাফ দিলো লম্বাকে ঘিরে।

গুঙিয়ে উঠলো রবিন। 'কিশোরকে ধরে নিয়ে গেছে! আমি জানি!'

'হ্যাঁ,' মুসাও প্রায় ককিয়ে উঠলো। 'জিম্মি করার অভ্যেস তো আছেই ডাকাতটার!'

'শান্ত হও, শান্ত হও,' বললেন বটে, কিন্তু চীফ নিজের উদ্বেগই ঢাকতে পারলেন না। 'যাবে কোথায়? ধরে নিয়ে গিয়ে বাঁচতে পারবে না।'

'ধরেই যদি নিয়ে থাকে,' প্রশ্ন তুললো রবি। 'এখনও বেরিয়ে আসছে না কেন? জিম্মি তো আছেই।'

'তা-ও তো কথা। বুঝতে পারছি না কিছু।'

লম্বা ভাঁড় বলে উঠলো, 'জিম্মি? মনে পড়েছে। লোকটা পার্কের বেড়ার দিকে দৌড়াচ্ছিলো, ছেলেটাও। ধরে নিলো কিনা বুঝলাম না।'

'সাগরের দিকে?' অবাক হলেন চীফ।

'নিশ্চয় সাঁতরে পালানোর চেষ্টা করবে,' বললেন কনর। 'পাহারা পরে বসিয়েছি আমরা, তার আগেই নিশ্চয় বেরিয়ে গেছে।'

ইতিমধ্যে দৌড় দিয়েছে মুসা আর রবি। চীফ আর কনরও পিছু নিলেন। কিন্তু রবিন নড়লো না। মাটির দিকে চেয়ে আছে। 'চীফ!' ডাকলো সে। 'দেখে যান।'

ফিরে এলো চারজনেই। আঙুল তুলে দেখালো রবিন। মাটিতে মস্ত এক প্রশ্নবোধক চিহ্ন আঁকা।

খাটো ভাঁড় তখনও লম্বাকে ঘিরে নাচছে। বুড়ো আঙুল নেড়ে বার বার দেখাচ্ছে লম্বা ভাঁড়কে।

একুশ

'আমাদের সাঙ্কেতিক চিহ্ন!' বিড়বিড় করলো মুসা। দুই ভাঁড়ের দিকে তাকালো একবার।

'নিশ্চয় কিশোর,' বললো রবিন। 'আমাদের···,' বলতে বলতে থেমে গেল সে। খাটো ভাঁড়ের দিকে তাকিয়ে আছে স্থির দৃষ্টিতে। 'চীফ···!'

এবারেও রবিনের কথা শেষ হলো না। হঠাৎ ঢোলা জামার পকেট থেকে লম্বা ভাঁড়ের হাতে বেরিয়ে এলো একটা পিস্তল। সেটা তাক করে কোনো কথা না বলে ধীরে ধীরে পিছিয়ে যেতে শুরু করলো প্রধান প্রবেশ পথের দিকে। রঙ করা ফ্যাকাসে-সাদা চেহারায় ধকধক করে জ্বলছে কালো চোখের তারা।

'খবরদার, কেউ নড়বে না!' সতর্ক করলেন চীফ। 'যেতে দাও।'

অসহায় হয়ে তাকিয়ে আছে ছেলেরা, চীফ নিজে, এবং মিস্টার কনর। চলে যাচ্ছে লোকটা। গেটের কাছে প্রায় পৌঁছে গেছে, হঠাৎ একটা বুদের আড়াল থেকে লাফ দিয়ে বেরিয়ে এলো আরেকজন। লম্বা ভাঁড় কিছু করার আগেই তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো।

কোহেন। পিস্তল ঘোরানোর চেষ্টা করলো লম্বা, পারলো না। লোহার মতো কঠিন আঙুল কজি চেপে ধরলো তার। সেই আঙুল ছাড়ানোর সাধ্য হলো না তার, হাত থেকে খসে পড়লো পিস্তল। স্ট্রংম্যানের কবলে পড়ে একেবারে অসহায় হয়ে গেল লম্বা।

'যাক, ব্যাটাকে ধরলাম শেষ পর্যন্ত!' খুশি হয়ে বললো কোহেন।

নিজের লোকদের ডাকলেন চীফ। ছুটে এলো তারা। শো শেষ হলেও দর্শকরা সব বেরিয়ে যায়নি, ভিড় জমাতে লাগলো। দু'জন পুলিশ গেল ভাঁড়কে ধরতে, অন্যেরা লোক সরানোয় ব্যস্ত হলো।

হেসে বললো কোহেন, 'গিয়ে ঘাপটি মেরে ছিলাম। জানতাম, আজ বেরোবেই ব্যাটা। কিন্তু ভাঁড়ের ভেতর থেকে যে বেরোবে, কল্পনাও করিনি।'

লাফালাফি থামিয়ে দিয়েছে খাটো ভাঁড়। চুল, মুখোশ সব টেনে টেনে খুললো। হাসিমুখে বললো কিশোর, 'ভাঁড় সাজার ইচ্ছে আমার অনেকদিনের।'

কয়েক সেকেণ্ড স্তব্ধ হয়ে রইলেন চীফ। তারপর কথা ফুটলো মুখে, 'খুলে বলো সব। কি করে বুঝলে, লম্বুই ডাকাত? আর ভাঁড় সাজতেই বা গেলে কেন?'

'বলছি,' শুরু করলো কিশোর। 'লোকটা আমাদের অলক্ষ্যে পার্ক থেকে সরে আসার পরই বুঝেছি, ছয় নম্বর বেড়ালটা নিতে গেছে। আমরা পৌঁছার আগেই বের করে নিয়ে লুকিয়ে ফেলবে। তারপর তাকে চেনা খুব মুশকিল হয়ে যাবে। তাই

আপনাদের সঙ্গে না গিয়ে অন্যদিকে গেলাম। বুঝেছি, বেড়ালটা নিয়েই মিশে যাবে লোকের ভিড়ে। যেখানে তাকে চেনা সহজ হবে না।

'ওরকম জায়গা কোনটা? দড়াবাজদের তাঁবু। ওরা তখনও খেলা দেখাচ্ছে। ওদিকে পা বাড়াতে যাবো, দেখি ট্রেলারের দিক থেকে একটা লোক দৌড়ে আসছে। চিনলাম। লম্বা ভাঁড়। দৌড়াতে দৌড়াতেই জিনিসটা ঢুকিয়ে ফেললো ঢোলা পাজামার ভেতরে। আমাকে ওখানে ওই অবস্থায় দেখে ফেললে নিশ্চয় চিনে ফেলতো। তাড়াতাড়ি ঢুকে পড়লাম কাছের তাঁবুটাতে। ঢুকেই চমকে গেলাম। ঢুকেছি ভাঁড়দের তাঁবুতেই।'

'খাইছে!' আঁতকে উঠলো মুসা। 'যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই রাত··· একেবারে বাঘের ঘরে ঢুকে গিয়েছিলে!'

মাথা ঝোঁকালো কিশোর। 'ভয় পেয়েছি খুব। দ্রুত ভাবছি, কি করা যায়। শো দেখানোর অন্যান্য তাঁবুর মতোই ওটারও দুটো অংশ। পেছনের অংশে থাকে অভিনেতাদের মেকাপের সরঞ্জাম, যারা ট্রেলারে মেকাপ নেয় না তাদের জন্যে, জানোই। সোজা ঢুকে পড়লাম সেখানে। বাইরে তার পায়ের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে তখন। যা করার তাড়াতাড়ি করতে হবে। পেছনে ঢুকবে কিনা, জানি না। ঢুকতেও পারে···'

'কি সাংঘাতিক!' চোখ বড় বড় হয়ে গেছে রবির। 'ভালো ফাঁদে পড়েছিলে! ছুরি-টুরি মেরে বসতে পারতো।'

'পারতো,' সায় জানালো কিশোর। 'ভয় তো পেয়েছি সেকারণেই। দেখি, খাটো ভাঁড়ের সাজপোশাক পড়ে আছে। খেলা শেষ। সাজপোশাক খুলে রেখে গেছে সে। বিন্দুমাত্র সময় নষ্ট না করে পরে ফেললাম। ভাগ্যিস, গায়ে লেগেছে। মুখোশ পরাও শেষ করলাম, এই সময় লম্বু ঢুকলো। আমাকে চিনতে পারলো না। অনুরোধ করতে লাগলো, দড়াবাজদের তাঁবুতে গিয়ে আরেকবার যেন খেলা দেখাই। খেলা দেখানোর নেশায় নাকি পেয়েছে তাকে। আমি তো বিশ্বাস করিইনি, খাটো ভাঁড়ও করতো কিনা কে জানে। আসলে তখন মরিয়া হয়ে উঠেছে লম্বু মিয়া। পুলিশকে ফাঁকি দেয়ার জন্যে। বেড়ালটা নিয়ে নিরাপদে পালিয়ে যাওয়ার সুযোগের জন্যে। প্রথমে চেয়েছিলো, বেড়ালের ভেতর যে সে জিনিস লুকিয়েছে, এটা কেউ না জানুক। পরে দেখলো, সবাই জেনেই গেছে। আর চালাকি করে লাভ নেই। কোনোমতে বেড়ালটা নিয়ে পালিয়ে যেতে পারলেই তখন হাঁপ ছাড়ে।'

'হুঁ, বুঝলাম,' বললেন চীফ। 'কিন্তু বাইরে বেরিয়ে, আমাদের কাছে এসে কেন বললে না, লম্বুই ডাকাত? ভাঁড়ামির কি দরকার ছিলো?'

'আমি জানতাম, স্যার, ওর কাছে পিস্তল আছে। আমার ভয় ছিলো, সরাসরি

আপনাকে বললে বেপরোয়া হয়ে উঠবে সে। পিস্তল বের করে যথেচ্ছা গুলি চালাতে শুরু করলেও অবাক হতাম না। তাতে মারাত্মক কিছু ঘটে যেতে পারতো। তাই চাইছিলাম, ওকে না জানিয়ে কোনোভাবে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে। বোঝাতে চাইছিলাম, আমি আসলে খাটো ভাঁড় নই। তা-ও যখন বুঝলেন না, মাটিতে প্রশ্নবোধক আঁকলাম। রবিনের চোখে পড়েছিলো বলেই…'

'হ্যাঁ, আরেকটু হলেই দিয়েছিলাম কাঁচিয়ে,' স্বীকার করলেন চীফ। 'যাক, ভালোয় ভালোয় সব শেষ হলো। বেড়ালটা কোথায়?'

'ওর পাজামার ভেতরে,' লম্বা ভাঁড়কে দেখালো কিশোর।

অস্বাভাবিক ঢোলা পাজামার ভেতর থেকে বের করা হলো বেড়ালটা। ওটার ভেতর থেকে বেরোলো ছোট একটুকরো কার্ডবোর্ড।

'লেফট-লাগেজ টিকেট!' টুকরোটা হাতে নিয়ে বিড়বিড় করলেন চীফ। 'টাকাগুলো নিয়ে গিয়ে লুকিয়ে রেখেছে ওখানে। আরেকটা রহস্যের সমাধান হলো। এখন দেখা যাক, ভাঁড়ের আড়ালে লুকিয়ে আছেন কোন মহাজন।'

ভাঁড়ের পরচুলা আর উইগ নিজের হাতে খুললেন চীফ। পিছিয়ে গেলেন এক পা। বোকা হয়ে গেছেন যেন।

ভাঁড়ের মুখোশের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসেছে সাদা-চুল এক বৃদ্ধ। বয়েস পঁয়ষট্টির কম নয়।

'ও…ও ডাকাত নয়!' মাথা নাড়ছেন চীফ। 'ও নয়!'

'আমিও তাই বলতে চাইছিলাম,' কনর বললেন। 'ডাকাতি করার বয়েসই নেই। আর যা-ই করুক, বয়েস কেউ লুকাতে পারে না। আর দেয়াল বেয়ে ওঠাও তার কর্ম নয়।'

'আমি ডাকাত নই,' দীর্ঘশ্বাস ফেললো ভাঁড়, গোবেচারা চেহারা। 'দশ হাজার ডলারের লোভ দেখিয়ে আমাকে দিয়ে ট্রেলার থেকে বেড়ালটা চুরি করিয়েছে। পিস্তলটা ও-ই দিয়েছে। কি করে ব্যবহার করতে হয়, তাই জানি না। আপনাদের ভয় দেখিয়ে খুব অন্যায় করেছি। আ-আমাকে…আমাকে মাপ করে দিন।'

'কে ভাড়া করেছে?' চীফ জিজ্ঞেস করলেন।

আড়চোখে কোহেনের দিকে তাকালো ভাঁড়। বললো, 'কোহেন। আমাকে দশ হাজার ডলার দেবে বলেছে।'

লাল হয়ে গেল স্ট্রংম্যান। চেঁচিয়ে উঠলো, 'মিথ্যে কথা? ব্যাটা মিথ্যুক! আমি…আমি…'

'আমি সত্যি বলছি,' জোর গলায় বললো ভাঁড়। 'আমাকে ফাঁসিয়ে দিয়ে ও এখন স্বীকার করতে চাইছে না।'

কোনো কথা বলছে না কিশোর। স্থির চোখে তাকিয়ে আছে ভাঁড়ের হাতের

দিকে। হাসি ফুটলো মুখে। 'আমাদের বুড়ো ভাঁড়ই মিথ্যে কথা বলছে, চীফ।'

'কি করে বুঝলে?'

'ও মোটেও বুড়ো না।'

'অ্যাঁ? কি বলছো?' বিশ্বাস হচ্ছে না মুসার।

'হ্যাঁ, সেকেণ্ড। আমরা ভেবেছি, ছদ্মবেশ পরে গিয়ে ডাকাতি করেছে বাদামী চামড়ার লোকটা। আসলে পরে গিয়ে নয়, খুলে গিয়ে করেছে। প্রথম দিন বেড়াল চুরি করার সময় অবশ্য আরেকটা ছদ্মবেশ পরেছিলো। তবে কারনিভলে সব সময়ই ছিলো বুড়ো মানুষের ছদ্মবেশে।'

ছাড়া পাওয়ার জন্যে জোরাজুরি শুরু করলো ভাঁড়, কিন্তু দু'জন পুলিশ তাকে দু'দিক থেকে চেপে ধরে রাখলো। চুল ধরে টানলেন চীফ, মুখোশ খোলার চেষ্টা করলেন। চুলও খুললো না, মুখের ভাঁজ পড়া চামড়াও আগের মতো রইলো।

ভালো করে দেখলেন আবার চীফ। লোকটার গলার কাছে সূক্ষ্ম একটা দাগ দেখতে পেলেন। নখ দিয়ে খুঁটে বুঝলেন আলগা। আঙুল ঢুকিয়ে জোরে ওপর দিকে টানতেই খুলে চলে এলো প্লাস্টিকের মুখোশ—গলা, মুখ, চুল, সব একটাতে। আলগা কিছু নয়।

বেরিয়ে পড়লো আরেক চেহারা। বাদামী চামড়া।

'টিটানভ!' সঙ্গে সঙ্গে চিনতে পারলেন কনর। 'মাছিমানব থেকে ব্যাংক ডাকাত!'

'টাট্টু কোথায়, দেখুন তো?' মুসা বললো।

'পাওয়া যাবে না,' বললো কিশোর। 'ওটা আলগা। সময়মতো লাগিয়ে নিতো।'

'জাহান্নামে যাও, বিচ্ছু কোথাকার!' হিসিয়ে উঠলো টিটানভ। 'হাঁদা ছেলে!'

'বিচ্ছু ঠিকই, টিটানভ,' কঠিন হাসি ফুটলো চীফের ঠোঁটে। 'তবে হাঁদা বলতে পারবে না। তোমাকেই বরং হাঁদা, গাধা, সব বানিয়ে ছেড়েছে।' কিশোরের দিকে ফিরলেন। 'অনেক প্রশ্নের জবাবই তো দিলে, কিশোর। আর একটা প্রশ্ন। কি করে বুঝলে, ওর মুখে মুখোশ? টেনেও তো কিছু বোঝা যাচ্ছিলো না।'

'অতি-ধূর্ত অপরাধীও কিছু না কিছু ভুল করেই ফেলে, স্যার। আপনি খুব ভালো করেই জানেন। এই লোকও হাত ঢাকতে ভুলে গিয়েছিলো। বোধহয় তাড়াহুড়োয়। সবসময় তো দস্তানা পরেই থাকতো, দেখেছি। কোথায় খুলে রেখেছিলেন, টিটানভ? পার্কে? আমাদের নৌকার দড়িকাটার সময়? নাকি বেড়ালটা চুরির সময়?'

জবাব দিলো না মাছিমানব। ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নিলো আরেকদিকে। তার হাতের দিকে এখন সবার চোখ। বাদামী চামড়া সবাই দেখতে পাচ্ছে।

'হাঁদা আমাকে বলতে পারো, টিটানভ,' বিরক্ত কণ্ঠে বললেন চীফ। 'চোখ ভোঁতা হয়ে গেছে আমার। নইলে এটা দেখলাম না!'

হাসলো কিশোর। নাটকীয় ভঙ্গিতে বললো, 'সহজ ব্যাপারগুলোই সহজে চোখ এড়িয়ে যায়।'

পরদিন, কেসের রিপোর্ট ফাইল নিয়ে বিখ্যাত পরিচালক ডেভিস ক্রিস্টোফারের অফিসে ঢুকলো তিন গোয়েন্দা।

মন দিয়ে ফাইলটা পড়লেন পরিচালক। মুখ তুলে বললেন, 'চমৎকার কাহিনী। ভালো ছবি হবে।...এখন, কয়েকটা প্রশ্নের জবাব দাও তো। কারনিভলে ঢুকলো কেন টিটানভ? ব্যাংক ডাকাতির পরিকল্পনা আগেই ছিলো?'

'ওহিওতে ডাকাতির অপরাধে খুঁজছিলো তাকে পুলিশ,' রবিন জানালো। 'কারনিভলে ঢুকে তাই লুকিয়ে থাকতে চেয়েছে।'

'আরও একটা কারণ আছে,' বললো কিশোর। 'সে শুনেছে, কারনিভল নিয়ে ক্যালিফোর্নিয়ায় আসবেন মিস্টার কনর। দলে ঢুকতে পারলে পুলিশের চোখ এড়িয়ে সহজে বেড়িয়ে আসতে পারবে টিটানভ। ভাঁড়ের ছদ্মবেশে ঢুকে পড়েছে। কারনিভলে কাজের অভিজ্ঞতা তার আগে থেকেই ছিলো। ভাঁড়ের অভিনয় করতে কোনো অসুবিধে হয়নি। স্যান মেটিওতে আসার পর ব্যাংক ডাকাতির চিন্তা ঢুকলো মাথায়।'

'বুদ্ধিমান ডাকাত,' চিন্তিত ভঙ্গিতে বললেন পরিচালক। 'ডাকাতি করে টাকা নিয়ে গিয়ে লেফট-লাগেজে রাখলো। ভাঁড়ের ছদ্মবেশে আরেকবার ফাঁকি দিয়ে বেরিয়ে গেল পুলিশকে।'

'রকি বীচ থেকেও বেরিয়ে যেতো। শুধু যদি জানতো, বেড়াল পাঁচটা নয়, ছ'টা।'

'হুঁ।' চুপ করে ভাবলেন কিছুক্ষণ পরিচালক। জিজ্ঞেস করলেন, 'রবি কি বাবার কাছেই থাকবে ঠিক করেছে? নাকি নানীর কাছে চলে যাবে?'

'বাবার কাছেই থাকবে,' মুসা বললো। 'কোহেন, মানে বোলার রিপোর্ট করেছে তার নানীর কাছে, কারনিভলে ভয়ের কিছু নেই। নিরাপদেই থাকবে রবি। তাছাড়া কাজটা সে পছন্দ করে।'

'অনিচ্ছা সত্ত্বেও মেনে নিয়েছেন মহিলা,' যোগ করলো কিশোর। 'ছেলে বাবার কাছে থাকলেই ভালো।'

'বোলার কি চলে গেছে?'

'না,' রবিন বললো। 'কারনিভলেই রয়ে গেছে, সিকিউরিটি ইনচার্জ হিসেবে। গোয়েন্দাগিরি করেছে বটে কিছুদিন, কাজটা তার ভালো লাগেনি।'

'হুঁ। সব কাজ সবার জন্যে নয়।' ঘড়ি দেখলেন পরিচালক, মুখে না বলেও বুঝিয়ে দিলেন হাতে সময় কম। 'আর একটা প্রশ্ন, তারপরেই তোমাদের ছেড়ে দেবো। ওই পনি রাইডের ব্যাপারটা কি? কে বিষ খাওয়ালো ঘোড়াগুলোকে?'

'ওটা সত্যিই দুর্ঘটনা। খাবারে বিষক্রিয়া।'

'ও। মিস্টার কনরের ভাগ্য খারাপ। ভালো ঘোড়াগুলো মরে গেল। ভাঁড়ও কমে গেল একজন। আরেকটা বড় আকর্ষণ গেল তাঁর কারনিভলের।'

'রকি বীচে যতোদিন থাকবেন উনি, ভাঁড়ের অসুবিধে হবে না তাঁর,' হেসে বললো মুসা। 'কিশোর কথা দিয়েছে, ভাঁড়ের অভিনয় সে-ই করবে। কাল যা দেখিয়েছে না, স্যার, কি বলবো। অন্য সময় হলে হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরে যেতো আমার।'

'তাই নাকি, তাই নাকি?' আরও গম্ভীর হয়ে গেলেন সদাগম্ভীর পরিচালক। 'সময় করতে পারলে যাবো দেখতে। দেখি, কিছুক্ষণ হেসে মনটা হালকা করে আসতে পারি কিনা।'

ঃ শেষ ঃ